

ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାୟ  
ଅବଦାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ



পথে প্রবাসে

একশিল্পী



প্রথম প্রকাশ

১৯৩১

প্রথম সচিত্র বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দ্বিতীয় সচিত্র বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ

আগস্ট ১৯৯৯

© পুণ্যশ্লোক রায়

চন্দ্রহাস রায়

প্রকাশক

অবনীন্দ্রনাথ বেরা

বাণীশিল্প

১৪এ টেমার লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

অঙ্কর-বিন্যাস

অতনু পাল

কম্পিউটার টুডে

৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৫

মুদ্রাকর

রবি দত্ত

ইম্প্রেসন হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

লেখকের আলোকচিত্র

রবি দত্ত

প্রচ্ছদ

হিরণ মিত্র

দাম : ২৫০ টাকা

## ‘পথে প্রবাসে’র শোভন সংস্করণের ভূমিকা

বারো বছর বয়সে প্রথম চৌধুরীর লেখা ‘চার ইয়ারী কথা’ পড়ে আমার মনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দর্শনের কৌতূহল অঙ্কুরিত হয়েছিল। ফ্রান্সে গেলে দেখতে পেতুম ভেনাস ডি মাইলোকে। আর ইংলণ্ডে গেলে কতরকম অ্যাডভেঞ্চার হতো। পরে এই দুই দেশ সম্বন্ধে বহু গল্প-উপন্যাস পড়ি। তাছাড়া কলেজে গিয়ে ইউরোপের ইতিহাস প্রায় ছ’ বছর ধরে অধ্যয়ন করি। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হয়ে শিক্ষানবিশির জন্য যখন দু’ বছরের মেয়াদে বিলেত যাই তখন হির করে ফেলি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও ছুটির সময় ঘুরে দেখব। সৌভাগ্যক্রমে সাথী পেয়ে গেলুম মণীন্দ্রলাল বসুকে। তিনিই হলেন আমার গাইড। তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আমার সাথী হলেন জয়স টারিং। আমার পরম সৌভাগ্য। দাস্তের বিয়াত্রিসের মতো তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যান। এঁদের দু’জনের সদ না পেলে আমার একাকী ভ্রমণ নিতান্ত নীরস হতো। তাই ভ্রমণকাহিনীও সাহিত্যের স্তরে উঠতো না।

‘পথে প্রবাসে’র অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছে কিন্তু হার্ড কভার এডিশন আর পাওয়া যায় না। সেই অভাবটা পূরণ করতে যাচ্ছেন সেই অবনীন্দ্রনাথ বেরা। এতে অলংকরণও থাকছে, তাই এর নাম হয়েছে শোভন সংস্করণ। তার চেয়েও বড় কথা অবনীন্দ্র এটিকে সম্পূর্ণ নির্ভুল করার জন্য যত্নবান হয়েছেন। আগেকার সংস্করণগুলিতে বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ছিল এবং আমার নিছেরও কিছু ভ্রান্তি। এটিকে প্রামাণ্য সংস্করণ বলা যায়।



শ্রীসরলা দেবী  
আধুঅতীষু



পথে প্রবাসে





আমি যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম 'পথে প্রবাসে' পড়ি, তখন আমি সত্য-সত্যই চমকে উঠেছিলুম। কলম ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও পারেন না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই মনে হয় যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে। এ গদ্যের কোথাও জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধানুস্ত। আমরা যারা বাঙলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, আমরা জানি যে, ভাষাকে যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কৃতদূর আয়াসসাধ্য। সুতরাং এই নবীন লেখকের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ ভাষার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম, তাতে আর আশ্চর্য কি?

এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই সমান সজাগ। আর তাঁর চোখে ও মনে যখন যা ধরা পড়ে তখনই তা ভাষাতেও ধরা পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে, এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই খোলা, আর প্রবাসে গিয়ে তাঁর চোখ কান মন আরও বেশ খুলে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন—“আমার চোখজোড়া অন্ধমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।” তিনি যে চোখ বুঁজে পৃথিবী ভ্রমণ করেননি, তার প্রমাণ 'পথে প্রবাসে'র পাতায় পাতায় আছে। আমরা, অর্থাৎ এ যুগের ভারতবাসীরা অর্ধসুপ্ত জাত, আমরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে আসি, আর কিছুদিন থেকে চলে যাই। মাঝামাঝি সময়টা একরকম ধ্যানস্তিমিত লোচনেই কাটাই। এর কারণ নাকি আমাদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য। আমাদের এই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন :

‘চূপ ক’রে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ক’রে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দু’টি চক্ষু বিদ্ধ ক’রে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো’—কিন্তু এ ভালো তিনি চাননি, কারণ তিনি বৈরাগ্যবিলাসী নন। এর ফলে তাঁর ‘পথে প্রবাসে’র মধ্যে থেকে, ‘মানবমানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গির সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ’ পাঠকের চোখের সুগুখে আবির্ভূত হয়েছে।

শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে—‘নতুন দেশে এলে কেবল যে সব কটা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা নয়; সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে, তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট করে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না।’

সমগ্র ‘পথে প্রবাসে’ এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইউরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখকের মন বিশেষ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। এর কারণ, ইউরোপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ। আর যিনি কখনো ও-দেশে গিয়েছেন, তাঁরই কাছে এ সত্য ধরা পড়েছে যে, সে দেশটা ঘুরের দেশ নয়, মহাজাগ্রত দেশ। জাগরণ অবশ্য প্রাণের ধর্ম, আর তার বাহ্যলক্ষণ হচ্ছে

দেহ ও মনের সক্রিয়তা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা দেশের বিষয়ে বলেছেন যে, এ দেশটা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এক কথায় যদি ইউরোপের বর্ণনা করতে হয় ত বলতে হয় যে, সে দেশটা গতি দিয়ে তৈরি আশা দিয়ে ঘেরা।

প্রথম বয়সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সব তাজা থাকে, আর যখন মন বাইরের রূপ বাইরের ভাব স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে গ্রহণ করতে পারে, তখন ও-দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যেটা আমাদের দেশের যুবকরা সব প্রথম মনে ও প্রাণে অনুভব করে, সে হচ্ছে ও-জগতের প্রাণের নীলা। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে তারপর ইউরোপে পদার্পণ করি, তখন আমারও মন এই বিচিত্র প্রাণের নীলায় সাড়া দেয়। শ্রীমান অন্নদাশঙ্করের এ-কটি কথায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়, কারণ আমাদের লুপ্তপ্রায় পূর্বস্মৃতি সব আবার স্বরূপে দেখা দেয়—

ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাস্থে অনুভব করতে পাই, তাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।’ আত্মকালকার ভাষায় যাদের তরুণ বলে, তাদের মন এর প্রতি কথায় সাড়া দেবে। কারণ সে হচ্ছে যথার্থ তরুণ, যার হৃদয়মন সহজে ও স্বচ্ছন্দে বা স্বাভাবিক, তাতে আনন্দ পায়। অর্থাৎ যারা কোন শাস্ত্রের আবরণের ভিতর থেকে দুনিয়াকে দেখে না, সে শাস্ত্র দেশীই হোক আর বিলেতিই হোক; শঙ্করের বেদান্তই হোক আর Karl Marx-এর Das Kapital-ই হোক। শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর আমার বিশ্বাস বিলেত নামক দেশটা চোখ চেয়ে দেখেছেন, পুস্তকের পত্র-আবডালের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখেননি। এর ফলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যথার্থ সাহিত্য হয়েছে।

‘পথে প্রবাসে’র ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রসূত হয়ে লিখতে বসেছি দু-কারণে। বাঙলায় কোন নতুন লেখকের সাক্ষাৎ পেলোই আমি স্বভাবতঃ আনন্দিত হই। বলা বাহুল্য যে যিনি নতুন লিখতে আরম্ভ করেছেন তিনিই নতুন লেখক নন। যিনি প্রথমতঃ লিখতে পারেন, আর দ্বিতীয়তঃ যাঁর লেখার ভিতর নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ আছে, তিনি যথার্থ নতুন লেখক। ‘পথে প্রবাসে’র লেখকের রচনায় এ দুটি গুণই ফুটে উঠেছে। আমরা, যারা সাহিত্যজগতে এখন পেনসন-প্রার্থী—আমরা যে নতুন লেখকদেরও যথার্থ গুণগ্রাহী, এ কথটা পাঠকসমাজকে জানাতে পারলে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করি।

দ্বিতীয়তঃ, আমি সত্য সত্যই চাই যে, বাঙলার পাঠকসমাজে এ বইখানির প্রচার ও আদর হয়। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত যে একখনি যথার্থ সাহিত্যগ্রন্থ এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যরসের রসিক মাত্রেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। তবে আমি আশা করি যে, ও রসে বঞ্চিত কোনও প্রবীণ অথবা নবীন পাঠক, পুস্তকখানিকে শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করবেন না, কারণ তা করলেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া হবে। পৃথিবীতে জলবৃদ্ধদের ন্যায় নানা মত উঠছে ও মিলিয়ে যাচ্ছে। মনোজগতে এই জাতীয় মতামতের উত্থানপতনের ভিতরও অপূর্বতা আছে। কিন্তু এই সব মতামতকেই মহাবস্তু হিসাবে দেখলেই তা সাহিত্যপদব্রত হয়ে শাস্ত্র হয়ে পড়ে। মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর এ লেখকের মতামতের পিছনে যে একটি সজীব মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমার পথের আরম্ভ হলো শ্রাবণের এক মধ্যরাত্রে—তিথি মনে নেই, কিন্তু গুরুপক্ষের আকাশে চাঁদ ছিল না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ঘুরে ভারতবর্ষের বাইরে আমার পথ—কটক থেকে বয়ে, বয়ে থেকে লণ্ডন। বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, পূর্বঘাট পর্বতমালার ধারে ধারে, চিক্কাহুদের কোল ঘেঁষে, গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানু ভুড়ে আমার পথ—কটক, ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াডা, সেকেন্দ্রাবাদ, পুনা, বম্বে।

চিক্কার সঙ্গে এবার আমার দেখা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে, সুন্দরী তখন আলোর স্বপ্ন দেখছে, তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার অঙ্গন স্বেতাভ হয়ে আসছে।

তমালবন দেখতে পেলুম না, কিন্তু চিক্কা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত—হয়তো আরো দক্ষিণেও—তালীবনের অস্ত নেই। পথের একধারে পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সব ক'টাই রুক্ষ, গায়ে ভরুলতার শ্যাম প্রালম নেই, মাথায় নির্ঝরিতার সরস রেহ নেই। পথের অন্যধারে ক্ষেত—কিন্তু বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।

প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণবিচিত্র্য দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজতে হয়। মেয়েরা তো রঙিন ছাড়া পরেই না, পুরুষেরাও রঙিন পরে, এমন দেখতে পেলুম। এ দেশে অবরোধপ্রথা নেই, পথে ঘাটে সুবেশা সুকেশীর সাক্ষাৎ মেলে—‘সুকেশী’, কারণ এ দেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না, বিধবারা ছাড়া। এ দেশের জীবননাট্যে নারীর ভূমিকা নেপথ্যে নয়। দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না করে পুরুষকে সহজ হবার সুযোগ দিয়েছে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে Wordsworthএর Lucy যেমন ফুলের মতো ফুটেছিল, মুক্ত সমাজের কোলে মানুষও তেমনি মাধবী লতার মতো সুন্দর এবং সহকারের মতো সবল হতে পায়। বদ্ধ সমাজের অর্ধজীবী নারী-নর এহেন সত্য অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু এ দেশের লোককে তর্কের দ্বারা বোঝাতে হবে না যে, মানুষ মানে পুরুষ ও মানুষ মানে নারী। নারীকে নিজের কাছে দুর্লভ ক'রে আমরা উত্তর ভারতের লোক নিজেকে চিনতে ভুলেছি এবং যে আনন্দ আশ্রয় হেলায় হারিয়েছি তার ধারণাও করতে কষ্ট পাচ্ছি। জন্মাক্কের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারী-বোধ নেই, যা আছে তার নাম দিতে পারা যায় ‘কামিনী-জননী-বোধ’।

এখন যার নাম হায়দরাবাদের নিজামরাজ্য আগে তার নাম ছিল গোলকোণ্ডা। দেশটি সুদৃশ্য নয়, সুজলা সুফলাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি প্রান্তর, কদাচ কোথাও শৈলগুপ্তিত, কদাচ কোথাও শস্যচিহ্নিত। মাঝে মাঝে দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। সন্দেহ হয় পাহাড়টাই দুর্গ, না পথে প্রবাসে,

দুর্গটাই পাহাড়। সমস্ত দেশটাই যেন একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী—জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই, পাখি-পাখাল নেই। তা বলে হায়দরাবাদের লোকসংখ্যা বড় অল্প নয়—প্রায় দেড় কোটি। এর পূর্বভাগে তেলগুদের বাস, পশ্চিমভাগে মরাঠা ও কানাড়ীদের। আর এ দেশের রাজার জাত মুসলমানেরা। রেলের যাদের দেখলুম তাদের বেশির ভাগ মুসলমান। উর্দুভাষা জানা থাকলে ভ্রমণের অসুবিধা নেই।

কানাড়ী মেয়েদের অবরোধ নেই। তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই মতো কঠিন খাটছে, এমন দেখা গেল। পথের ধারে ক্ষেত, কিসের ক্ষেত জানিনে, ধানের নয়, জোয়ারের কিংবা বাজরার কিংবা অন্য কিছু। ছাত্রীজন পুরুষের মাঝখানে হয়তো একজন মেয়েও খাটছে, 'লজ্জা সরম' নেই। নারী যে কর্মসিহচরীও।

মহারাষ্ট্র পাহাড় পর্বতের দেশ—বহিঃপ্রকৃতি রুদ্র সুন্দর। নরনারীর মুখে চোখে কমনীয়াতা প্রভাশা করাই অনায়াস। শেফতুবার নারী যেন পুরুষের দোসর। মালাবারে যেমন পুরুষেও কাছা দেয় না, মহারাষ্ট্রে তেমনি মেয়েমানুষেও কাছা দেয়। ফলে, পায়ের পশাভাগ অনাবৃত ও কঁটু দেখায়। কিন্তু নারীকে যদি পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছুটোছুটি করতে হয় তবে এছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমেরিকায় কর্মী-মেয়েরা পায়জামা পরে কাজ করে। মরাঠা মেয়েরা কর্মী-প্রকৃতি। তাদের অবরোধ নেই, তরুণীরা পায়ের হেঁটে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, বয়স্কারা *attache' case* হাতে বাজার করতে বেরিয়েছেন, কত মেয়ে একাকী ট্রামে উঠছে, ট্রেনে বেড়াচ্ছে, ভয়ভর নেই, লজ্জা সনোচ নেই, পুরুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার। পায়ের বর্মী চটির মতো হালকা খোলা চটি, পরনে নীল বা বেগুনী—একটু গাঢ় রঙের—ঈষৎ কোঁচা কাছা দেওয়া শাড়ি, পিঠের ওপর একরঙা শাড়ির বহরঙা আঁচল চওড়া করে বিছানো, মাথায় কাপড় নেই, কবরীতে ফুলের পাপড়ি গাঁজা কিংবা ফুলের মালা গোল করে জড়ানো, হটপট্ট সুবলয়িত দেহাবয়বে অল্প কয়েকখানা অলঙ্কার, প্রশস্ত সুগোল মুখমণ্ডলে সপ্রতিভ পুরুষকারণের ব্যঞ্জনা—মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে। তন্দ্রী ওদের মধ্যে চোখে পড়ল না। কিন্তু পৃথুলাও চোখে পড়ে না। সুস্থ সবল ও সপ্রতিভ বলে এদের অধিকাংশকেই স্ত্রী দেখায়, কিন্তু 'রমণীয়' দেখায় বললে বোধ হয় বেশি বলা হয়। এদের চালচলনে-চেহারায়া পৌরুষের ছায়া পড়েছে বলে এদের নারীত্বের আকর্ষণ কমেছে এমনও বলা যায় না। পুরুষের কাছে নারী যদি কাবুলী পায়জামার ওপরে গেরুয়া আলখাল্লা ও গাড়োয়ানী ফ্যাশানের দশ আনা ছ'আনা চুলের ওপরে চিমনী প্যাটার্নের সিন্ধু টুপি পরে, তবু পুরুষের কাছে সে এমন চিত্তাকর্ষক থাকবে। মরাঠা পুরুষের চোখে মরাঠা মেয়েদের যে অপূর্ব রমণীয় ঠেকে এ তো স্বতঃসিদ্ধ, আমার চোখেও তাদের নারীর মতোই ঠেকেছে। দৃষ্টিকটু বোধ হচ্ছিল কেবল শ্রমিক-শ্রেণীর মেয়েগুলিকে; মালকোচ্চা মারা পালোয়ানদের বৃকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাপড় জড়িয়ে ঝাঁধলে যেমন। তখনও এদেরও অনেকটা তেমনি দেখায়। যেমন এদের ভারবহন ক্ষমতা, তেমনি এদের ছুটে চলার ক্ষিপ্রতা। আমাদের অঞ্চলের পুরুষরা পর্বত এদের তুলনায় কুঁড়ে।

মরাঠা পুরুষদের বাহুবল সবন্ধে যে প্রসিদ্ধি আছে সেটা সত্য নয়, অত্যন্তঃ আপাতদৃষ্টিতে। এদের মনের বল কিন্তু অসাধারণ। মুখের ওপর আত্মসম্মানবস্তুর এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতির মধ্যে লক্ষ্য করিনি। অর্থনৈতিক জীবনবৃদ্ধি কিন্তু মরাঠারা ওজরাটীদের কাছে হুটে লেগেছে। বয়ে শহরটার হিতি মহারাষ্ট্রেরই জিওগ্রাফীতে বটে, বয়ে শহরের জিওগ্রাফীতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের হিতি গলির বহিতে আর ওজরাটের হিতি শড়কের চারতলায়। বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মড়োয়ারী ঘোষের বাসা, মরাঠা বাঘের ঘরে তেমনি ওজরাটী ঘোষের বাসা। ওজরাটী মানে পারসীও বুঝতে হবে। পারসীদেরও মড়োয়ারী ওজরাটী। ইদানীং অবশ্য ওরা কায়-বাক্যে

ইংরেজ হবার সাধনায় লেগেছে।

গুজরাটী জাতটার প্রতি আমার কেমন এক রকম পক্ষপাত আছে। ওনেছি ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই ঠিক নিচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ। গান্ধীর মতো ভাব-শিল্পী যে জাতির মনের স্তন্যে পুষ্ট সে জাতির মনকে বাঙালীমনের অনুভূত ভাবা স্বাভাবিক। গুজরাটীরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশের ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের মনেরও আমদানী করছে এবং বিদেশী মনের সোনার কাঠি আমাদের মতো ওদের সাহিত্যকেও সোনা করে দিচ্ছে। তবুও এই যে, আমরা যা বইয়ের মারফৎ পাই ওরা তা সংসর্গের দ্বারা পায়।

গুজরাটী পুরুষরা যে পরম কণ্টনহিংসু ও কর্ণঠা এ তো আমরা দেশে থেকেও জানি, তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিদিত। গুজরাটী মেয়েদের মধ্যেও এই সব গুণ আছে কিনা জানি নে। তাদের পর্দা নেই, তবে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বলে গতিবিধির স্বাধীনতা মরাঠাদের চেয়ে কিছু কম। গুজরাটী মেয়েদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আমাদের মেয়েদের মতো; কাপড় পরার ভঙ্গিতে ইতরবিশেষ থাকলেও মোটের ওপর মিল আছে। মরাঠা মেয়েরা সচরাচর যে অন্তর্বাস পরে তার বুল বুলের নিচে পর্যন্ত—কোমরের কাছটা অনাবৃত ও শাড়ি দিয়ে ঢাকতে হয়। গুজরাটী মেয়েরা কিন্তু আপাদচূষী অন্তর্বাস পরে তার ওপরে শাড়ি পরে। ওনেছি আমাদের মেয়েদের অন্তর্বাস পরা শুরু হয় গুজরাটেরই অনুকরণে ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নীর দ্বারা।

আমাকে সকলের চেয়ে মুগ্ধ করল গুজরাটী মেয়েদের দেহের তনুভূষণ ও মুখের সৌকুমার্য। মরাঠাদের সঙ্গে এদের অমিল যেমন স্পষ্ট, বাঙালীদের সঙ্গে এদের মিলও তেমন স্পষ্ট। তবে বাঙালী মেয়েদের দেহের গড়নের চেয়ে গুজরাটী মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস; এবং বাঙালী মেয়েদের মুখশ্রীতে যেমন দ্বিগুণতার মাত্রাধিক্য, গুজরাটী মেয়েদের মুখশ্রীতে তেমন নয়।

পারসীরাই হচ্ছে এ অঞ্চলের Leaders of fashion। তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরূচিতেও অভিজাত। পারসী মেয়েদের জঁকালো বেশভূষার সঙ্গে ইন্দবদনের পর্যন্ত তুলনা করা চলে না। অন্ততঃ তিনপ্রহর অন্তর্বাস বাইরে থেকে লক্ষ্য করতে পারা যায়; শ্রোতাদেরও শাড়ির বাহার আছে। মরাঠাদের যেমন আঁচলের বাহার পারসীদের তেমনি পাড়ের বাহার। হালকা রঙের আদর এ অঞ্চলে নেই। হাজার হাজার নানা বয়সী মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকজন কিশোরীকেই হালকা রঙের শাড়ি পরতে দেখলুম। শাদার চল একমাত্র গুজরাটীদের মধ্যেই পরিলক্ষ্য। বলতে ভুলে গেছি গুজরাটী ও পারসীরা মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু ঘোমটার মতো করে নয়, খোঁপার সঙ্গে এঁটে। গহনার বাহুল্য নেই—আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলঙ্কার। পারসী মেয়েরা ইংরেজী জুতো পায় দেয়—গুজরাটী মেয়েরা সচরাচর কোনো জুতোই পায় দেয় না—মরাঠা মেয়েরা চটি পরে।

বম্বে শহর কলকাতার চেয়ে আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে সুন্দর। প্রায় চারিদিকে সমুদ্র, অদূরে পাহাড়, ভিতরেও ‘মালাবার হিল’ নামক অনুচ্চ পাহাড়, তার ওপরে বড় বড় লোকের সাজানো হর্ম্য। শহরের রাস্তাগুলি যেন প্ল্যান করে তৈরি। বম্বেবাসীদের রুচির প্রশংসা করতে হয়—টাকা তো কলকাতার মাড়োয়ারীদেরও আছে, কিন্তু তাদের রুচির নিদর্শন তো বড়বাজারের ‘ইটের পর ইট’! বম্বের প্রত্যেকখানি বাড়িরই যেন বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকেরই ডিজাইন স্বতন্ত্র। শহরটা ছবিল কিন্তু আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও বম্বে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়। বম্বের বাস্তুশিল্পের গায়ে যেন ইংরেজী গন্ধ পেলুন, তাও খাঁটি ইংরেজী নয়। তবু কলকাতার নাই-শিল্পের চেয়ে বম্বের কাণা শিল্প ভালো।

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

জাহাজে উঠে বসে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড় ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে ওটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হয়ে আলাদীনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল কুল পাখি মানুষ হয়ে আজন্ম আমার চেতনা ছেয়েছিল, এতদিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোপ্পদের মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পাগের তলার আরব সাগর, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার ক'রে দিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষা ঋতু, গনসূনের প্রভঞ্জনার্থতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা লকলক করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিকে কাৎ ক'রে একবার ওদিক কাৎ ক'রে যেন ফুটন্ত তেলে পাপরের মতো উন্টে পাণ্টে ভাজছে।

জাহাজ টলতে টলতে চলল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয়্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্রপীড়ায় প্রথম তিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কান্নার সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয়্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে প'ড়ে প'ড়ে বসনে ও উপবাসে দিনের পর রাত রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ-বা ভাবে মরণ হলোই বাঁচি, কেউ-বা ভাবে মরতে আর দেরি নেই। জানিমে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি, দুর্গানাম ক'রে কী হবে। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাডের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা',—মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে, প'ড়ে প'ড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে।

সদ্য-দুঃখার্হ বেষ্ট সংকল্প ক'রে ফেললেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিঠে চ'ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেললুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হ'য়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদভূমি সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়্যাও প'ড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে; কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি নে; তখন গভির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হ'য়ে যায়।

বিগত ও আগতের ভাবনা না ভেবে উপস্থিতির ওপরে দৃষ্টি ফেললুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পাছশালাটার মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া-শোওয়া-খেলা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে-কোনো বড় হোটেল থেকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড় নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিদ্ধ-জননীর দোল খেয়ে মনে হয় থোকাদের মতো দোলনায় শুয়ে দুলাছি। সমুদ্রপীড়া যেই সারল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কমল। শোবার সময়টা ছাড়া বাকী সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে কাটাতুম। ডেকে চেয়ার ফেলে ব'সে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হ'য়ে যায়; চারিদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশে পাশে ছাড়া ডেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়-স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্য সাগর, দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালীতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিরোধ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস বা পারেননি, লেসেপ্‌স্‌ তা পারালেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ঐটুকুর জন্যে ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা কোন্ যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটাতে গোটাকয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হ'তে হ'তে গত শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হ'য়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা হুপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি—যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী হুপতি লেসেপ্‌স্‌ একজন বিশ্বকর্মা—তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যারা নিত্য স্মরণ করেন, এই ভেবে তাঁরা একটি অপরাধ মার্জনা করুন।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের যে-কোনো ছোট নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড় জোর পথে প্রবাসে



দু'খানা জাহাজ পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে, কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। কেনালটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন করে লাগানো, যত্ন করে রক্ষিত, অন্যদিকে ধু-ধু করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। কেনালের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন যাদু আছে, দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিউবিস্ট এদের আপন খোয়ালমতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আর এক-একটা পাহাড়কে এক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্য সাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেড়িয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসী প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাথের ওপর বসে খেতে হয়, রাস্তায় চলবার সময় ডানদিক ধরে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ হলো নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল—কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাকের টাকা আর একজনের ট্যাকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে ব'লে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র ব'লে মিশরীরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশতে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে।

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্য সাগরে পড়লুম। শান্তিষ্ট ব'লে ভূমধ্য সাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন-কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্য সাগর 'Honesty is the best policy' করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার করে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকে মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেল্‌স পর্যন্ত জল ছাড়া ও দু'টি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, ষ্ট্রম্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বৃকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্‌স ভূমধ্য সাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, ফরাসীদের বন্দে মাতরম্ 'La Marseillaise'—এর এই নগরেই জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসী সহজিয়া কবিদের (troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence—বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্ব দিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মাবসান করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটলুম। মোটরে করে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেল্‌সকে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাক জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেল্‌স শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে করে যেতে যেতে ডানদিকে মোড় ফিরলে ঠেকেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁদিকে বেকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেল্‌সের অনেক রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুটপাথ।

মার্সেল্‌স থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যাল, ক্যাল থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লন্ডন।

লণ্ডনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হলো গোপালি লগ্নে। হ'তে না হ'তেই সে চক্ষু নত ক'রে আঁধারের ঘোমটা টেনে দিলে। প্রথম পরিচয়ের কুমার-বিস্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হ'য়ে যখন অধীর হ'য়ে উঠল তখন মনকে বোঝালুম, এখন এ তো আমারি। আবরণ এর দিনে দিনে খুলব।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি আকাশ কলের ধোঁয়ায় মুখ কালো ক'রে হিঁচকাদুনে ছেলের মতো যখন তখন চোখের জল ঝরাচ্ছে। সূর্যদেবের ঠিক-ঠিকানা নেই। সম্ভবতঃ তিনি কাঁদুনোটাকে কেপিয়ে দিয়ে মাস্টারের ভয়ে দুইছেলের মতো ফেরার হয়েছেন। লণ্ডনের চিম্নীওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে চেয়ে হাসছে, আর যে-দু'চারটে গাছপালার বহু কণ্ঠে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারা আমাদের অনূর্য্পশ্যাদের মতো চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতা খসখস করতে করতে হতভাগ্য আকাশটার দিকে ছলছল চোখে তাকাচ্ছে।

ক্রমে জানলুম এইটেই এখানকার সরকারি আবহাওয়া। মাঝে মাঝে এর নিপাতন হয়, গ্রীষ্মকালে এর ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সারা শীতকালটা নাকি এমনি চলে। কদাচ কোনোদিন আকাশের উঠোন নিকিয়ে নির্মল করা হ'লে রূপালী সূর্য উঠে ধূমলা নগরীকে বলে, 'ওড মণিৎ'। অমনি ঘরে ঘরে খবর রটে, পথে পথে পথিক দেখা দেয়, চেনামুখ চেনামুখকে বলে, 'হাও লাভলী! আজ সারাদিন যদি এমনি থাকে—'। মুখের কথা মুখ থেকে না মিলাতেই সূর্য বলে, এখন আসি,—বৃষ্টি বলে, এবার নামি,—একদল পথিক ভাবে ছাড়া না এনে কী বোকামি করেছি, আরেকদল পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোটখানা সঙ্গে ছিল। ইংলণ্ডের ওয়েদার এমনি খোশমেজাজী যে, খবরের কাগজওয়ালারা প্রতিদিন তার ভাবী চালের খবর নেয় ও কাগজের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠার সর্বোচ্চে ছেপ দেয়—কাল বাতাস প্রথমে পশ্চিম থেকে ও পরে নৈঋত থেকে বইবে, ক্রমশ তার বেগ বাড়বে, সূর্য গা-ঢাকা দেবে, কিন্তু বৃষ্টি জোর পড়বে না।

এ গেল লণ্ডনের অন্তরীক্ষের খবর। জলহলের বৃত্তান্ত বলা যাক।

লণ্ডন শহর টেম্‌স্‌ নদীর কূলে। কিন্তু গঙ্গা গোদাবরীর দেশের লোক আমি টেম্‌স্‌কে নদী বলি কেমন ক'রে? লণ্ডনের যে-কোনো দু'টো চওড়া রাস্তাকে পাশাপাশি করলে টেম্‌স্‌র চেয়ে এক এক জায়গায় কম-অপ্রশস্ত হয় না। ছোট হ'লে কী হয়, নদীটি নৌবাহু, বড় বড় জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়, বলিষ্ঠ শিশুর তবঙ্গী মায়ের মতো। লণ্ডনের যোজনজোড়া ভটায় জাহাবীর মতো ঐক্যে বেঁকে নিগমের পথ খুঁজছে, পিছু হটছে, মোড় ফিরছে। শহরের বাইরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন, তার কূল সবুজ মখমলে মোড়া। কিন্তু শহরের ভিতরে তার জল কলকাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ, কাশীর গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়। তার ধারে দাঁড়ালে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে; বাতাস তো নেই, আছে ধোঁয়া। ঝাপসা চোখে দু'ধারের দৃশ্য দেখি, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্থূপ, তাদের গায়ে বড় বড় হরফে বিজলী আলোর বিজ্ঞাপন—'মদ' কিংবা 'সিগারেট' কিংবা 'খবরের কাগজ'। ঐ তিনটে তিন রকমের বিষ এ দেশে প্রচুর বিক্রি হয়।

লণ্ডন শহর গোটা সাত আট কলকাতার সমান। আয়তন ছাড়া নতুন কিছু দেখবার নেই। সেই ট্রাম সেই বাস সেই ট্যাক্সি সেই ট্রেন, সেই গলি সেই বস্তি সেই মাঠ সেই প্রাসাদ। প্রভেদ এই যে, সমস্তই সুপারলেটিব, সমস্তই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতম অঞ্চলগুলিরও প্রত্যেকটি যেন এক একটি দক্ষিণ কলকাতা, ঐশ্বর্যে অতটা না হোক পরিচ্ছন্নতায় অতটা। এত বড় শহর, কিন্তু সেই

অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়। অবশ্য কনের কর্কশ আওয়াজে বাড়ির ভিৎ পর্যন্ত নড়ে এবং মেটিরের দাপাদাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড়দুড় করে, কিন্তু জনতার মুখে কথা নেই। ভিড়ের মধ্যে ফিসফিস করলেও শোনা যায়। ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁক নেই, তার চলন্ত বিজ্ঞাপন প'ড়ে বুঝতে হয় সে কি বেচতে চায় ও কত দামে। দুধওয়ালা ঘরে ঘরে দুধ বিক্রি ক'রে যাবার সময় এমন সুরে 'milk' বলে যে, শুনলে মনে হয় কোকিলের 'কু—উ', ডাকপিয়ন কাঠ-ঠোকরার মতো দরভায় দুই ঠোঙ্কর দিলে বুঝতে হয় দরকারি চিঠি এসেছে, রুটিওয়ালা মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'চি-চিং ফাঁক' আছে, সেই সঙ্কেত শুনলে বন্ধ দুয়ার আপনি খুলে যায়, অর্থাৎ বাড়ির ঝি দরজা খুলে দেয়। এক কথায় বলতে গেলে এখানে হাটের মধ্যে তেমন ইট্টগোল নেই, যেমন আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু এতটা নিস্তব্ধতা কি স্বাভাবিক, না সুন্দর? সুর ক'রে 'দই নেবে গো, মিষ্টি দই' হাঁকতে হাঁকতে চুড়ি বাজিয়ে যাওয়া সুন্দর, না শিঠে বিজ্ঞাপন এটে বোবার মতো পায়চারি করা সুন্দর? এ দেশে নিরক্ষরতা নেই ব'লে এদের কানের ক্রেশ কমছে, কিন্তু চোখের জ্বালা? বিজ্ঞাপনওয়ালারা বেন পণ ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঁহুল গুঁজে বোঝাবে যে, বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপটা চোখ পেতে শুনতে।

লণ্ডনের পথে পথে রথযাত্রার ভিড়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। পুলিশের বন্দোবস্ত অতুলনীয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, পুলিশের নয়, জনতার। শৃঙ্খলা মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে, কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে, লাইনের পিছনে লাইন, যে লোকটা সকলের শেষে এসে পৌঁছল সে লোকটা মাত্র দুটো কনুইয়ের জোরে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না, যে আগে এসেছে সে আগে, যে পরে এসেছে সে তার পিছনে কিংবা পাশে। রেলের টিকিট করতে হবে, ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি ইত্যর ভাষার গালাগালি কোনোটাই কোনো কাজে লাগবে না; যে আগে আসবে সে আগে দাঁড়াবে, তার পিছনে তার পরের জন, তার পিছনে তার পরের। ড্রিলের ভাষায় যাকে file বলে কিংবা চলতি ভাষায় যাকে queue বলে তেমনি ক'রে সকলে দাঁড়ালে পরে একজনের পর একজন টিকিট নেবে; সিঁড়ি দিয়ে একে একে ট্রেনের কাছে যাবে, ট্রেনের থেকে যাদের নামবার কথা তারা নামলে পরে ট্রেনে যাদের ওঠবার কথা তারা উঠবে এবং জায়গা থাকে তো আগে মেয়েরা বসবে, না থাকে তো যারা আগে থেকে ব'সে আসছে তারা উঠে মেয়েদের জায়গা দিয়ে নিজেরা দাঁড়াবে। এইটুকু করতে আমাদের দেশে হাত পা মুখ কান সব ক'টা অদের কনরং হ'য়ে যায়, বিশেষ ক'রে কানের। এ দেশে কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে সারা হয়। ট্রেনে চ'ড়ে হনুমানজীর ভজন কিংবা পটলার মা'র পুরাবৃত্ত শুনে বখির হ'তে হয় না। কিন্তু এদের এই নিঃশব্দ প্রকৃতি আবার নিছক ভালো লাগনি। ট্রেনে পাশাপাশি বসতে না বসতেই দেশের মতো কেউ গায়ে প'ড়ে পিড়িপিতামহের নাম শুধায় না, বিয়ে হয়েছে কি না, ক'টি ছেলেমেয়ে, কত মাইনে, কত উপরি পাওনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেরা ক'রে উদ্ভক্ত করে না; কিন্তু ঐ অনাহুত উপদ্রবের মধ্যে মানুষের ওপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক দাবী থাকে,—অন্তরঙ্গতার দাবী, সামাজিকতার দাবী, —মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব। এ দেশের লোকও ও দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়। 'আজ দিনটা বড় ঠাণ্ডা, না?' 'তা ঠাণ্ডাই বটে।' এমন ক'রে আলাপ আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশি দূর এগোয় না, কারণ কথাবার্তার পুঁজিই হলো ওয়েদার; পুঁজি ঘুরোলে নিঃশব্দে সিগারেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না। এরা বাচাল নয় বটে, কিন্তু বাক্পটুও নয়। কথোপকথনের আর্ট এদের অজানা।

বলেছি লণ্ডন শহরে নতুন কিছু দেখবার নেই, আয়তন সমৃদ্ধি ও সজ্জা ব্যতীত। তবু

মোটোগাছের গোট। কয়েক প্রভেদ স্থলদৃষ্টি এড়ায় না। এই যেমন মাটির নিচে টিউব বা ইলেকট্রিক রেলরাস্তা,—যেন পাতালপুরীর রাজপথ। বাতীরি নিচে নামছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল যাচ্ছে, ট্রেন থেকে নেমে মাটির ওপরে উঠে আপিস আদালত করছে। মাটির নিচে রেল, মাটির ওপরে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি। কিংবা যেমন কলে পয়সা ফেললে সিগারেট চকোলেট সর্দি কাশির ট্যাবলেট থেকে আরম্ভ ক'রে রেলের টিকিট ডাকঘরের স্ট্যাম্প মানের জল উনুনের আগুন পর্যন্ত আপনা আপনি হাজির হয়, যেন দেবতার বাহন, স্মরণমাত্র উপস্থিত। কিংবা উঁচু নিচু পাহাড়কাটা রাস্তা, দু'ধারে একই প্যাটার্নের একই রঙের একই সাইজের এক-এক গারি বাড়ি, একটা দেখলেই একশোটা দেখা হ'য়ে যায়। বাড়ির আশে পাশে হয়তো এক টুকরো সবুজ, সবুজের ওপরে এক ঝলক রক্ত বা একমুঠো হরিদ্রা। কিংবা যেমন শহরের স্থানে স্থানে মাঠ, গড়ের মাঠের চেয়ে চওড়া তাদের বুক, কিন্তু তেমন চিকুণ নয়, বন্ধুর। পাহাড়-বক্ষ হ'তে ফীরখারার মতো হৃদ-রেখা নেমেছে; সেই কৃত্রিম হৃদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাসায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায় দিন কাটায়। মাঠের নেজের ওপরে সবুজ দুর্বীর কাপেট বিছানো, এত সবুজ আর প্রচুর যে, মূহূর্তকাল অনিশেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্ডিস্ জন্মায়, তখন যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকে সবুজ। কালো কুৎসিত চিমনারি ধোঁয়ায় চোখ যখন নির্জীব হ'য়ে আসে তখন ঐ এক ফোঁটা সবুজ আরক তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।

লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছপালায় গহন, গাছেদের মাধ্যম সেনালী চুল। দুঃখের কথা এ দেশের ফুলে গন্ধ নেই। গুণ নেই রূপ আছে, ফুল নয় তো ফুলবাবু। তাই হাওয়া ফুলের গন্ধে বেহেঁস হয় না, রাত ফুলের গন্ধে উতলা হয় না, মানুষের একটা ইন্ড্রিয় বুড়ু থেকে যায়। মাঠ বা পার্কগুলি এদের ন্যাশনাল প্রে-গ্রাউণ্ড। সেখানে ছোট ছেলেরা গাছে ওঠে, ছোট মেবেরা বল নাচায়, কিশোরেরা ঘুড়ি ওড়ায়, কিশোরীরা বাড়ি রেখে দৌড়ায়, যুবক যুবতীরা টেনিস খেলে, বৃদ্ধেরা ব'সে ব'সে ঝিমায়, বৃদ্ধারা কুকুরের শিকলহাতে হুক্‌হুক্‌ ক'রে হাঁটে। সেখানে থোকাবাবুরা খুকুমণিরা ঠেলাগাড়িতে চ'ড়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হ'ন, মায়েরা ঠেলতে ঠেলতে চলেন ও চেনামুখ দেখলে ফিক ক'রে হেসে দুটো কথা ক'য়ে নেন, বাবারা সময় ক'রে উঠতে পারলে থোকা-খুকুর সফরে মায়ের সহগামী হ'ন, এবং সেখানে যুগলের দল 'আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।'

মাঠ বা পার্কগুলিতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ বুঝতেই পারা যায় না যে, লণ্ডনের ভিতরে আছি। জনসমুদ্রের মাঝখানে এগুলি এক-একটি দ্বীপ, দ্বীপের চারিধারে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, সেখানে অনন্ত কলরোল। কিন্তু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছায় না, তার দুঃখ, মিলিয়ে আসে, সবুজ আসন পেতে মাটি বলে, 'একটু বসো', সোনালী চামর চুলিয়ে গাছেবা বলে, 'একটু জিরিয়ে নাও'। কিন্তু লণ্ডনের মানুষকে শান্তির মস্ত্রে বশ মানানো যায় না, দু'দণ্ড সে হির হ'য়ে বসতে চায় না, উদ্ভিদের মতো স্থাবর হ'তে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর। কাজ আর অকাজ তাকে নানান সুরে ডাকে, তার ব্যস্ততার ইয়ত্তা নেই। যেখানে সে আপিস করতে শেষার কিনতে টাকা রাখতে যায় সেখানটার নাম সিটি, প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে লণ্ডনের পত্তন হয়। সিটির পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট এণ্ড। সে অঞ্চলে লোকে বাজার করতে আনোদ করতে আহা করতে যায়, সেখানে বড় বড় দোকান বড় বড় হোটেল বড় বড় ক্লাব বড় বড় থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কন্সার্ট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী। সিটিতে বড় কেউ বাস করে না, ওয়েস্ট এণ্ডে ধনীরা বাস করেন। দরিদ্রদের জন্যে ইস্ট এণ্ড আর মধ্যবিত্তদের জন্যে শহরভলীগুলো। এগুলি মোটের ওপর নিরীলা স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে, এদের নগরকল্পনায়

বিশিষ্টতার স্থান নেই। সবটা ভুড়েছে ইউটিলিটি বা প্রয়োজনীয়তা। সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব কার না দরকার? কিন্তু সেই দরকারটাই চরম হলো, সৌন্দর্য হলো অব্যাহত। তাই দেখি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথ ঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটি বাড়ি ঘর, কিন্তু রাস্তার সব কটা বাড়ি একই ধাঁচের, একেবারে হুবহু এক, যেন এক ছাঁচে ঢালা সীসের টাইপ। এরা সৈনিক নাবিকের জাত, কচি বয়স থেকে ড্রিল করতে অভ্যস্ত, সারি বেঁধে গির্জায় যায়, সারি বেঁধে ইস্কুল থেকে ফেরে, এদের চালে চলনে উঠতে বসতে ড্রিল। তাই এদের ঘরবাড়িগুলো পর্যন্ত লাইন বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রেখে এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে খাড়া, তাদের সকলের গায়ে ইউনিফর্ম, তার একই মাপ একই রঙ একই রেখা একই গড়ন। চোখের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হ'য়ে তাকাই আর ফোভে নৈরাশ্যে মরীয়া হ'য়ে উঠি। শুনলুম সমগ্র ইংলণ্ড নাকি সপ্তাহের একই বারে কাপড় কাচতে দেয়, একই বারে কাপড় ফিরে পায়।

শহরের যে-কোনো রাস্তায় পা দিলে যে দশটা দোকান সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তাদের গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তোরাঁ, একটা সিগারেটের একটা জামাকাপড়ের ও একটা আসবাবের দোকান, একটা খবরের কাগজের স্টল, একটা চুল সাজাবার সেলুন, একটা ব্যাঙ্ক। এর ওপরে যদি টিপ্পনির দরকার হয় তো বলি, rum খেয়ে নাকি এরা Somme জিতেছিল, তাই সোমরসের এত আদর। রবিবারেও যে তিনটি দোকান খোলা থাকে তাদের নাম মদের দোকান, সিগারেটের দোকান, খবরের কাগজের স্টল। সিগারেট সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ওর একটা ডিবে কাছে না থাকলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না, কারুর সঙ্গে দেখা হলেই ওটা সামনে ধ'রে বলতে হয়, 'নিতে আজ্ঞা হোক'। এ দেশের মেয়েরা যখন ভালোমন্দ উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুধমিণী হবেই ব'লে কোমর বেঁধেছে তখন তাদের কারুর আলতা পরা মুখে আওন জ্বলতে দেখলে আশ্চর্য হইনে, কিন্তু কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যখন স্মার্ট দেখাবার লোভে চিব্বকের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সিগারেট নকলক করতে করতে ভুরু কাঁপিয়ে মাথা নাচিয়ে কথা বলেন তখন রিজেন্টস পার্ক চিড়িয়াখানার দৃশ্যবিশেষ মনে প'ড়ে যায়। দৃশ্যটা আর কিছু নয়, বান্দরদের টি-পার্টি। মানুষকে ওরা অবিকল নকল করতে পেরেছিল, দুঃখের বিষয় তবু কেউ ওদের মানুষ ব'লে ভুল করলে না। এদিকে আমি যুবকদের সঙ্গে কথা ক'রে দেখেছি ওরা নিজেরা সিগারেট খায় ব'লে কুণ্ঠিত বোধ করে ও নিজের বোনকে খেতে দেখলে লজ্জিত বোধ করে; কিন্তু পরের বোনকে খেতে দেখলে কেমন বোধ করে এ প্রশ্ণটার উত্তরে তাদের মতবিচ্ছাতি দেখা গেল। অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

রেস্তোরাঁ যে এ শহরে কত লক্ষ আছে তার গণনা চলে না। আহারের জন্যে রেস্তোরাঁ, নিদ্রার জন্যে ক্ল্যাট বা ক্লমস—সাধারণ গৃহস্থের জন্যে এই হচ্ছে এখানকার ব্যবস্থা। এ দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালী গড়া এ দেশের বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। বাদের সঙ্গতি আছে তারাও বাড়িতে না খেয়ে বাইরে খায় এই জন্যে যে, সারাদিন যেখানে জীবিকার জন্যে খাটতে হয় বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে, কিংবা বাড়িতে রান্না করতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুর বাজারদর রেস্তোরাঁর খাবার খরচের চেয়ে বেশি, কিংবা বাড়িতে অল্প সংখ্যক লোকের রান্নায় যত খরচ রেস্তোরাঁর বহুসংখ্যক লোকের রান্নায় সে অনুপাতে কম। কথা উঠবে তবে বাড়ির মেয়েরা করে কি? তার জবাব এই যে, বাড়ির মেয়েরাও আপিস করে। সকলে নয় অবশ্য, কিন্তু অনেকে। তরুণী মাত্রেরি স্কুল কলেজে যায়, বয়স্ক মাত্রেরি কোনো কাজ আছে। মায়েরাও ছেলোদের ইস্কুলে দিয়ে কাজে যায়, তবে কোলের ছেলে হ'লে তার গাড়ি ঠেলে মাঠে নিয়ে যায়, খোকা যতক্ষণ হাওয়া খায়, অন্ততঃ ফীডিং বটল চুষে দুধ খায়, খোকান্ন মা ততক্ষণ জামা সেলাই

করে। কাজ করে না, বঁসে খায়, এমন লোক তো দেখছিলাম; যার আর কিছু না জোটে সে একটা সভাসমিতি খুলে বসে। সে সব সভাসমিতির উদ্দেশ্যও বিচিত্র; কোনোটার উদ্দেশ্য জবাই করবার অনিচ্ছার উপায় উদ্ভাবন, কোনোটার উদ্দেশ্য সদস্যদের মৃতদেহ কবরস্থ না ক'রে অগ্নিসং করা। ভালো মন্দ দরকারি অদরকারি কত রকমের অনুষ্ঠান যে এ দেশে আছে তার আভাস পাওয়া যায় রবিবারের দিন হাইড পার্কের বেড়ার ভিতর প্রবেশ করলে। একখানা ক'রে চেয়ার ঝোপাড়ে ক'রে তার ওপরে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কত বক্তাই যে ভূমিতে দণ্ডায়মান বা সশ্মুখ দিয়ে চলন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে কত তত্ত্বই প্রচার করেন তার সংখ্যা হয় না। এ দেশে ধর্মের হাজারো সম্প্রদায় আছে, রাজনীতির হাজারো দল আছে, বক্তৃতা দেওয়া কাজটাও কঠিন নয়, আর লোকের ভিড়ের ভিতরে এমন দশপঁচিশ জন অথও ধৈর্যশীল সহিষ্ণু শ্রোতা বা শ্রোত্রী কি পাওয়া যাবে না যারা অন্ততঃ পাঁচটি মিনিট বিনিময়সায় গলাবাজি দেখবে বা নাম-সংকীর্তন শুনবে? এমনি ক'রেই পাবলিক ওপিনিয়ন সৃষ্ট হয়। শ্রোতার তর্ক করে, টিটকারি দেয়, এক বক্তার লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আরেক বক্তা উঠে-তা বক্তৃতা শোনায, তবু সে বক্তার মেজাজ তরুর চেয়ে সহিষ্ণু ও সংকল্প মেরুর মতো অটল, একটিও যদি শ্রোতা না রয় তবু তার বাক্যের ফোয়ারা ফুরোবে না। হাতে কোনো একটা কাজ না থাকলে যেন এরা বাঁচতে পারে না, জীবন ফাঁকা ঠেকে। চুপ ক'রে বঁসে থাকা এদের ধাতে নয় না, তাই ছুটি পেলে এরা বড় বিব্রত হ'য়ে ভাবে ছুটি কেমন ক'রে কাটাবে। ভিক্ষা করা এ দেশে আইনবিরুদ্ধ; করলে কঠিন সাজা। তাই ভিক্ষুকোও কোনো একটা কাজ করবার ভান ক'রে পয়সা রোজগার করে, হয় দু'পয়সার দেশলাই চারপয়সায় বেচে অর্থাৎ বেচবার ভান ক'রে হাত পাতে, নয় ফুটপাথের ওপরে ছবি একে পথিকদের সামনে টুপি খোলে, নয় কিছু একটা বাজিয়ে বা গেয়ে দাতাকে খুশি করে, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না যে, 'ভিক্ষা দাও', বললেই পুলিশে ধ'রে নিয়ে যায়। এত কথা এ প্রসঙ্গে বলবার উদ্দেশ্য, এরা কাজ জিনিসটাকে কি চক্ষে দেখে তাই বোঝানো। নিষ্ক্রিয়তাকে এ দেশে ধর্ম বলে না।

জামাকাপড়ের দোকানের এত বাহুল্য কেন? একটা কারণ, শীতের দেশের মানুষ কখন সফল ক'রে ধুনি জ্বালিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে পরকালের ধ্যান করলে পরকালের দিন মনিয়ে আসে, দেহ সম্বন্ধে নির্বিকল্প হ'লে দেহীমাত্রই বরফ হ'য়ে যায়, তাই পথের ভিখারীরও গায়ে ওভারকোট ও পাত্রে বৃত্তজ্বতো চাই। মেয়েরা স্মার্ট হুয় ক'রে ও গলা খোলা রেখে পরিধেয় সংক্ষেপ করেছে বটে, তবু ওদের পরিধেয় শুধু একখানা শাড়ির মতো সরল নয়। আর একটা কারণ, আংটি বা হার বা দুল ছাড়া অন্য অলঙ্কার বড় কেউ পরে না, তাই ভূষণের রিজতার ক্ষতি পূরণ করতে হয় বসনের বাহারে। একটু আগে বলেছি এদের নগর-স্থাপত্যে বিউটির চেয়ে বড় কথা ইউটিলিটি। এদের বেশভূষা সম্বন্ধেও ওকথা সমান খাটে। মেয়েরাও এখন কাজের লোক হয়েছে, গর্জেন্দ্রগমনে চললে ট্রেন ফেল ক'রে আপিস কামাই ক'রে বসবে সেই আশঙ্কায় পক্ষিরাজের মতো মাটি ছুঁয়ে ওড়ে, ছুটে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনের ওপরে লাফ দিয়ে ওঠে, জায়গা পেলে বসে, না পেলে দাঁড়ায়, এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট না ক'রে খবরের কাগজ কিংবা গল্পের বই বার ক'রে পড়তে আরম্ভ ক'রে দেয়। ছুটোছুটির সুবিধার জন্যে স্মার্টের খুল হাঁটুর ওপরে উঠে কোমর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। দম আটকাবার ভয়ে গলার ফাঁস খুলতে খুলতে আবক্ষ বিস্তৃত হচ্ছে, স্নান-প্রসাধন সূকর হবে ব'লে মাথার চুল হেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে শরীর হালকা লাগছে, প্রতি অঙ্গে বাতাস লাগছে, স্বাস্থ্য ভালো থাকছে, স্বাস্থ্যজনিত শ্রীও বাড়ছে, এক কথায় ক্রীজাতির তথা সমাজের বহুতর উপকার হচ্ছে; ইউটিলিটির দিক থেকে জয়ডায়কার। এবং এর দরুন মেয়েরা যে সেক্সুয়াল্‌ বা পুরুষানী হয়ে উঠছে এমনও নয়। নারীর নারীত্ব যে সাগরতলের চেয়েও অতল; পরিবর্তন সে তো

জনপুষ্ঠের বৃদ্ধ, কোনো কালেই তা অতলস্পর্শী হতে পারে না; বিপ্রবেশের মন্দর দিয়ে মখন ক'রেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়তে পারা যায় তার সুখ আর তার বিষ।

পরিবর্তনকে আমি দোষ দিইনে, আর ইউটিলিটিকে আমি মহামূল্য মনে করি। তবু আমার ধারণা, এ যুগের নারীর পরিচ্ছদ যদি এ যুগের নারীর প্রতিবিম্ব হয় তবে বিষ দেখে বলতে পারি বিশ্ববতী সুন্দরী নয়। নারীত্বের বিষ যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সুখও যাচ্ছে। পরিচ্ছদকে উপলক্ষ্য ক'রে এত কথা বলবার অভিপ্রায়—পরিচ্ছদ তো কেবল নগ্নতার আচ্ছাদন বা শীত বর্ষার বর্ম নয় যে, তার প্রয়োজনীয়তাই তার পক্ষে চূড়ান্ত হবে; পরিচ্ছদ যে দেহেরই সম্প্রসারণ, দেহেরই বহির্বিকাশ, দেহের চারিপাশে সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল। এরা জীবনকে ব্যস্ততায় ভ'রে এমন সংক্ষিপ্ত ক'রে আনছে যে, মানুষের মনের আর সে-অবসর নেই যে-অবসর নইলে মানুষ নিজের পরিমণ্ডল নিজে রচনা করতে পারে না। তখন ডাক পড়ে পোশাক-বিক্রেতার আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে এবং পোশাক-বিক্রেতার দোকানের ম্যানীকিনদের। গণতন্ত্রের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে মস্তিষ্কমণ্ডলীর কাছে, আর গণতন্ত্রের রুচি বন্ধক দেওয়া হয়েছে লার্জ ক্লেন্স ম্যানুফ্যাকচার-ওয়ালাদের কাছে। যখন দেখি আজানুলব্ধ আলখান্নার মতো লোমশ ওভারকোটের অন্তরালে নারীদেহের contour (রেখাভঙ্গি) ঢাকা পড়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল কচ্ছপের খোলার ভিতর থেকে বা'র করা আজানু-উন্মুক্ত পা দুটি, আর টুপির দ্বারা রাখপ্রস্ত মুখটি, তখন মনে হয় যেন দু'টি চলন্ত স্তম্ভের ওপরে কালো বা মেটে রঙের একটি বস্তু উপুড় করা হয়েছে, সেই বস্তুর পৃষ্ঠভাগ একেবারে প্লেন, তার কোথাও একটা রেখা বা একটা বক্রণী নেই, কটির হিতি যে কোন্‌খানে আর পরিধি যে কতখানি তা অনুমান ক'রে নিতে হয়।

পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, কারণ পুরুষ চিরকাল কাজের লোক, সে যে ইউটিলিটি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে এত বড় প্রত্যাশা তার কাছে করা যায় না। মজার কথা এই যে, নারীর পোশাক যত সরল হচ্ছে পুরুষের পোশাক তত জটিল হচ্ছে; তার আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে মোড়া, সে-পোশাকের স্তরের পর স্তর, আঙার ওয়ারের ওপরে আঙার ওয়ার, কোটের ওপরে ওভারকোট, জুতোর ওপরে জুতো, মোজার ওপরে স্পাট, টাই-কলারের ওপরে মাফলার!

শীতের দেশের লোককে বিছানা পুরু করবার জন্যে লেপ কব্বলের বহল আয়োজন করতে হয়, আর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ প'রে মেজের ওপরে শোওয়া বসা চলে না ব'লে খাট পালঙ্ক কৌচ সোফা চেয়ার টেবিল দরকার হয়। এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড, হাতনুখ ধোবার সরঞ্জাম, প্রসাধনের আরনা-দেবোজ, রামার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরীব-দুঃখীরও চাই। দেশে আমাদের বাড়ির ঝি বারান্দার ছেঁড়া মাদুর পেতে গায়ে ছেঁড়া কব্বল জড়িয়ে শীতের দিনে ঘুটের আগুন পোহায়। এখানে আমাদের বাড়ির ঝির জন্যে স্বতন্ত্র ঘর, ঘরের মেজেতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ওয়ালপেপার আঁটা, লোহার খাটে আধ ফুট পুরু বিছানা, ঘরের একপাশে অগ্নিস্থলী, সেখানে কয়লা পোড়াতে হয়, একপাশে টেবিল চেয়ার আয়না দেবোজ আলনা, সিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানলায় নম্রাকাটা পর্দা। এই জন্যেই এ দেশে আসবাবের দোকান এত। দোকান থেকে আসবাব ভাড়া ক'রে আনতে হয় কিংবা কিনে এনে মাসে মাসে দামের ভগ্নাংশ দিতে হয়। আসবাব সম্বন্ধেও ইউটিলিটির সঙ্গে বিউটির ছাড়াছাড়ি। সৌষ্ঠব আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য নেই,—বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু কলে-ভৈরি প্রাণহীন বৈচিত্র্য। যন্ত্ররাজ বিভূতির কল্যাণে একালের রামশ্যামও সেকালের রাজরাজডাণ্ডার চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে। শতায় বাদসাহী চালে চলছে, কিন্তু রামের সঙ্গে শ্যামের এখন একতিলও তফাৎ নেই; রামের নাম ৪৬৬ তো শ্যামের নাম ৪৭৬;

নামের তফাৎ নেই, সংখ্যার তফাৎ। 'কলি' যুগ বটে!

আমাদের বাড়ির ঝি ফুরসৎ পেলেই খবরের কাগজ পড়ে, কোনো কোনো দিন পরিবেশন করার ফাঁকে। এই থেকে বুঝতে হয় এ দেশে খবরের কাগজের কেমন প্রচার ও প্রভাব। যে কাগজ আমাদের ঝি পড়ে সে কাগজে গুরুগম্ভীর লেখা থাকে না, তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আধ কলমও নয়, সম্পাদক মহাশয় হালকা সুরে গ্রেহাউণ্ড রেসিং বা শরৎকালের ফ্যাশান সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে আমাদের ঝি ঠাক্করণের সন্তোষবিধান করেন, উচুদরের রাজনৈতিক চাল বা অর্থনৈতিক সমস্যার ধার দিয়েও যান না; সংবাদের কলমে থাকে খেলাধুলা, ঘোড়দৌড়, চোরডাকাত, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ ইত্যাদি চটকদার ও টটকা খবর। আদালতে কে কৈদেছে, এরোপ্লেনে কে হেসেছে, থিয়েটারে কে নেচেছে তাদের ফোটো তো থাকেই, সময় সময় তাদের সঙ্গে 'আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি'র সাক্ষাৎকারের লোমহর্ষণ বিবরণ থাকে। আনাদের দেশের কাগজের সঙ্গে এ দেশের কাগজগুলোর মস্ত একটা তফাৎ এই যে, এ দেশের কাগজে গালাগালি থাকে না। ক্যাথেরিন মেয়োর ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে বেশ্যা ব'লে গালাগাল দেওয়াটা ইতরতা। অমন ইতরতা এ দেশের কাগজওয়ালারা এদের প্রধানতম শত্রুদের বেলোও করে না। পাগল কাগজখানার পেশাই হচ্ছে ভাঁড়ামি, কিন্তু সে ভাঁড়ামির মধ্যে অম্লীলতা থাকে না। এ দেশে ক্যাথেরিন মেয়োর যারা প্রশংসা গেয়েছে তারা স্পষ্ট ক'রে বলতে ভোলেনি যে, লেখিকা ইংরেজ নয়, আমেরিকান; এবং অনেকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ লেখক হ'লে কুরুচি-পরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ করত না। বাস্তবিক, অম্লীলতা সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির একটা স্বাভাবিক ভীরুতা আছে, তাই এ দেশের খবরের কাগজে কেলেকারির বর্ণনাটাও নিচু গলায় হয়। মোটকথা, রেসপেকটেবল ব'লে গণ্য হবার জন্যে এ দেশের 'ইতরেজনাঃ'র একটা ঝোঁক আছে, তাই ডেলী হেরাল্ডকেও টাইমসের আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। আমাদের ঝি-ঠাক্করণের শ্রেণীর মেয়েরাও মনে মনে এক-একটি লেডী। ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা কমেছে, কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এ দেশ কুলীনকে অস্ত্রাজ্য না ক'রে অস্ত্রাজকে কুলীন ক'রে তুলছে।

এর পরের প্রসঙ্গ, চুল সাজাবার সেলুন। এই জিনিসটা আগে এ দেশে পুরুষদের জন্যে অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং সংখ্যায় অর্ধেক ছিল। এখন মেয়েরা হয় পুরুষের নতো ছোট ক'রে চুল ছাঁটে, নয় হরেক রকমের বাবরী রাখে। শিংল করাটা একটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ আর্টের আর্টিস্ট হচ্ছেন নরসুন্দর আর তুলি হচ্ছে তাঁর কাঁচি। যার চুল যেমন ক'রে শিংল করলে মানায় তার চুল তেমন ক'রে শিংল করাটা যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। তবে ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য, মাসে মাসে নরসুন্দরকে খাজনা ওনতে হয়। চুল ছাঁটে নাকি মেয়েরা সোয়ান্তি পায়। সম্ভবতঃ পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই ইউটিলিটির প্রশ্ন। আগে ইউটিলিটি, তার পরে ওয়র্ল্ড ওপরে একটু সৌষ্ঠবের ব্যবস্থা, সেজন্যে নরসুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া, নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুফ্যাকচার করা। ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটারশিল্পটা বিদ্যুৎচালিত কারখানা শিল্পে পরিণত হবে না তো? সুন্দরীরা দলে দলে কলের নিচে মাথা পেতে slot-এ ছ'পৈনি ফেললে আপনা আপনি চুল ছাঁটা টেরি কাটা ঢেউ খেলানো, শিং-বাঁকানো কান-ঢাকানো কলপ-মাখানো পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হবে না তো?



এবার ব্যাকের কথা ব'লে আজকের মতো পাংতাড়ি গুটাই। সকল বাবুয়ানা সঙ্গেও ইংরেজরা হিন্দাবী জাভ, যেমন ফুর্তি করে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটায় বহুগুণ সঞ্চয় করে। ব্যাক হচ্ছে প্রত্যেকের খাজাঞ্চিখানা ঘরে টাকা না রেখে সেইখানে গছিয়ে দেয় ও দরকার হলেই চেক লিখে দেয়। আমাদের বাড়ির ঝিও ব্যাকের টাকা জমা দেয়, সে টাকা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে খাটে, তার থেকে সে সুদ পায়। ইংলণ্ডে অগণ্য ব্যাক আছে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যাকের শাখা। পাড়ায় ঐ ব্যাকটি না থাকলে পাড়ার ঐ ন'টি দোকানও থাকত না, ইংলণ্ডের এ সমৃদ্ধিও থাকত না, আমাদের বাড়ির ঝি টাকা না জমিয়ে উড়িয়ে দিত কিংবা মাটিতে পুঁতে টাকার ব্যবহারই করত না। ব্যাক থাকায় আমাদের বাড়ির ঝি'র দশ বিশ টাকা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরছে, এই মুহূর্তে হয়তো নিউজিল্যান্ডের চাষারা ও-টাকা ধার নিলে, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকেরা ও-টাকার সুদ দিলে, কিংবা হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ও-টাকার শেয়ারে ওর দুগুণ ভিভিডেও ঘোষণা করলে।

## ॥ তিন ॥

নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক'টা ইন্দ্রিয় এক সঙ্গে এমন সচেতন হ'য়ে ওঠে যে, মিষ্টানের দোকানে শিঙর মতো মানুষ কেবলি উতলা হ'য়ে ভাবে, কোন্টা ছেড়ে কোন্টা দেখি, কোন্টা ছেড়ে কোন্টা শুনি, কোন্টা রেখে কোন্টা নিই। একান্ত তুচ্ছ যে, সেও নবীনদের রসে ডুব দিয়ে রূপ-কথার দাসী-কন্যার মতো রাণীর যৌবন নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, দেখ দেখ আমাকে দেখ, আমি ভালো নই মন্দ নই, সুন্দর নই কুৎসিত নই, আমি রূপবান আমি নতুন। তখন মানুষের ভিতরকার রসিকটি দেহ-দুর্গের চার দেয়ালের দশ জানলা খুলে দিয়ে জানলার ধারে বসে। সে নীতিনিপুণ নয়, সে ভালোমন্দ ভাগ ক'রে ওজন ক'রে বিচার করতে পারে না, সে কেবল দেখতে শুনে চাখতে ছুঁতে চায়; কিন্তু কত দেখবে কত শুনেবে কত চাখবে কত ছোঁবে! হয়, আমার যদি সহস্রটা চোখ সহস্রটা কান থাকত, আর থাকত সহস্রটা—না, না, পাঁচশোটা—মন, তাহলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞ আমার নিমন্ত্রণ এমন ব্যর্থ যেত না। তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে বাতির নিচে আগুনের দিকে পিঠ ক'রে ব'সে 'বিচিত্রা'র জন্যে ভ্রমণকাহিনী লিখতুম না, আমি আরেক বিচিত্রার দ্যুলোক-ভুলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী?—হায়, লণ্ডনের কি দ্যুলোক আছে! লণ্ডনের লক্ষ্যপূরীতে ভুবনের ঐশ্বর্য আহত, কিন্তু লণ্ডনের আকাশ নেই, সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারা নেই। দিনের পর দিন যায়, সূর্য ওঠে না, আকাশ মানিন্দীর মতো মুখ আঁধার ক'রে রাখে, আর আমরা নিরীহ লণ্ডনবাসীরা পিতামাতার স্বপ্নে অবোধ শিঙর মতো অবহেলিত হ'য়ে আলোর ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হই। আমাদের জ্যেষ্ঠরা যারা লণ্ডনের কোলে দীর্ঘকাল আছেন তাঁরা হিন্দু বিধবার মতো উপবাস সহিতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমরা কনিষ্ঠরা আলোর দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক, ভাল ভাতের বদলে মাংস রুটি খেয়ে দেহ ধারণ করতে যদিচ পারি, তবু সূর্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে এলে, শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে অর্জুন যেমন গাণ্ডী তুলতে অক্ষম হয়েছিলেন,

রবির বিরহে কবিতা লিখতে তেমনি অক্ষম হন। আলোর দেশের মানুষের দেহ আলোর সঙ্গে ছন্দ রেখে গড়া, তার লোমকূপে-কূপে আলোর আকাঙ্ক্ষা জঠরজ্বালার মতোই সত্য। সেই দেহের ওপরে বখান সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনবচ্ছিন্ন অঙ্গকারের চাপ পড়ে তখন মন বেশি দিন অবস্থির ছোঁয়াচ এড়াতে পারে না, সূর্যাস্তের পরে তরুর মতো মাথা যেন নিভেজ হ'য়ে নুয়ে পড়ে।

এক একদিন কালো কুয়াশায় দিনের ভিতর রাতের জের চলে, রাতের দুঃখপ্ন যেন বুকের ওপরে ব'সে ফাস্ত হয় না দিনের বেলা মনেরও ওপরে চাপে। এক একদিন শাদা কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, পদাতিকের দল 'চলি-চলি-পা-পা' ক'রে শিশুর মতো হাঁটে, মোটর গাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে মূহুরতার প্রতিযোগিতা বাধে, তবু তো গুনি গাড়িতে গাড়িতে মাথা ফটাফটি হয়, পথের মানুষ গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে। হঠাৎ এক একদিন মেঘ-ধোঁয়া-কুয়াশার পর্দা তুলে আকাশের অন্তঃপুরে সূর্যের পদপাত হয়, আমাদের মুখের ওপরে খুশির হাসির লহর খেলে যায়। দু'তিন সপ্তাহে একদিন ক'রে আলোর জোয়ার আসে, দু'এক ঘন্টার তার ভাঁটা পড়ে, তবু সেই দু'টি একটি ঘন্টার জন্যে আমরা সমরখন্দ ও বোখারা দান করতে রাজি আছি। এক সহস্র ক্যাণ্ডল-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নদম হয়, সেদিন

'না চাহিতে গোরে যা করেছ দান

আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ'

সে মহাদানের মূল্য হৃদয়দম ক'রে লওনের বিভবসম্ভোগ তুলছে মনে হয়। দৈবাৎ এক আধবার চাঁদ দেখা দেয়। আমার বিরহী বন্ধুটি খবর দিয়ে যায়—চাঁদ উঠেছে। সাত সমুদ্রের পেরিয়ে আসা চাঁদ, কোন্ বিরহিণীর পাঠিয়ে দেওয়া চাঁদ। আমাদের কাছে চাঁদের মতো আশ্চর্য আর নেই, সে তো কেবল আলো দেয় না, সে দেয় সুখ। বিজলীর আলোর সঙ্গে তার তফাৎ এখানে। সত্যতা আমাদের কেরোসিনের আলোর পরে গ্যাসের ও গ্যাসের আলোর পরে বিজলীর আলো দিয়ে অঙ্গকার থেকে আলোকে নিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দয়া ক'রে যে সুঘটিকু দিয়েছে সত্যতা তার পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।

কথা হচ্ছিল নতুন দেশে এলে মানুষের সব কটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মানুষের দশা হয় সেই ভদ্রলোকের মতো যে ভদ্রলোক একপাল আত্মীয় পরিবৃত হয়ে কাশীতে বা পুরীতে ট্রেন থেকে নামেন। দশটা পাণ্ডা যখন দশটি আত্মীয়কে ছিনিয়ে নিয়ে দশদিকে রওনা হয় এবং আরো দশটা এসে কর্তার দশ অঙ্গে টান মারে, তখন তাঁর যে অবস্থা হয় আমার মনেরও এখন সেই অবস্থা। ঘর ছেড়ে একবার যদি বা'র হই তো লণ্ডন শহরের সব ক'টা রাস্তা একসঙ্গে আহ্বান করতে থাকবে, 'এদিকে, বন্ধু, এদিকে', সব ক'টা মাঠ উদ্যান, সব ক'টা মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারি থিয়েটার কন্সার্ট সমবেতস্বরে গান ক'রে উঠবে, 'এখানে বন্ধু, এখানে।' তাদের আহ্বান যদি নাই গুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধ'রে স্ক্যাপার মতো যেদিকে খুশি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গির সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দু'টিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চূপ ক'রে ঘরে ব'সে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ক'রে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দু'টি চক্ষু বিদ্ধ ক'রে ভুবনমোহিনী মায়ায় হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।

আমি ঘরে ব'সে লিখছি, আমার চোখজোড়া অশ্রুমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল সেটা আমাদের বাড়ির পাশের টেনিসকোর্ট, সেখানে যুবক যুবতীরা লাকিয়ে লাকিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতির পরস্পর থেকে শত হস্ত ব্যবধানে

থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিষ্য শিষ্য ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল যে স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাসের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করছে তা নয়, সেই সঙ্গে এত প্রচুর হাসছে যে ভারতবর্ষের লোক মোহমুগ্ধগরের আমল থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসি হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। আমাদের পাড়ার বাড়িগুলো এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধ। এটা একটা শহরতলী। সামনের বাড়ির ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির উপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের কল্যাণী নারীর হাত, ধূলা যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ গুচি হয়। আমার চোখ এগিয়ে চলল। এর পরের রাস্তাটা পাহাড় থেকে নেমেছে, তার নামবার মুখে খাস লগুন। নামতে নামতে দেখছি ছোট ছেলের দল পায়ে চাকা বেঁধে ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোঁ ক'রে নেমে চলেছে, চলতে চলতে বাধালো হয়তো কোনো বড়ো ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা, বার্ষিক্যের চোখ তারুণ্যের দিকে কোমল ভাবে চাইল। ছোট মেয়েরা দোকানের কাঁচের বাইরে থেকে ভিতরের কেক চকোলেটের দিকে লুক্ক নিরাশ দৃষ্টি ফেলছে, হয়তো দার্শনিকের মতো ভাবছে, কমল যদি এত সুন্দর তো কমলে কণ্টক কেন? চকোলেট যদি এত সুস্বাদু তো চকোলেটের চারপাশে কাঁচের বেড়া কেন? আমার চোখ পথে চলতে চলতে দেখছে মদের দোকানের ওপর বিজ্ঞাপনের নামাবলী, গির্জার দ্বারদেশে মুদ্রিত ধর্মানুশাসন, কসাইয়ের দোকানে দোদুল্যমান হাতচর্ম পশুর শব, কেমিস্টের দোকানে নানারোগের দাওয়াই, পোশাকের দোকানের কাঁচের একপাশে হঠাৎ-থামা নারীর কৌতূহলদৃষ্টি, অন্যপাশে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম। ফলের দোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। 'এমপ্রয়মেন্ট এজেন্সী'-র কর্মী ঝিনের জন্যে গিন্নী ও গিন্নীদের জন্যে ঝি ঠিক ক'রে দিচ্ছে। সরকারী ইন্সুলের এক প্রান্তে ছেলেরা ও অপর প্রান্তে মেয়েরা সমান বিক্রমে মাতামাতি করছে; তাদের ভাগ্য ভালো, ভারতবর্ষে জন্মায়নি; সে দেশে জন্মালে এতদিনে ছেলেরা গোপাল হ'য়ে উঠতো, মেয়েরা মেয়ের মা হতো।

আগারগাউও রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোঁটানায় পড়েছে— ট্রেনে চড়বে, না, বাসে উঠবে? বাসেই উঠল, দোতালার এককোণে আসন নিল। দুপাশে দোকান বাজার—দোকানে ক্রোতা ক্রেত্রীর ভিড়—কর্মচারিণীদের ব্যস্ততা—উভয়পক্ষে শিষ্টাচার। রেষ্টুরাঁ—দলে দলে নরনারী আহ্বারে রত—পরিবেশনকারিণীদের মরবার ফুরসৎ নেই—ছুরি কাঁটা প্লেটের ঝনঝকার—সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া। রেষ্টুরাঁর বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক চীরধারিণী পঞ্জীর হাত ধ'রে দেশলাই বেচছে বা বাজনা বাজাচ্ছে বা ফুটপাথে ছবি আঁকছে। রাস্তা মেরামত করছে কুলিরা, তাদের পরিধান কাদামাখা ও জীর্ণ, মুখে প্রতি দেশের কুলী-মজুরের মতো সরলভাবাপন্ন প্রাণখোলা হাসি। জমকালো পোশাক পরা অস্বাস্থ্যবাহী সৈনিক চলেছে, বড়ীরা হাই তুলতে তুলতে নির্নিমেবে দেখছে। গভযুদ্ধে তাদের এমনি-সব ছেলেরা তো মরেছে! তরুণীরা গৃহবাতায়ন থেকে উল্লাসধ্বনি করছে, যৌবন যে ঠেকো শেখে না, হারিয়েও হারায় না। থিয়েটারের ম্যাটিনীর সময় হলো—টিকিট কেনবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ 'কিউ' (queue) ক'রে দাঁড়িয়েছে—দু'জনের পেছনে দু'জন—পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি। সর্বত্র পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি—সভাসমিতিতে কুলে কলেজে থিয়েটারে কসার্টে দোকানে আপিসে সর্বত্র নারীর আক্রমণে পুরুষ পলাতক—কেরানী মানে নারী, কুল শিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী। রাস্তার মোড়ে বাস থামল—শ্যালপ্রাণ্ড বলিষ্ঠকায় পুলিশের তজ্ঞনী-সংকেতে শতশত বাম্পীয় যান থেমেছে—শতশত নরনারী রাস্তা পারাপায় করছে—মেয়েরা ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে

যাচ্ছে—ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে—শিশু কঁখে নিয়ে শিশুর বাবা তার মা'র পশ্চাদবর্তী হচ্ছেন—বুড়ীকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে বুড়ীর ছেলেমেয়েরা মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে—প্রেমিক যুগল হাতে হাত জড়িয়ে বাজার ক'রে ফিরছেন। বাস চলতে আরম্ভ করল—একটা পার্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে—পার্কের বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দরিদ্ররা রুটি কামড়ে যাচ্ছে—তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা দু'একখানা রুটিতেই সমাপ্ত হচ্ছে।

বাস কলেজের কাছে থামতেই আমার চোখজোড়া তৎক্ষণাৎ নেমে প'ড়ে দৌড় দিলে কলেজের অভিমুখে। কোনো অগ্রগামিনী হয়তো দূর্য্য ক'রে দরজাটা খুলে রাখলেন, প্রবেশ ক'রে ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদাগন্তের জন্যে। তারপর ক্লাসে গিয়ে আসন অধিকার করা—অধ্যাপকের আগমনের আগে মেয়েদের তুমুল ফিস ফাস—কে কী সাফ ক'রে এসেছে অন্যমনস্কতার ভান ক'রে দেখা ও দেখানো—লাফ দিয়ে পেছনের চেয়ার থেকে সামনের চেয়ারে যাওয়া—অধ্যাপকের প্রবেশ—অধ্যাপকোবাচ—সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন—পলাতকমতি উন্মনা বালক কর্তৃক উপন্যাসপাঠ বা কবিতাসংরচন—বার বার ঘড়ির দিকে চাতক দৃষ্টিক্ষেপ—অবশেষে ছাত্র ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ—ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।

নতুন দেশে এলে কেবল যে সব-ক'টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে তা নয়, সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হ'য়ে ওঠে তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট্ ক'রে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না। মানুষ খাদ্য পেয়ে সন্তোষে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল, দেশী রায়ার হাদ পেলে রসনা আর কিছু চায় না। কাঁচা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার, বাঁধাকপির ডালনা-চাখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু পরিচ্ছদ সন্তোষে মানুষের এতটা রক্ষণশীলতা নেই। দেশে যখন এক-আধ দিন কোট-ট্রাউজার্স পরা যেত তখন সে কী অস্বস্তি! আর সে কী সাহেব-মানসিকতা! ধূতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালীগুলোর উপরে তখন কী অকারণ করুণা! জাহাজে থাকবার সময় জাহাজী কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ধূতি পাঞ্জাবি পরার স্মৃতি মনে প'ড়ে গেলে হাসি পায়। এতদিনে ইউরোপীয় ধড়াচূড়া গায়ে ব'সে গেছে, চক্কিশ ঘণ্টা এই বেশে থাকতে একটুও বেখাপ্পা বোধ হয় না; এখন মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক, যেন এই পোশাক প'রে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি, ট্রাউজার্স জোড়টার হাঁ-দুটোতে পা-জোড়াটা গলিয়ে দিই, মগখানেক ভারি ওভারকোটটার বাহন হ'য়ে চলি। দৈবাৎ কোনোদিন ধূতি পাঞ্জাবি চাদর বার ক'রে পরি তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনে, আমাদের অস্ত থাকে না, জগৎকে দেখিয়ে আসতে ইচ্ছে করে আমাদেরও জাতীয় পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি একটা? মাদ্রাজী ভাষাদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ভাষাদের আপাদমস্তক অমিল, বাঙালী মুসলমান পেশোয়ারী পাঠানের যমজ জাতা নন। আমার সফেদ ধূতি আর সবুজ পাঞ্জাবিটার ওপরে নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়খানা জড়িয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াই তো রাস্তায় ভিড় জমে যাবে; পুলিশ যদি বা আমাকে মানুষ ব'লে না চিনতে পেরে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষদের হাতে সমর্পণ না করে তো ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে সার্বজনীন শৃঙ্খলায়ে চালান দেবে।

নতুন দেশে এলে নতুন আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে গোটা মানুষটারই একটা অঙ্গ-পরিবর্তন ঘ'টে যায়। যাঁরা বলেন তাঁদের পরিবর্তন হয়নি তাঁরা খুব সন্তুষ্ট জানেন না কোথায় কি ঘ'টে গেছে।

দেশে ফেব্রুয়ার সময় তাঁরা সর্বাংশে—এমন কি নত্বাদেও—ঠিক সেই মানুষটি খোঁজই ফিরতে পারেন, কিন্তু মনেরও অগোচরে মানুষের কোন্‌খানে কোন্‌ প্যাচটি আলগা হ'য়ে যায় তা মানুষ কোনোদিন না জানতে পারলেও সত্যের নিয়ম অমোঘ। নিজেকে জেরা করলে বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে আমার যেন সেই অবস্থা হবে যে অবস্থা হয় দীর্ঘিতে ফিরে গেলে স্রোতের মাছের। ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাস্থে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের একস্রোতে ভাসা। নারী সম্বন্ধে এ দেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে নুমুর্ষের মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপ সক্রিয় ক'রে তোলে। কেবল চোখে দেখবারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্য্যায়িত ক'রে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিক নিজের হাতে নিভিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনো বার লিখব। যা আমার কাছে তর্ক নয় রহস্য নয় সহজ অনুভূতি তাই আমাদের দেশের লোকের কাছে বাক্যের সাহায্যে বোঝাতে হবে—দুর্ভাগ্য! বেশ বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে দেশটা একটা পার্টিশন দেওয়া ঘরের মতো ঠেকবে—একপাশে পুরুষ একপাশে নারী মাঝখানে সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার।

আর একটা সহজ অনুভূতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মতো মেশা; কোনো ব্রাহ্মণের কাছে নতশির থাকতে হয় না, কোনো দারোগার কাছে বৃকের স্পন্দন গুণে চলতে হয় না, কোনো মনিবের কাছে মাটিতে মিশিয়ে যেতে হয় না, মনুষ্যমর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব, ভারতবর্ষ যে প্রভু-মানসিকতার দাস-মানসিকতার দেশ, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একজনের দাস অন্যজনের প্রভু।

## ॥ চার. ॥

বড়দিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজাঁয় গিয়ে দেখি, সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল। নিবিড়-নীল অকুল আকাশে সেটি একটি পর্বত-দিগ্বলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ; তার মাটি বরফের, হাওয়া বরফের, মেঘ বরফের; তার জলস্থল-অন্তরীক্ষের ভিৎ দেয়াল ছাদ মর্মরনিভ বরফের। যেন আকাশশিল্পের ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এত নীল আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিব্যাত্রা অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটে না, মনে হয় এ এক মহার্ঘ বিলাসিতা, শুধু এরি জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইন্স আলসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়। সে তো লণ্ডনের মাথার ওপরে কালো শ্যামিয়ানার মতো খাটানো দশহাত উঁচু দশহাত চওড়া দশহাত লম্বা আকাশ নয় যে চোখ বাড়ালেই নাগাল পাব, মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে নরব, দশদিকের পেষণে ধ্বংসস্থান হবে। লেজাঁয় যেদিন নামলুম সেদিন অসহ আনন্দে নিজেকে শতধা করতে পারলে বাঁচতুম। মুক্ত আকাশের মধ্যে

মানবায়ার যে মুক্তি সে মুক্তি আর কিছুই মধ্যে নেই। সেই আকাশকে যারা করলার ধোঁয়া দিয়ে কালো ক'রে দশতারা বাড়ির ঘের দিয়ে খাটো ক'রে তুলেছে তারা কুবের হলেও কুপার পাত্র, তারা স্বখাদ-সুভদ্রতলের যথ।

সেই উজ্জল নীল প্রশান্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য উঠি-উঠি করে, মেঘের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আর-পাহাড়ের এপারের বরফ হীরের মতো ঝকঝক করে, রঙের সপ্তকের ওপর আলোর আঙুল ঝলমল ঝিলমিল ক'রে পিআনোর ঝংকার তুলে যায়, তখন এক মুহূর্তের জন্যে অনুভব করতে পারি আদিম্প্রাণ ধ্যানীর চেতনায় কেমন জ্যোতি ঝলসে উঠেছিল, কোন্ আবিষ্কারের অসম্বা বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ ক'রে আপনি ফুটেছিল, কিসের আনন্দে তাঁকে বলিয়েছিল শৃঙ্খল বিধে অমৃত্যু পুত্রা আ যে ধাগানি দিব্যানি তত্বঃ...

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরম্ভাং।

সারাদিন সূর্য কিরণ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলে আর মাটির বরফ মাঠের বরফ গাছের বরফ ছাদের বরফ ঝরণার বরফ পাহাড়ের বরফ কখনো সোনা হয়ে ওঠে রূপালী রঙের মুকুরে সোনালী মুখের ছায়ার মতো, কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেত-পদ্মিনীর কপোলে অশোক-রঙা লজ্জার মতো, কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত-শঙ্কিনীর নয়নতারার নীল চাঁউনির মতো। সূর্য বিলায় নিলে চন্দ্রের পালা। চাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে ভূবারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা.. তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায় চূড়ায় জ্যোৎস্নার চূষন, তার রজত অভরণের গাত্রে তারার ঝিকমিকি। দস্তুর পর্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা 'শালে'ওলি গবাকের যোমটা তুলে বিজলী-আলোর উকি মেরে দেখছে, টোপর-পর পাইনগাছের দল হৃগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।

শুধু শোভা নয়, সংগীত। এক নিশান্ত থেকে আরেক নিশান্ত অবধি মিঠিসুরের নহবৎ বাজে গ্রাম-বুন্ধুটের অনবসর কণ্ঠে, তার সঙ্গে সুর মিলায় স্নেহবাহী অপের গলার ঘণ্টা, তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী অভিসারিণী ঝরণার 'চল্ চল্ চল্'। দিনের কাজের সঙ্গে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে চেতনার আড়ালে ধ্বনি মিশিয়ে রয়, যারা কাজ করে স্বপ্ন দেখে তারা হয়তো গুনতে পায় না জানতে পারে না কিসে তাদের অনুত দেয়।

কাজ? সেখানকার কাজের নাম খেলা। ডাকঘরের ছোকরা চিঠি বিলি করতে যাচ্ছে, তার গাড়িখানার না আছে চাকা না আছে ঘোড়া, দুই হাতে একবার ঠেলা দিয়ে দুইপায়ে দিলে গাড়ির মধ্যে লাফ, গাড়ি চলল বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছলে, এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় বঁকে, এক দরজার থেকে আরেক দরজায় থেমে। এক বাড়ির লোক আরেক বাড়ি যাচ্ছে, যার পিঠে চ'ড়ে বসেছে সেটার নাম লুডা, উঁচু একখানা পিড়ির মতো তার আসনটা, বাঁকা দুখানা শিঙের মতো তার পায়া দুটো, চ'ড়ে ব'সে পা তুলে নিয়ে হাত ছেড়ে দিলে বরফের রাস্তার ওপর ঘষতে ঘষতে চলে। যারা খেলা-ই করতে চায় তারা দুই পায়ে দুটো নৌকাকৃতি কাঠ বেঁধে হাতে লগি তুলে নিচ্ছে, আর দুই নৌকায় পা রেখে জমতি জলের ওপর দিয়ে রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এরি নাম শী-খেলা (Skiing)। শুধু খেলা করতে কত দেশ থেকে কত পুরুষ কত নারী প্রতি শীতকালে সুইট্জারলণ্ডে আসে, বরফের ওপর দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, শী করে, স্কেট করে, লুজে চড়ে, স্নেজে চড়ে। কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা! ভূতের মতন খাটতে পারে শিশুর মতন খেলতে পারে, যুবক যুবতীর তো কথাই নেই, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উৎসাহ দেখলে মনে হয় বানপ্রস্থে গেলে এরা বনকে জ্বালাত। খাটো আর খেলো আর খাও—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। ইউরোপে এতদিন আছি,

কাদতে কাউকে দেখিনি, কামাটা এদের ধাতবিকদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্তঃ হাসির ভান আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষ তো দেখিনি। আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে খুব একটা গভীরতার দাগও কারো মুখে দেখিনি; তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃসলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শী তৃপ্তি কারো চোখে মুখে চলমে বলনে দেহের গড়নে লক্ষ্য করিনে। সাত্ত্বিকতার চর্চা ইউরোপে নেই, কোনোকালে ছিল না। ইউরোপের খ্রীষ্টধর্ম যীশুর ধর্ম নয়, সেন্টপলের ধর্ম—রামের ধর্ম নয়, হনুমানের ধর্ম। তার মধ্যে বীর্য আছে, লাষণ্য নেই।

কিন্তু লাষণ্য নাই থাক, ক্রীবস্ত্র নেই। প্রচণ্ড শীতলে যে দেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায় দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য? দেহরক্ষার জন্য সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যস্বার্থী। সেই জন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে, হয় উপনিষৎ লিখতে নয় মোহমুদগার লিখতে, ইউরোপের লোক কোনো দিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়ত উত্তপ্ত রাখতে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহ মনের আবহাওয়ায় কই? এদের ভিতরে বাইরে কেবলি দ্বন্দ্ব কেবলি ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ-সমরে, তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়। ইউরোপের মাটি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, বিনা যুদ্ধে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরণার জল এত হিমলে যে স্টোভে গরম না করলে ব্যবহারে লাগে না। বাস্মীকি যদি এ দেশে জন্মাতেন তবে ধ্যান করতে ব'সে বস্মীকে নয় বরফে ঢেকে যেতেন; বুদ্ধদেব যদি এ দেশে জন্মাতেন তবে তপস্যায় ব'সে কোনো সূজাতার কল্যাণে ক্ষুধাশান্তি করতে পেতেন হয়তো, কিন্তু বেশিক্ষণ খালি গায়ে থাকলে তাঁকে যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ের সূজাতাদের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে হতো।

ইউরোপের সেই নিষ্ঠুরা প্রকৃতিকে মানুষ দেবী ব'লে পূজা করেনি, কালী ব'লে তার পায়ের তলায় নিজের শব বিছিয়ে দেয়নি, তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে নিজের বাঁশির সুরে খেলিয়েছে, তাই একদিন যে ছিল নিষ্ঠুর আজ সেই হয়েছে কৌতুকের। তাই বরফ পড়লে কোথায় ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে আঙন ছালাবে, না, মানুষ বেরিয়ে পড়ল বরফের বুকের উপর পা রেখে কালীয়া দমন করতে—স্কেট করতে শী করতে লুজে চড়তে প্লেজে চড়তে।

সুইটজারলণ্ডের এই পার্বত্য পল্লীটি জেনেভা হ্রদের অনতিদূর ও অনতিউচ্ছে। প্যারিস থেকে লোজান ছাড়িয়ে মিলানের পথে ট্রিয়েস্টের অভিমুখে যে রেলপথটি একে বেঁকে চলে গেছে এগ্রেস কাছে তাকে নিচে রেখে অন্য একটি রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড়ে উঠতে হয়। এই রেলপথটি শীর্ণবয়স, এবং এর ট্রেনগুলি ছোট। পাহাড়ের ওপর ওঠবার সময় পেছনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে শিঙর মতো হুমাওড়ি দেয়, পোকর মতো মধুর বেগে চলে। পথের দু'পাশে দু'সারি পাহাড় কিংবা একপাশে পাহাড় ও একপাশে খাদ। দু'পাশে পাইনের বন, বনের ফাঁক দিয়ে বারণা ঝরে গড়ছে। পাইনের কাঁচা চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছে বরফ-ওঁড়ো, ঝরণার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে বরফের বাধ।

গ্রামটি নিকট হয়ে এলে একটি দু'টি ক'রে 'শালে' দেখা দেয়। 'শালে' (Chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি, যেমন আমাদের দেশে 'বাংলো'। বাড়ির আগাগোড়া কাঠের, কেবল ছাদটা হয়তো প্লেটের এবং ভিতরটা হয়তো পাথরের। প্রত্যেকটির গডন স্বতন্ত্র, হিতি ছাড়া-ছাড়া, আকার বিভিন্ন এবং রঙের সমাবেশ বিচিত্র। দো-ঢালা ছাদ, ফুলানো বারান্দা, ছোট গবাক্ষ, জ্যামিতিক নক্সা, রঙিন আলপনা, উৎকীর্ণ উত্তি, দু'তিনশো বছর বয়স—সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি এমন একটি বিশিষ্ট

দৃশ্য যে একবার চাইলে চোখ আটকে যায়, ফিরিয়ে নেবার সাধ্য থাকে না। দেশটির প্রকৃতি এত সুন্দর, তাতেও মানুষের তৃপ্তি হলো না, সে ভাবলে এমন সুন্দর আকাশ এমন সুন্দর পাহাড় এমন সুন্দর বরফ পাইন ঝরণা, দশদিকে এমন অকুপণ সৌন্দর্য, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়? এই ভেবে সে বাহিরের সৌন্দর্যের অঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য মাথিয়ে দিলে, সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব ছুড়ে দিলে, বিধাতার সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি, এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। তিন dimension-এর ছবির মতো বহুকেণ 'শালে', ধাপে ধাপে লাফ-দিয়ে-নামা পাথর-বাঁধানো ঝরণা, বাক্যে বাক্যে ঘুরে-ঘুরে-নামা পাহাড়-কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেগুনী, দুশো তিনশো বছরের বাড়িতেও অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিদ্যুৎ আলো জলের কল সেট্রাল হীটিং। ইউরোপের লোক যুগোচিত পরিবর্তন বোঝে। সেইজন্যে চার হাজার ফুট উঁচু পর্বতশ্রেণীর পিঠে নিরলা একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করে কোনো কিছুই অভাব বোধ করে না। লেজার পাঁচ দশ মাইল দূরের দুটি গ্রামে বেড়িয়ে এসেছি, সে সব গ্রামেও কমবেশি এমনি .. স্বাচ্ছন্দ্য, অস্থায়ী পর্বটকদের জন্যে অন্ততঃ কয়েকটি কাফে তো আছেই।

লেজার গ্রামটিতে দু'তিন হাজার লোকের বাস, তাদের বোধ হয় অর্ধেক নানাদিগ্দেশাগত যম্মারোগী। ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ওলন্দাজ হান্সেরিয়ান রুমেনিয়ান পর্তুগীজ ইতালিয়ান জাপানী ভারতীয়—কত নাম ক'রব। তাঁদের মধ্যে আমাদের এক বাঙালী ভ্রমলোকও আছেন, তাঁর ভাই 'রমলা'-কার মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর তত্ত্ব নেন।

যম্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ এখানে সূর্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপপ্রাচুর্য নেই। শীত ও রৌদ্রের এতেন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। পার্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, শুষ্ক গ্রাম, পাখির গান, পাইনের মর্মমর্ম, ঝরণার কল্কল, বাসি শেকলীর মতো অতি আলগোছে মৃদু ভূয়ারপাত। একত্র এত গুণ কোন শহরের ক'টা গ্রামের আছে? রোগীর জন্যে কেবল প্রাকৃতিক নয় কৃত্রিম আনন্দেরও বহল ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে ছোট বড় বহু-সংখ্যক ক্লিনিক, তাদের আত্মীয়দের জন্যে বহুসংখ্যক হোটেল, উভয়ের জন্যে দোকান বাজার ডাকঘর ব্যাঙ্ক সিনেমা গির্জা কাফে। বড় ক্লিনিক ও বড় হোটেলগুলিতে নাচগানের বন্দোবস্ত। যারা দু'তিন বছর একাদিক্রমে শয্যাশায়ী, যাদের পাশ ফিরে শুতেও দেওয়া হয় না, তাদের নিজের নিজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে কাগজপড়া হচ্ছে খাবার পৌছচ্ছে নার্স পরিচর্যা করছে বন্ধুরা গল্প করছে। নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাইে একজেট করে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সকলে মিলে গল্প করছে কন্সার্ট শুনছে সিনেমা দেখছে এবং তাদের বন্ধুবান্ধবীদের নাচ উপভোগ করছে।

একটি বড় ক্লিনিকের কথা বলি। খ্রীস্টমাস ইভে খ্রীস্টমাস ট্রি স্থাপনা হলো, ট্রির ওপরে শতসংখ্যক মোমবাতি জ্বলে উঠল, রোগীদের শয্যাসমেত ব'য়ে এনে সারি করে সাজিয়ে রাখা গেল, তাদের বন্ধুবান্ধবীরা সারি বেঁধে বসলেন, কন্সার্ট চলল, ধর্মোপাসনা হলো, এক প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকারের খ্রী ম্যাদাম দুআমেল আবৃত্তি শোনালেন। নিকোলা বুড়ো সেজে একঘন এসে যতগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে জুটেছিল তাদের সকলকে এক একটা উপহার দিলে, সকলের সঙ্গে রক্ততামাসা করলে। বাতি নিবল, কন্সার্ট থামল, উৎসব শেষ হলো, রোগীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরলে—অবশ্য ইতিমধ্যে সকলে মিলে কিছু পানাহার করলে।

একটি ছোটদের ক্লিনিকের কথা বলি। খ্রীস্টমাস ইভ, খ্রীস্টমাস ট্রির শাখায় শাখায় পুতুল ঝুলছে, ইলেকট্রিক আলোর নকল মোমবাতি জ্বলছে, ইংরেজ জার্মান ফরাসী ইতালিয়ান ইত্যাদি



নানাভাষীর নানাভাষী রূপ ছেলেমেয়েগুলি এক একটি শয্যা দু'জন করে শুয়েছে, তাদের আত্মীয়রা তাদের বিছানার কাছে বসে তাদের আনন্দে যোগ দিচ্ছেন, নার্সেরা পিআলো বাজাচ্ছে। প্রেমিক প্রেমিকা সেজে দুটি সুস্থ ছেলেমেয়ে গীতাভিনয় করলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুটি রূপ ছেলেমেয়েতে ভুয়েট হলো, দু'জন নার্স ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সেজে রঙ্গ করলে। ছেলেরা নিকোলা বুড়োর জন্যে অধীর হয়ে উঠল। একটি নার্স এল নিকোলা বুড়ো সেজে, 'নিকোলা এসেছে' 'ঐ রে নিকোলা' 'নিকোলা...নিকোলা' করে সোরগোল পড়ে গেল, প্রত্যেকের জন্যে নিকোলা কত উপহার বয়ে এনেছিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রত্যেকে উপহারের ভারে চাপা পড়তে লাগল, কত রকমের খেলনা, কত রকমের ছবির বই; একজনের একটা ফুদে গ্রামোফোন এসেছিল, সেটা বার করে সে একটা ফুদে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে, সকলের তাক লেগে গেল। এতজনের এত উপহার এসেছিল যে স্বয়ং ক্লিনিকের কর্মী এসে নিকোলার সাহায্য করতে লাগলেন, নার্সেরা ছুটোছুটি করে যার উপহার তার বিছানায় পৌঁছে দিতে লাগল। কারো উপহারের পর উপহারই পৌঁছেছে, কারো দেরি হচ্ছে, সে বেচারি পরের উপহার নাড়াচাড়া করে সাত্বনা পাচ্ছে।

বৎসরের শেষ রাতের উৎসব (Sylvester) সেই বড় ক্লিনিকে। রোগীরা সেই হলে সমবেত। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যান্সী পোশাক পরে এসেছে। যে রোগী দু'তিন বছর এক শয্যায় সর্বদা শুয়ে রয়েছেন তাঁরও কত শখ, তিনি রেড ইণ্ডিয়ানের মতো মাথায় পালাখ পরেছেন, কিংবা নকল দাড়ি গোফ পরচুলা লাগিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবীরাও সেজে এসেছেন—কেউ সেজেছেন দাঁড়কাক, কেউ সেজেছেন মুসলমানী, কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী অভিজাত, কেউ রঙিন কাপড় পরা স্পেনদেশের পল্লীবাসিনী। বন্ধুবান্ধবীদের নাচ হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, নারীতে পুরুষে বাহ ধরাধরি করে তালে তালে পা ফেলছে, বাজনার সুরটা এমনি যে যারা নাচছে না তাদেরও পা নেচে নেচে উঠছে। দু'আমেল বললেন, নাচের বাজনার থেকে ইউরোপীয়ান সংগীতের বিচার করবেন না। দু'আমেল আত্মহ প্রকৃতির স্বল্পভাষী সুপুরুষ, তাঁর 'Civilization' গ্রন্থখানা ফ্রান্সের 'সুপ্রসিদ্ধ' Goncourt prize পেয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে নাচ চলল, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। তারপর রোগীদের খাটের কাছে কাছে বসে তাদের বন্ধুবান্ধবীদের পানাহার ও রোগীদের শুয়ে শুয়ে যোগদান। রাত বারোটায় বছর বদলাল, দলে দলে গান গেয়ে উঠল, গ্রাসে গ্রাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা করলে। পানাহার শেষে আবার নাচ। ইতিমধ্যে ফ্যান্সী পোশাকের উৎকর্ষ বিচার করে যে কয়জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দাঁড়কাক তাঁদের মধ্যে প্রথম।

এমনি করে ইউরোপীয়রা রোগশোককে তুচ্ছ করে, খেলার দাপটে জরাকে ভাগিয়ে দেয়। একাদিক্রমে তিন বছর এক শয্যায় শায়িত থাকা কী ভয়ানক দুর্ভোগ তা সুস্থ মানুষে কল্পনা করতে পারবেন না। এ সন্তোষ রোগীদের মুখে হাসি, তাদের আত্মীয়দের মুখে ভরসা, তাদের সেরিকাদের মুখে আশ্বাসনা। মৃত্যুর কাছে ব্যাধির কাছে জরার কাছে কিছুতেই হার মানব না, তালি দিয়ে গান গেয়ে হালকা তালে নেচে যাব—এই হলো ইউরোপের পণ। অনাদ্যত জীবনপ্রবাহে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কতটুকুই বা স্থান, সেই স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা কত সহস্র বৎসর ধরে বৈরাগ্য চর্চা করে আসছি, আমাদের সন্ধান সংসার হতে মুক্তি, জীবনশিখার নির্বাণ, আমাদের সাধনা দুঃখকে এড়িয়ে চলবার সাধনা, নিজেকে নিশ্চিত করবার সাধনা। বুদ্ধ-শঙ্কর-রামকৃষ্ণ কেউ তো বলেননি, 'মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

দ্বীপুরুষের মিলিত নাচ ব্যাপারটাকে আমরা কুনীতিকর ভেবে থাকি, ইউরোপীয়রা ভাবে

না। ইউরোপে প্রতিদিন নতুন নাচের আমদানি ও উদ্ভাবন চলেছে, নাচ না হলে ওদের উৎসবই হয় না। স্বাস্থ্যবান সমাজ মাত্রেই মিলিত নৃত্যের চর্চনা আছে; আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কতদূর দেখেছি, তা দেখে কুনীতির কথা মনেই ওঠেনি। অনাদি কাল থেকে যে সব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রীপুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ও আশৈশব যারা একত্র নাচতে অভ্যস্ত হয়েছে, পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করলে তাদের চিন্তাবিক্ষেপ না হবারই কথা। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, নিজের নিকট আত্মীয় আত্মীয়া ছাড়া এত বড় সমাজের যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরস্পরের কাছে অলক্ষ্য অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক থেকে অস্বাভাবিক কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক থেকে জন্মান্তরিত উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের একদশদর্শিতা স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বৃত্তি আমাদের সমাজকে তো ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যকেও খণ্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার ক'রে তুলছে। বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে বিচিত্র গীত শুনতে শুনতে বিচিত্র স্পর্শ পেতে পেতে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়, এ সবের সুযোগ আমাদের সমাজে বিরল বলে আমাদের চিত্রকলা সংগীতকলা ভাস্কর্যকলা মাথা তুলতে পারলে না, আমাদের পোটারো কেবল দু'দশটি টাইপের নারী-মূর্তি আঁকেন, আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদ্যাবাদী আর ভাস্কর্য আমাদের নেই। চিত্রকরের যেমন জীবন্ত মডেল দরকার ভাস্করেরও তেমনি জীবন্ত মডেল দরকার যার গড়ন সে অনুভব করতে পারবে। আমাদের ছবিই বলো কাব্যই বলো গল্পই বলো এমন ফিকে এমন অবাস্তব এমন এক-ছাঁচে ঢালা হবার কারণ কি এই নয় যে, আমাদের সমাজে একটা সেম্‌সবন্ধে আরেকটা সেম্‌সবন্ধে একান্ত স্বল্পচেতন?

বল্কমের নাচ উদ্ভবের কেন কোনোদরেরই আঁট নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ, সমাজের দশ জন পুরুষের সঙ্গে দশ জন নারীকে পরিচিত ক'রে দেবার একটা উপায়। যে সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজেকে অর্জন করতে হয় সে সমাজে এই প্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যিক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের ওপরে সর্বনারীর নারীত্বের দাবী যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের ওপর সর্বপুরুষের পৌরুষের দাবী তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়। সর্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি পুরুষের দাবী এবং সর্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি নারীর দাবী বলবানকে করে প্রেমবান ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী। পুরুষের সাধনা সকলকে এড়িয়ে কেবল একটি নারীর জন্য নয়, সকলকে ছাপিয়ে বিশেষ একটি নারীর জন্য। নারীর সাধনা সকলকে বাদ দিয়ে কেবল একটি পুরুষের জন্য নয়, সকলকে স্বীকার ক'রে বিশেষ একটি পুরুষের জন্য। ইউরোপের পুরুষ একটি নৈর্ব্যক্তিক স্বামী হয়ে সুখ পায় না, সে স্বয়ম্বর সভার জেতা। ইউরোপের নারীও একটি নৈর্ব্যক্তিক স্ত্রী হয়ে সুখ পায় না, সে বহর মধ্যে বিশিষ্ট।

এ সমস্ত বাদ দিয়ে বল্কমের নাচ একটা কসরৎ এবং অবসর বিনোদনের একটা উপায়। ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষের পা অত্যন্ত স্থূল পুষ্ট মাংসপেশীবহুল। নৃত্যকালে পরস্পরের হাত উঁচু ক'রে ধরার ফলে বাহ্যরও রীতিমতো চালনা হয়। পুরুষের পক্ষে কসরৎটা কিছু বেশি, কারণ সঙ্গিনীটি যদি ওরুভার হয়ে থাকেন তো সঙ্গিনীকে মোড় ফেরাবার সময় বাহ্যবলের অগ্নিপরিমাণ হয়ে যায়।

বল্কম নাচের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নৈতিক আপত্তি শুনতে পাই। যে দেশে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখলে পাপ হয় ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাইয়ের দেখা নিষেধ, যে দেশের পাণ্ডব প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বয়স্ক বোনকে ঘোমটা দিতে হয়, সে দেশের লোক

অন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে তখন দৈহিক সংঘর্ষে যে নরক দেখবে এর সন্দেহ নেই। যদি বলি ব্যাপারটা এত নির্দোষ যে ভাইবোন বাপ-মেয়ে ও মা-ছেলে পর্যন্ত হাত ধরাধরি করে সকলের সামনে নাচে তবে হয়তো 'উন্টো বুঝলি রাম' হবে, এ দেশের পিতৃভ্রাতৃ সৌভ্রাতের ওপরেও সন্দেহ পড়বে। মানবচরিত্রের প্রতি যাদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস আছে আমাদের দেশের সেই সকল ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিই মিলিত নাচ সরল প্রকৃতি আদিমদের মধ্যেও আছে এবং ইউরোপীয়রা যখন আদিম ছিল সেই সময় থেকে তাদের মধ্যে চলিত হয়ে আসছে। এটা তাদের সংস্কারগত এবং কচি বয়স থেকে বালক বালিকা মাঝেই এর অনুশীলন করতে শেখে। মানুষকে ঝাড়া গ্রীন হাউসে পুরে সতী বা যতি বানাতে চান সে সব নীতিনিপুণদের বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে, এ দেশেও সতী ও যতির অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু সনাজের ফরমায়েসে নয়, অন্তরের নিয়মে।

ফ্রিনিকের কথায় নাচের কথা উঠল, পাসিয়ার কথায় খাওয়ার কথা বলি। আমাদের পাসিয়ারে (একটু ঘুরোয়া ধরনের হোটেলকে ফরাসীতে পাসিয়ার বলে) আমরা অনেক দেশের লোক থাকতুম, যখন খাবার ঘণ্টা পড়ত তখন খাবার টেবিলে যারা সমবেত হতুম তাদের মধ্যে মণিাদা ও আমি বাঙালী, অন্যদের কেউ আমেরিকান কেউ ইংরেজ কেউ জার্মান কেউ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান ফিন্‌ ইতালিয়ান ওলন্দাজ। এতগুলি জাতের লোক একসঙ্গে একঘণ্টা বসলেই নানাদেশের কথা ওঠে। রাজনীতি অর্থনীতি আর্ট সমাজ ধর্ম সকল বিষয়ে আলোচনা চলে। আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতির স্বভাব ধরা পড়ে যায়, আন্তর্জাতিক জানাওনা হয়, ফরাসীরা দেখে জার্মান মাঝেই শয়তান নয়, আমেরিকানরা বোঝে ক্যাথেরিন মেয়োর বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি হিন্দুর মেলে না। সভাসমিতিতে সব দেশের লোক ততটা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারে না যতটা মেশে খাবার টেবিলে। এই সত্যটা জানা থাকলে আমরা হিন্দুমুসলমানে জনসভা না করে জন-ভোজ করতুম এবং ব্রাহ্মণের ডানদিকে মুসলমানকে ও বাঁদিকে নমঃশূদ্ধকে আসন দিয়ে দুটো মহাসমস্যার মীমাংসা দুটো দিনেই করতুম।

পরিবারের বড় ছোটতে মিলে এক টেবিলে খাবার সময় ছোটরা বড়দের কথা কান পেতে শোনে ও বড়দের রীতি চোখ বুলিয়ে দেখে। আমরা যা বই পড়ে বা মাস্টারের উপদেশে শিখি এয়া তা খেতে খেতেই শেখে। আমেরিকার মহিলাটির সঙ্গে জার্মানীর মার্ক-মুদ্রার বিনিময়-হার সদর্পে কথা হচ্ছে, তাঁর বালিকা মেয়ে দুটি তা সাগ্রহে শুনছে ও সে বিষয়ের প্রশ্ন করছে, অথচ এক্সচেঞ্জের মতো দুঃসহ বিষয় যে কী, তা আমরা নার কাছে শেখা দূরে থাক বি-এ ক্লাসের অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে ওনেও সহজে বুঝে উঠতে পারিনে, কারণ আমাদের ঘরে ওবিষয়ের চর্চা নেই, আমাদের সমাজ বলতে কেরানী-উকিল-ডাক্তার-ইন্সলুমাস্টারের সমাজ। আমেরিকান মহিলাটি যে বেশ একজন বিদূষী তা নয়, সম্ভবতঃ তিনিও ওসব শুনতে শুনতে শিখেছেন, নিজের ঘরের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলে মিলে দৈনিক পত্র পড়তে পড়তে কিংবা পরের ঘরের চায়ের টেবিলে জাহাজের ব্যাপারীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে—কেবল কি টাকাকড়ির কথা?—ভালোমন্দ দরকারি অদরকারি হরেক রকমের অনেক তথ্য অনেক গুজব এবং অনেক মিথ্যাই মগজে জমিয়েছেন। জার্মান মহিলাটির স্বামী ডাক্তার, আয়ীয়েরা কেউ চিত্রকর কেউ যোদ্ধা কেউ ব্যবসাদার। তাঁদের সঙ্গে কথা বললে তাঁর নিজের শিক্ষাও ঘরে যতটা হয়েছে স্কুলে ততটা হয়নি এবং ছবি ও গান সম্বন্ধে তিনি যেসকল রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন আমাদের দেশের কোনো ডাক্তারের স্ত্রী সেসকল পারতেন না। তবে স্কুলেও যে এঁরা কেবল পড়েন না সেকথাও জানিয়ে রাখতে চাই। এঁদের প্রতি স্কুলে সংগীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রতি স্কুলে কলেজে প্রতি সপ্তাহে বলরুম-নাচের আয়োজন আছে, স্কুল

থেকে এঁরা প্রত্যেকেই দুটো একটা বিদেশী ভাষা শিখে রাখেন এবং প্রত্যেকেই কয়েকটা গৃহশিল্পের ট্রেনিং পান। ফরাসী ইংরাজী ও জার্মান এই তিনটে ভাষা ব্যবসা বা সামাজিকতার খাতিরে ইউরোপের মধ্যবিস্তৃত্রণীর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই অল্পবিস্তর জানেন এবং জানবার প্রধান সুযোগ পেয়েছেন নানাদেশে বেড়াবার সময় নানাদেশের লোকের সঙ্গে কাফেতে রেস্টুরায় হোটেলের এক টেবিলে বসে আড্ডা দিতে দিতে। এহেন আড্ডার পক্ষে সুইটজারলণ্ড যেমন অনুকূল তেমন আর কোনো দেশ নয়।

ঐ তো ছোট্ট একটুখানি দেশ, ওর লোকসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ, আয়তন আমাদের ছোটনাগপুরের মতো হবে, তবু টুরিস্টদের দৌলতে এবং ঘড়ি ও চকোলেট বিক্রি করে ওদেশ বড়-মানুষ। এটুকু দেশে তিন তিনটে ভাষা আর দু'দুটো ধর্ম চলিত, অথচ ওর একা ইতিহাসবিশ্রুত।

সুইটজারলণ্ডের প্রত্যেক শহরে টুরিস্টদের জন্যে হোটেল প্যাসিঅর কাফে আর ব্যাঙ্ক ডাকঘর ঔষধালয় তো আছেই, প্রত্যেক স্থানে তাদের খেলার বন্দোবস্ত ও বাজারের আয়োজন আছে। সন্ধ্যা দেশটাই যেন টুরিস্টদের জন্যে তৈরি একটা বিরাট পাঠশালা।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যান্য দেশের টুরিস্টদের ডাকছে এবং দেশ দেখিয়ে তাদের পকেট হালকা করছে। ভারতবর্ষ যদি সুইটজারলণ্ডের মতো উদ্যোগী হতো ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ঘুচত। কিন্তু ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না, ইউরোপের টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে? তারা যদি ইউরোপীয় হোটেলের খাতিরে ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খায় ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খেলে ও ইউরোপীয়দের সঙ্গেই আড্ডা দেয় তবে তাদের অর্থে ভারতবাসী ধনী হবে না এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে তারা দেশে ফিরবে সে ধারণা আমাদের অনুকূল হবে না। এবং দু' দশটা মুসলমান বাবুর্চি হিন্দু দোকানদার ও ফিরিপ্তী আয়া দেখে যদি তারা ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে বই লেখে তবে সে বইয়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদ করলেই আমাদের কাজ কুরোবে না। আমাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় তারা পাবে কী ক'রে? সে যে অভিন্নমূর ব্যাহের উন্টো, তার মধ্যে তাদের প্রবেশ-পথ কোথায়? ইউরোপের এক দেশের সমাজের সঙ্গে অন্য দেশের সমাজের মিল আছে, ভাষা জানা থাকলে এক সমাজের লোক আর এক সমাজে মিশে যেতে পারে; জাতীয় সংস্কার স্বতন্ত্র হলে কি হয়, সামাজিক আচার সর্বত্র প্রায় এক। এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেক সময় মনকে পীড়া দেয়। আমেরিকান মহিলাটি বললেন, তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসে নতুন কিছু দেখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এই যান্ত্রিকতার যুগে সমস্তই এমন এক ছাঁচে ঢালা যে ইউরোপের সব দেশের পুরুষের একই পোশাক, সব দেশের নারীর একই পরিচ্ছদ, স্থলে স্থলে এমন কি একই প্যাটার্নের একই রঙের একই ভদ্রির। কোনো লীগ অব নেশনস ফতোয়া দিয়ে এত দেশের এতগুলো মানুষকে একই রকম সাজ করতে বলেনি, কোনো মিশনারী এবিষয়ে প্রচার কার্য করেননি, তবু কেমন ক'রে যে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ইউরোপের রুমেনিয়া অবধি প্রায় প্রতি নারীই কবরী হেঁটে স্কার্ট হেঁটে জামার হাত কেটে পূর্ব নারীদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাজলে সেই এক আশ্চর্য! অথচ সর্বত্র পুরুষ তার পূর্বপুরুষের মতোই জবড়জব সাজে বিদ্যমান, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রুমেনিয়া অবধি তেমনি কোট-ট্রাউজার্স টুপি-ওভারকোট। অবশ্য ইতর বিশেষ আছে, তবু গোটাগুটি বলতে গেলে সর্বত্র হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জামূলক ধর্ম, নাচঘরমূলক সমাজ এবং খাটা-খেলা-খাওয়া নামক ত্রিনীতি। এহেন সমাজে খাপ খেয়ে যেতে বেশি কষ্ট হয় না, এমন কি আমরা বাইরের লোকও অল্পায়াসেই এ সমাজের মধ্যে স্থান পেতে পারি।

লৌহার পর্বতমালার নিচে জেনেভা হ্রদকে বেষ্টন ক'রে অগণ্য পল্লী, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটাই টুরিস্টদের জন্যে হোটেলের দোকানে ছাওয়া। এমনি এক পল্লীতে রম্যা রলাঁ থাকেন, মণিদা ও আমি একদিন তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে এলাম।

## ॥ পাঁচ ॥

রলাঁর কুটীরটির একদিকে হ্রদ অপর দিকে পর্বত। হ্রদের শাড়িটির পাড় ধ'রে যেমন পর্বতের পর পর্বত চ'লে গেছে, হ্রদের ভাল থেকে সোপানের মতো তেমন পর্বতের ওপর পর্বত উঠে গেছে। হ্রদের কূলে কূলে পর্বতের মূলে মূলে পল্লীর পর পল্লী। রলাঁদের পল্লীটির নাম Villeneuve, আর রলাঁর কুটীরটির নাম Villa Olga।

ভিল্নভের অদূরে Chateau de Chillon নামক দ্বাদশ শতাব্দীর একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। বায়ারগের কাব্যে এর বর্ণনা আছে, Bonnivardকে এখানে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। দুর্গটির তিনদিকে জল, একদিকে পর্বত। Bonnivard-এর কারা-কান্ডটির গবাক্ষ থেকে যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রহির মতো দিগ্‌বলয়। দেহকে যারা বেঁধেছিল কতটুকুই বা তারা বেঁধেছিল! আসল মানুষটি যে চোখের ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণই ফাঁকি দিত। বরং বন্দী ছিল তাঁর প্রহরীটা।

ভিলা অল্‌গার একপাশে Hotel Byron নামক বৃহৎ হোটেল। রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এইখানে ছিলেন।

রলাঁর কুটীরটির বাহিরটা নিঃসর। দেখলে প্রত্যয় হয় না যে এতবড় একজন সাহিত্যিক এরকম একটা অসুন্দর ছোট জরাজীর্ণ 'শালে'তে থাকেন। কিন্তু ভিতরটি সাজানো—বসবার ঘরে বইভরা শেল্‌ফ, বই-ছড়ানো টেবিল, ফুলের সাজি ফুল গাছের টাব, দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়ালজোড়া পিআনো।

রলাঁর সাক্ষাৎ পাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মনেই জাগেনি যে, তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপক।

দীর্ঘদেহ ন্যূনপুষ্ট মানুষটি, মুখখানি লাড়ুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উষ্টো-করে-ধরা পেয়ার ফলের মতো চওড়া সরু উঁচু নিচু। প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শাণিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্ধ সংকীর্ণ চিবুক। চোখ দু'টিতে কতকালের ক্লান্তি, হরিণশিশুর নিরীহতা। ঠোঁট দু'টিতে গাছীর চেয়েও সরল হাসি, বেদনায় পাণ্ডুর। সাদাসিধে পোষাক, নীলকৃষ্ণ সুট, টাই নেই, পাত্তীসূলভ কলার। এক হাতে দারিত্র্যের সঙ্গে অন্য হাতে অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ ক'রে এসেছেন, তবু ক্ষান্তি নেই, কঠিন খাটছেন, সকাল বেলাটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে লেখেন; রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় এমন ব্যাপ্ত যে, L'ame Enchantée—(মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা)র চতুর্থ ভাগ এখনও লেখা হয়ে উঠল না।

মণীন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মরাগে'র সূচ্যাদি করলেন, Wagner-কৃত জার্মান অনুবাদ পড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্তে’র ভূয়সী প্রশংসা ক’রে তাঁর সম্বন্ধে উৎসুক প্রকাশ করলেন। ‘শ্রীকান্তে’র ইতালিয়ান অনুবাদ হয়েছে, ফরাসী অনুবাদ হচ্ছে। দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠ ভারতীয় সংগীত শুনে প্রীত হয়েছেন, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্ম-সঙ্গীতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু মধ্যযুগের পরে উভয় সংগীতের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সংগীতের বহুদূর ছাড়াছাড়ি ঘটে গেছে, এখনকার ইউরোপ ও-সংগীত গ্রহণ করবে কি না নিশ্চয় ক’রে বলতে পারলেন না।

এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন, আপনার লোকের মতো ঘরোয়া ভাবে মৃদুনিষ্ঠ হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হ’য়ে পড়লেন রাজা গীতারের মতো। নির্বাণোগমুখ শিখার মতো স্থিতি নত্রে আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে পড়তে লাগল, বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হ’য়ে চেয়ার থেকে স’রে স’রে এসে খসে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে বাতনায় অধীর হ’য়ে ওঠেন।

প্রতীতির সহিত বললেন, নেশনরা বতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখছি অবসান হলো না! তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আর্টিস্টের কর্তব্য নিয়ে কথা উঠল। আর্টিস্ট কি কেবল চিরকালের সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে, না, স্বকালের সমস্যা-সমাধানও সাহায্য করবে? বললেন, দুই-ই করবে। সকল যুগের জন্যে কিছু, নিজের যুগের জন্যে কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মা আছে—কোনোটার কাজ আর্টের পূজা, কোনোটার কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিস্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চা ক’রে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালোর স্বপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগান্ডা করবে, ভলতেয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাবে। এর জন্যে যে তার যুগোত্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়, কেন না তার যুগোত্তর সৃষ্টির ভার তার যে-আত্মাটির হাতে সে-আত্মাটি কিছু সর্বক্ষণ সজাগ নয়।

মানুষের একাধিক আত্মা আছে একথা রলার রচনার অনেক স্থলেই পড়েছি, তবু মানুষের অখণ্ড ব্যক্তিত্বটাকে এমন খণ্ড খণ্ড ক’রে দেখার প্রস্তাবে মন সায় দিলে না। তা’ছাড়া সমস্যা তো প্রতিযোগেই আছে, প্রতিযোগেই থাকবে, সেজন্যে ভাববার ও খাটবার লোকও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আর্টিস্ট তাঁদের কাজ কেড়ে নেবে কেন? তাঁদের বাহন হবে কেন? বিপুল আর্টের দেবী কি বড় সহজ দেবী? অসম্পন্ন পূজা না পেলে কি তিনি বরদান করেন? কালিদাসের যুগের সমস্যার জন্যে কালিদাস কী করেছিলেন? গ্যোটের যুগের সমস্যার জন্যে গ্যোটে কী করেছিলেন? জিজ্ঞাসা করলুম, শেক্সপীয়ারের যুগেও তো সমস্যা ছিল, তাঁর সৃষ্টিতে তার ছায়া দেখিনে কেন? তাঁর স্বকালের প্রতি তাঁর দায়িত্ব দেখিনে কেন? উত্তরে বললেন, কিছু কিছু দেখি বৈকি। কিন্তু তাঁর যুগে হয়ত এযুগের মতো বড় কোনো সমস্যা ছিল না।

মন না মানলেও প্রতিবাদ করলুম না। এই যথেষ্ট যে, আর্টিস্টকে রলা দেশবালের অনুরোধে বিপুল আর্ট চর্চা মূলত্ববি রাখতে বলছেন না, বিসর্জন দিতে বলছেন না, বলছেন শুধু তাই ক’রে নিরস্ত না হ’তে, তাইতেই আবদ্ধ না রইতে। রুশনায়কদের মতো ফরগায়োস দিচ্ছেন না যে, ‘হে

আর্টিস্ট, তুমি যুথের মনোরঞ্জন করো, যুথতন্ত্রের জয়গান করো, বলো বন্দে যুথম্'; কিংবা ভারত-নায়কদের মতো কতোয়া দিচ্ছেন না যে, 'যর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন হে কবি, তোমার কাব্যবিলাস ছাড়ো, ফায়ার ব্রিগেডে ভর্তি হও, নেহাৎ যদি তা না পারো তো অন্যদের কর্তব্যসচেতন করতে সব রস ছেড়ে কেবল ঝাল রসের কবিতা লেখো।' তিনি যা বলছেন তার মর্ম এই যে, মানুষের সমস্তটা যখন আর্টিস্ট নয় তখন বিগুঙ্ঘ আর্ট সৃষ্টির অবসরে সে অপর কিছুও করতে পারে, এবং যেহেতু তার অন্ত হচ্ছে লেখনী কিংবা তুলিকা সে-হেতু তারি সাহায্যে সে ধর্মযুদ্ধ করলে ভালো হয়। এইটে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তিনি আর্টিস্টকে অন্-আর্টিস্ট হয়ে যুগ-ঋণ শোধ করতে বললেও অন্-আর্টকে আর্ট বলেননি, প্রোপাগান্ডাকে আর্টের থেকে পৃথক ক'রে যত্ন-পন্থ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

কথায় কথায় বললেন, টাকার জন্যে আর যাই করুন বই লিখবেন না। টাকার জন্যে অন্য খাটুনি, আনন্দের জন্যে বই-লেখা। ... তাঁর নিজের যৌবনে তিনি দারিদ্র্যদায়ে শিক্ষকতা করেছেন, আরো কত কী ক'রে স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, কষ্টার্জিত স্বল্পপরিমিত অবসর-সময়কে ফাঁকি দিয়ে সরবতীর সেবা করেছেন, কিন্তু সরবতীকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেননি।

সমাজের প্রতি আর্টিস্টের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য কিছু-ক'রে কায়িক শ্রম করা, আর্টিস্টও যখন ব্যক্তি তখন আর্টিস্টেরও এই কাজ করা উচিত।

ম্যাদলীন রলী টিল্লনী দিলেন, স্বয়ং কায়িক শ্রম করবার অবসর পাননি ব'লে রলীর একটা আক্ষেপ থেকে গেছে—তাঁর শরীর ভেঙে পড়বার-ওটাও একটা কারণ।

কিন্তু যে-মানুষ জগৎকে জাঁ ক্রিস্তফ্ দিতে পারেন সে-মানুষের শক্তি কায়িক শ্রমে অপচিহ্ন হ'লে কি জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতো না? আর্টিস্ট যদি কায়িক শ্রমে হাত দেয় তো ইতোনষ্টন্ততোজষ্টের আশঙ্কা থাকে না কি?

ম্যাদলীন রলী বললেন, এমন কোনো কথা নেই। এই যে তিনি অর্থাভাবে ছেলে পড়িয়ে সনয় ক্ষয় করতে বাধ্য হলেন এর বদলে যদি কায়িক শ্রম করলে চলত (অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের জন্যে আবশ্যিক অর্থ জুটত) তবে তাঁর স্বাস্থ্যের এদশা হতো না, তিনি আরো কত সৃষ্টি করতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস এই আভ্যস্তিক স্পেশালিজেশনের যুগে সর্বমানবকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখবার জন্যেও একটা-কিছু দরকার, নইলে উর্ধ্বশ্রেণীর মানুষ নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বুঝবে কী সূত্রে? যারা গভর খাটিয়ে খায় তাদের উপর থেকে যারা মাথা খাটিয়ে খায় তাদের অবজ্ঞা ঘুচবে কী ক'রে?

বুঝলুম মহাস্বাভীর্ষ সর্বভারতীয় যোগসূত্র যেমন চরকা, রলীর সর্বমানবিক মিলনসূত্র তেমনি কায়িক শ্রম। উভয়ের মনের এই ভাবটি টলস্টয়ের সূরে বাঁধা। শ্রমীদের ওপরে বিশ্বাসীদের পরগাছাবৃত্তি পৃথিবীওদ্ধ মানব-প্রেমিককে ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজের যেসব দাস-মক্ষিকা এত যুগ ধ'রে সমাজের রাণী-মক্ষিকাদের জন্যে আনন্দহীন খাটুনি খেটে এসেছে, সেই সব দলিত মানব আজ ফগা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটা হচ্ছে শূদ্রবিদ্রোহের যুগ। তারা বলছে, পেটের দায় তো প্রতি মানুষেরই আছে, একলা আমরা কেন খেটে মরব? এসো, সকলে মিলে দায় ভাগ করে নিই, কায়িক শ্রম তোমরাও করো আমরাও করি। শূদ্রবিদ্রোহের এই মূল-ধূয়াটার এখন জগৎ ভুড়ে মহলা চলেছে, বৈশ্যরা ভয়ে কাঁপছেন, ক্ষত্রিয়রা ঘটা ক'রে গোঁফে তা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণরা রফার উপায় খুঁজছেন।

সাময়িক একটা রফার দিক থেকে রলী-গাফীর প্রস্তাব মতো প্রতি মানুষের আংশিক শূদ্রীকরণের মূল্য আছে, সন্দেহ নেই। এঁরা না বললেও ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে শূদ্র ধর্ম স্বীকার করতেই হবে সকলকে। ঘটনাচক্রে বাধ্য হ'য়ে সকলেই একদিন ক্ষাত্রধর্ম স্বীকার করেছিল।

ঘটনাক্রমে বাধ্য হ'য়ে সকলকেই আজ বৈশ্যধর্ম স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনকার দিনে এমন কোন আর্টিস্ট আছেন—ব্রাহ্মণ আছেন—যিনি অন্ন বস্ত্রের জন্যে অর্থ উপার্জন করছেন না? কেউ আর্টের বিনিময়ে করছেন, কেউ অন্য কিছু বিনিময়ে করছেন। আর্টের বেশ্যাবৃত্তি বার কাছে নীতিবিরুদ্ধ আর্টেডর বৈশ্যবৃত্তি তাঁর ভরসা। রলী টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু ইঙ্কলনাস্টারী করেছেন, রবীন্দ্রনাথ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু জমিদারী করেছেন। দায়ে প'ড়ে পরধর্মের শরণ না নিয়ে যখন উপায় নেই তখন শূদ্রোচিত কায়িক শ্রম ভালো, না, বৈশ্যোচিত মস্তিষ্ক-বিক্রয় ভালো? রলীর মতে প্রথমটা। যদিও কার্যতঃ তিনি দ্বিতীয়টার আশ্রয় না নিয়ে পারেননি। কারণ, হাতের দাসত্বের চেয়ে মাথার দাসত্বের বাজারদর বেশি—এক বোলশেভিক রাশিয়া ছাড়া সর্বত্র।

কিন্তু একটা না একটা দাসত্ব কি করতেই হবে চিরকাল? এমন দিন কি আসবে না যেদিন মানুষমাত্রই সর্বতোভাবে স্বাধী হ'বে নিজের নিজের ক্ষেত্রে, বিচ্যুত হ'তে বাধ্য হবে না স্ব-স্ব-ধর্ম থেকে? শূদ্রত্বের অগৌরব সকলে মিলে ভাগ ক'রে নিলে তো রোগের জড় মরে না, সকলে মিলে রোগে ভোগা যায় মাত্র। লেবারের ডিগনিটি প্রমাণ করবার জন্যে সকলে মিলে ম্যানুয়াল লেবার করলে তো বেগার খাটার নিরানন্দ অপ্রমাণ হয় না, কর্মের দাসত্বকে 'কর্তব্য' আখ্যা দিয়ে নিজেদের ভোলানো হয় মাত্র। প্রতিভার প্রেরণায় যে মানুষ চাষ করে সুতো কাটে, সে-মানুষের শূদ্রত্ব দাসত্বের প্রাণি কোথায় যে, তাই ভাগ ক'রে নেবার জন্যে রলীকে চাষ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে চরকা কাটতে হবে? সমাজ ধনী হবে, যদি প্রতি মানুষের প্রতিভা পায় আপন চরিতার্থতা। বিকচ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে যে জটিল সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হবে সেই সামঞ্জস্যই তো সমাজের আদর্শ, সেই তো সনাতন, সেই তো সম্পূর্ণ। চাতুর্বর্ণের সাক্ষ্য ঘটিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যবাহিনী বহিঃসান্য স্থাপনা করলে সাময়িক একটা রক্ষা হয়তো হয়, কিন্তু এতে মানুষের তৃপ্তি নেই। মানুষ চায় স্বত্বত্বের স্বাধীনতা, এ ছাড়া আর সমস্তই তার পক্ষে দাসত্ব। শূদ্রকে দাও স্বত্বত্বের স্বাধীনতা, তার শ্রম হোক তার কাছে গান গাওয়া ছবি আঁকার মতো আনন্দময়, তার শ্রমের পুরস্কারে সে রাজা হোক—কিন্তু অশূদ্রকে স্বধর্মচ্যুত ক'রে পূর্ণতঃ হোক অংশতঃ হোক শূদ্র কোরো না; তার বীণা তুলি কেড়ে নিয়ে তাকে কাণ্ডে হাড়ড়ি ধরিয়ে না; মাত্র আধঘণ্টার জন্যে হলেও তাকে দিয়ে চরকা কাটিয়ে না।

কায়িক শ্রম সম্বন্ধে আমার এই সব ধারণা আমি রলীকে জানাইনি। জানালে সম্ভবতঃ তিনি বলতেন যে, একই মানুষ কি ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই হ'তে পারে না? প্রতি মানুষের মধ্যে যে একাদিক আত্মা আছে! Maeterlinck নাটক লেখেন, লাঙল ঠেলেন, মৌমাছি ও পিপড়েদের তদারক ক'রে প্রামাণ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ লেখেন—তাঁর তা হ'লে গোটা তিনেক আত্মা। কোনোরকম কায়িক শ্রমের প্রতি যার একটাও আত্মার একটুও রুচি নেই এমন মানুষ সম্ভবতঃ একজনও পাওয়া যাবে না।

এমন যদি তিনি বলতেন তবে আমি আপত্তি করতুম না। নিজেকে নানাদিকে কুশলী করবার সাধ মানুষ মাত্রেরই আছে। এই সাধ যদি মানুষ মাত্রকেই সুতো-কাটা নামক কাজটিতে কুড়ী হ'তে প্রেরণা দেয় তবেই সে চরকা ধরবে। নড়বা স্পেশালিজেসনের প্রতিকার স্বরূপ কিংবা সর্বতোভাবে আত্ম-সম্পূর্ণ হবার দূরশায় কিংবা সর্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হবার ধারণায় যদি ধরে বা ধরতে বাধ্য হয় তবে সেটা হবে তার সৃষ্টির সতীন, তার অন্তরের দাসত্ব। আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও সেটা তার স্বাধীনতার শ্বাসরোধী। সার্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্বমানবের যে একীকরণ সে-মাত্রের উদ্‌গতা যদি রলী-গাফী-টলস্টয় ও হন তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।

মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? রলী বললেন, এ যুগের লোকের দুঃখ সুখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না ব'লে। ভিত্তর উগোর মতো জনসাধারণের কবি



থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বৈকি।

এবার তাঁর মনের আরেকটা কোণ ছোঁয়া গেল। তাঁর কাছে আর্টের অভীষ্ট সমঝদার, আলটিমেট সমঝদার—জনসাধারণ। জনসাধারণের জনেই আর্ট। তিনিই একদিন People's Theatre-এর পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু শিব তা-থেকে যদি একজন মানুষও বঞ্চিত থাকে: তবে আর্টিস্টের আনন্দ অর্পণ থেকে যায়। তা বলে তিনি কোথাও এমন বলেননি যে, জনসাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, খাটি আর্টের আবেদন এমন গভীর যে, নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়। প্রমাণ, শেক্সপীয়ারের নাটক। ও-জিনিস বোঝবার জন্যে বৈদ্যের দরকার থাকতে পারে, কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। শেক্সপীয়ার দেখবার জন্যে ইতর সাধারণের আগ্রহ শিক্ষিতদের আগ্রহকে ছাড়িয়ে যায়।

চা খেতে খেতে শেষ কথা হলো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে। সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে তবে তার জন্যে কি সাহিত্যিক দায়ী হবে? বললেন, ধর্মের প্রভাবে জগতে কত যুদ্ধই ঘটে গেছে, তার জন্যে কি কেউ ধর্ম-সংস্থাপকদের দায়ী করে? সাহিত্যিক যদি সুহৃদ্য না হয়ে থাকে তবে সমাজের সত্যিকার আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যিকার আদর্শের বিরোধ হবে না; আর যদি সুহৃদ্য না হয়ে থাকে তবে তার রচনাকে সাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যকে সাজা দেওয়া সাজে না।

রল্লার কথাগুলির প্রতিলিপি দিতে পারলুম না, ভাবছায়া দিলুম। এইখানে বলে রাখি যে, এই আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হয়েছিল মণি-দা'তে ও রল্লা'তে; এবং আমি ফরাসী ভাষা না বুঝতে পারায় তথা রল্লা ইংরেজী আদৌ না বলতে পারায় মণি-দা'র ও কুমারী রল্লার ওপরে আনাকে এতটা নির্ভর করতে হয়েছে যে, এই লেখায় অনেক ভুলচুক থেকে গিয়ে থাকতে পারে। তবু মোটের ওপর এতে কিছু এসে যাবে না এই জন্যে যে, এই আলাপ-আলোচনার আগে ও পরে বহুবার আমি রল্লার মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-পরিচিত হয়েছি। এসব তাঁর মুখে নতুন শুনলুম এমন নয়। আমরা তো তাঁর কথা শুনতে বাইনি, আমরা গিয়েছিলুম তাঁকে শুনতে—ও তাঁকে দেখতে। কাব্য পড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন কি না, এইটি জানবার জন্যে প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে। সৃষ্টি দেখে শ্রুতার যে-কল্পমূর্তিটি গড়া যায় বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা ক'রে না দেখা পর্যন্ত যেন সৃষ্টিটাকেই পূর্ণরূপে দেখা হয় না।

জাঁ ফ্রিটকের শ্রুতাকে তাঁর ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে-কল্পমূর্তিটিকে গড়েছিলুম সে-মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলতে হলো বলে দুঃখ হলো, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাসতে বাধল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাকলে শ্রদ্ধা বাড়ত, কিন্তু ঐশ্বর্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহে মনে সুসমঞ্জস পার্সন্যালিটি বলতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি; গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রল্লা'কে দেখে হলুম। এঁদের দেহ এঁদের মনের আওনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ও আওনকে ঢেকেছে; সম্যাসীর গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি তেমন রল্লার প্রতি এমন একটি মমতা জাগল যেমনটি নিছক গুণীব্যক্তির প্রতি জাগে না। ভালোবাসা ও ভালোলাগার মধ্যে কোনখানে যে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে চিন্তা ক'রে তার নিরিখ পাইনে, বোধ ক'রে তার অস্তিত্ব জানি। এক-একটা বিরাট পার্সন্যালিটির সংস্পর্শে এলে এই বোধ-ক্রিয়াটি একান্ত সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

ফরাসীদের পারী নগরীর নামে পৃথিবীতন্ত্র লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনীর বোগদাদ আর কথাসাহিত্যের পারী উভয়েরই সম্বন্ধে বলা চলে, 'অর্ধেক নগরী ভূমি অর্ধেক কল্পনা।' পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই। দু'টি হাজার বৎসর তার বয়স, তবু চুল তার পাকলো না। কতবার তাকে কেন্দ্র ক'রে কত দিগবিজয়ীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো, কতবার তার পথে পথে সাম্য নৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগন্ধা ছুটল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসতরু ও কত দুঃসাহসী, বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন, সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নাট্যকলায় সুগন্ধিশিল্পে পরিচ্ছদকলায় স্থাপত্যে ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠল। পারীই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবান সম্ভোগপ্রার্থীদের জন্যে খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতিদেশের নিঃসম্মল শিল্পী ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্যে মুক্ত। একদিক থেকে দেখতে গেলে পারী রূপোপভীবিনী, আমেরিকান টুরিস্টদের হীরা জহরতে এর সর্বদ্য বাঁধা পড়েছে, তবু জাপান অস্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা থেকেও শৌখিন বাবুরা আসেন এর দ্বার-গোড়ায় ধর্না দিয়ে একটা চাউনি বা একটু হাসির উচ্চিষ্ট কুড়োতে। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে পারী অম্লপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল্‌রুশ্‌ ক্রমেনিয়ানকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেত-সেনার নায়ক করে এবং নানাদেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভ'রে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও যোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত টুরিস্ট আসে না; পারী দেখতে প্রতি বৎসর যে-কয় লক্ষ বিদেশী আসে, তাদের পনেরো আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারীই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের লোকের চোখে পারী হচ্ছে লণ্ডন ভিয়েনা বার্লিন মস্কোর চেয়েও আন্তর্জাতিক। আমেরিকান বিদ্যার্থীতে পারী ছেয়ে গেছে, আর ইউরোপের নানাদেশের বিদ্যার্থীদের কাছে পারী চিরকালই আমাদের কাশীর মতো কালচার-পীঠ। শুধু কাশী নয় কামরূপও বটে, যত রাজ্যের রোমান্স-পিপাসু এই নগরীতেই তীর্থ করতে আসে।

আয়তনে ও লোকসংখ্যায় পারী লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক, কলকাতার প্রায় তিন গুণ। আজকালের দিনে একটা শহরের সঙ্গে আরেকটা শহরের বাইরে থেকে যে তফাৎ সেটা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বড় ভাইয়ের তফাৎ, বয়স ও বুদ্ধির উনিশ-বিশ থাকলেও পারিবারিক সাদৃশ্য উভয়েরই মুখে।

পারীতে ট্রাম মেট্রো বাস ট্যাক্সি ধোঁয়া কাদা বস্তি ব্যারাক লণ্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোটরগাড়ি কিছু বেশি সংখ্যক, বাড়িগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটর ওপর পারী লণ্ডনের মতো ফিটফাট নয়, বেশ একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরীব। উঁচুদরের বাস্তুকলা তার কয়েকটি প্রাসাদে সৌধে থাকলেও লণ্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ির নেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদ-সৌধের ছবি দেখে পারীকে যা ভাবি সর্বসাধারণের বাসগৃহ দেখলে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাসগুলি, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সপিগী নদীটি, সপিগীর দুই রসনার মতো সেন্‌ নদীর দু'টি অর্ধের মধ্যবর্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপত্যকার শ্রমোদ্যোদ্যান দু'টি।

পারীতে লণ্ডনের মতো পার্ক বিরল; তবে তার এক একটি রাজপথ এক একটি সরলরেখাকৃতি পার্ক বিশেষ। পারীর নিত্য মাঝারি রাজপথগুলিও সেন্ট্রাল অভিনিউর চেয়ে চওড়া। 'সাঁজেলিনী'র এক পাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপাশি দশটা চৌরদির মতো। সে তো একটি রাজপথ নয় একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথ, রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক একটি দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক একটা বুলভার্ড এক একটা বিরাট ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমনি গ্রন্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে একথা খাটে যে, একটি রাস্তা মানে একটি রাস্তা নয়, সমান্তরাল দু'টি তিনটি রাস্তা, কোনো কোনো স্থলে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলি ক'রে ভাগ আছে, যেমন ইস্ত্রধনুর সাতটি ভাগ। প্রথমে ফুটপাথ, ফুটপাথের পরে রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, তার পরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তার পরে আবার গাছের পার্টিশান, তার পরে আবার রাস্তা, তার পরে আবার ফুটপাথ। সব রাস্তার অবশ্য একই রকম ভাগ-বিভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুটপাথের ওপরে স্থলে স্থলে ছোট ছোট দোকান আছে, যেমন পুরীর 'বড় দাণ্ডে'র ওপরে অস্থায়ী ছোট ছোট দোকান। এক একটা ফুটপাথও রাস্তার মতো চওড়া, সেইজন্যে তার স্থলে স্থলে এই সব দীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান। ঠিক আমাদের দেশের মতো সে সব দোকানে ভিড় জমেছে, দরদস্তর চলেছে, হেঁটে হট্টগোল।

আমাদের সঙ্গে ফরাসী ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালোবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহী রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রামগ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা ব'লে এরা বড় কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী খুব খাটতে পারে ব'লে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করবার সময়ও জামা সেলাই করছে, শৌখিন জামা। জামা কাপড়ের শখটা ফরাসীদের অনন্তব রকম বেশি, বিশেষ ক'রে ফরাসী মেয়েদের ও শিশুদের, পুরুষরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ তাদের জাঁদরেলী গোঁফ, তাদের সেই ব্রান্ডান্ডটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর তত নজর তাদের দান-না-করা গাতের দিকে নেই। সুগন্ধিশিষ্ট পারীকে আশ্রয় করবার কারণ হয়তো এই। হাঁ—পারীর লোক খুব খাটতে পারে বটে, খুব ভোরে উঠে খাটতে আরম্ভ ক'রে দেয়, অনেক রাত অবধি খাটে, কিন্তু পানাহারটা সেই অনুপাতে ঘটা ক'রেই করে। এরা ব্রেকফাস্ট বেশি খায় না, লান্সটা ইংলণ্ডের তুলনায় বেশি খায়, আর ডিনারটা ইংলণ্ডের তুলনায় রাত ক'রে খায়। আহার সম্বন্ধে এদের মোগলই রুচি, গোপালের মতো যাহা পায় তাহা খায় না, রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে তো পারীতে। এত রকমের খাদ্য এত সস্তায় কেন অনেক দাম দিয়েও লণ্ডনে পাবার যো নেই। দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সম্বন্দ্যর, সেই জন্যে যে-কোনো রেস্টুরায় সব দেশের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে পারীতে অত্যন্ত খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সহিত খেতে পারা যায়। রান্নাটা উঁচু দরের তো বটেই, রান্নাটা টাটকা। শাকসবজী ও মাংসের জন্যে ইংলণ্ড অন্য দেশের মুখাপেকী, ফ্রান্স তেমন নয়।

এ তো গেল আহারতত্ত্ব। ফরাসীরা পাননিপুণও বটে। যে কোনো রেস্টুরায় গেলে ভোজ্য তালিকাও সঙ্গে সঙ্গে একটা পানীয় তালিকাও দেয়। ও-রসে বঞ্চিত ব'লে খাঁটি খবর দিতে পারব

না, কিন্তু সে জন্যে অপদহু হয়েছি পদে পদে। এ কেমন মানুষ যে 'ভ্যা' খায় না?—এই ভেবে ওরা হাঁ করে থাকায়। আমি মনে করেছিলুম ইংরেজরাই ভারি মদ খায়, কেননা লণ্ডনের অলিতে গলিতে 'পাব্লিক বার'। ও হরি! পারীর গলিতে গলিতে যে, একটা নয় দুটো নয় পঞ্চাশটা কাফে! লণ্ডনে কাফে নেই, কাফে নামধেয় যা আছে আসলে তা রেস্টুরাঁ, লণ্ডনের রেস্টুরাঁর সংখ্যা পারীর তুলনায় আঙুলে গোণা যায়।

এই কাফে জিনিসটি ফরাসী সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলিতেই তৈরি হয়েছে, ইংলণ্ডের ইতিহাস যেমন তৈরি হয়েছে তার ইন্ডলগুলির প্রেগ্রাউণ্ডগুলিতে। পঞ্চাশ নাটকের মতো যতগুলি বিপ্লবের অভিনয় পারীতে হয়ে গেছে সকলগুলির রিহার্সল্ হয়েছিল কাফেগুলিতে, কাফেই হচ্ছে ফরাসীদের চণ্ডীমণ্ডপ, ফরাসীদের ক্লাব। কাফেতে গিয়ে এক পেয়লা কাফী বা শোকোলা ('Chocolat') বা হালকা মদের ফরমান ক'রে যতক্ষণ খুশি ব'সে আড্ডা দাও—দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা! তাস খেলো, দাবা খেলো, গান বাজনা শোনো, কাগজ পড়ো, চিঠি লেখো, ছাত্র হয়ে থাকো তো পড়া করো। কাফেতে একবার গিয়ে বসলে আর উঠতেই ইচ্ছা করে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে ইয়ার্কি দেওয়া, ফ্লার্ট করা, একটু আধটু নেশায় ধরলে রসকৌতুক থেকে মাথা ফাটোফাটি পর্যন্ত উদার মুদার তারা। ওরই মধ্যে একটু হান ক'রে নিয়ে একটু আধটু নাচাও হুলবিশেষে হয়। অনেক তপস্বীর তপস্যা আর অনেক কুঁড়ের কুঁড়েমি দুই একসঙ্গে চলতে থাকে যখন, তখন একথা বিশ্বাস হয় না যে এদের কেউ কোনোদিন জগৎকে ধন্য ক'রে দেবে চিত্তাবেশিষ্টো, অবাক ক'রে দেবে কর্মনেতৃত্বে, মুগ্ধ ক'রে দেবে অভিনেত্রীরূপে। তখন এই কথা মনে হয় যে, এদের যেমন খাটুনির সীমা নেই তেমনি কুঁড়েমিরও সীমা নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল মজলিসী রসিকতা আর মজলিসী আদবকায়দা আর মজলিসী সুরাপান।

এই একটা মস্ত জিনিস যে কাফে ভয়ানক সস্তা। দু'চার আনা বরচ ক'রে দু'ঘণ্টা এক হানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা—লণ্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলোতে তর্কসভা বসে—সেইগুলোই আমাদের ভারী যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভারী সাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভারী রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘটবে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের নাটিতে শিকড় গেড়ে আমাদের বট অশ্বখের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন আমার মনে হয় না। ঐ চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা ক'রে পাঠাগার জুড়ে দিলে ঐগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।

কাফের মতো 'পাতিসেরী'গুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরী মানে কেব্‌ রুটির দোকান, ওখানে গিয়ে কেব্‌ কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতিসেরীতে চা-কাফী খাবার জন্যে একটু ঠাই ক'রে দেওয়া হয়, সেই সুযোগে গল্প ভ্রমে, তর্ক ওঠে, আলাপ পরিচয় হয়, দেশের মানুষ দেশের মানুষকে চিনতে চিনতে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিনতে চিনতে বিদেশকে চেনে। ফরাসীরা ইংরেজদের মতো নীরবপ্রকৃতি নয়, গভীরপ্রকৃতি নয়; ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু'একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করে চুপ ক'রে না, ওরা বকে আর বকায়।

পারীর লোক জন্ম-রসিক। আমাদের জন্যে এমন অকুপণ ব্যবস্থা কুপ্রাণি নেই। অবশ্য আমোদ মাত্রেই বিবুদ্ধ নিষ্পাপ হরিনাম জপ করা নয়, বরং বহুক্ষেত্রে পক্ষিল। পথে যাটে জুয়োর আড্ডা। এ আপদ লণ্ডনে নেই। পথে যাটে নাগরদোলা প্রভৃতি শিশুসুলভ কৌতুক। খেলাধুলোর রেওয়াজ ইংলণ্ডের মতো নেই। ইংলণ্ডে মাঠে মাঠে ফুটবল খেলা, টেনিস খেলা, সীতার। ইংরেজরা

জন্ম-খেলোয়াড়। স্বাস্থ্যচর্চাটাকেই ওরা চরম ব'লে জেনেছে। ঐখানে ওদের জিৎ।

পারীতে অন্ততঃ বিশটি উঁচুদরের থিয়েটার আছে। এছাড়া সিনেমা, 'কাবারে' (Cabaret) ও সংগীতশালাও আছে অগুনতি। 'কাবারে'গুলি পারীর বিশেষত্ব, লগুনে নেই, লগুনে প্রবর্তন করবার প্রস্তাব অনেকে করছেন। এর সঙ্গেও ফরাসী ইতিহাসের যোগ আছে, কেননা এতে যে সব নাচ তামাসা হয় সে সব অনেক সময় পলিটিক্যাল ব্যঙ্গবিদ্যুপ। সংগীতশালা পর্যায়ভূক্ত এমন সব রদানায় আছে যেখানে কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখানো হয়, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্বন্ধ নেই, এবং দৃশ্যের সঙ্গে বাদ্য আছে, কিন্তু কথা নেই। একে বলে 'revue', এ জিনিস লগুনেও প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এ জিনিস আসরে নামাতে অনেক টাকা অনেক বুদ্ধি ও অনেকখানি 'নির্লব্ধতা' দরকার। এ সকলের সমন্বয় লগুনে দুর্লভ, লগুনের লোক এক নম্বরের গুচিবাস্তুগ্রস্ত। পারীর লোক বিবসনা স্ত্রী মূর্তি দেখে শক্দ্ হবে, এমন কচি থোকা নয়। তারা অতি অল্প বয়স থেকে পারীর দশ বায়েটা মিউজিয়ামে গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখে চোখকে শিক্ষিত ও চিত্তকে নির্বিক্রম করেছে; তারা রুশো-ভলতেয়ার ও জোলা-ফ্রোবেয়ারের রচনা প'ড়ে সুনীতি দুর্লভি ও সুকৃতি কুরুচির হিনাব-নিকাশ ক'রে রেখেছে; তারা আনাদের সংস্কৃত সাহিত্যের নাগরিক,—ন্যাকামি বা নাসিকা-সীটকারকে তারা উচ্চাসের মর্যালিটি বলে না; তারা সুন্দরের সমঝদার, মানবদেহকেও সুন্দর ব'লে জানে। 'মূল্য্য রুজ' বা 'ফোলী বের্জেয়াবে' অর্ধ-বিবসনাদের নির্নিমেষনেই নিরীক্ষণ ক'রে শক্দ্ হ'তে পিউরিটান নিউ ইংলণ্ডের টুরিস্টরা দলে দলে যান, আসল ফরাসীরা যায় কিনা সন্দেহ; যদি বা যায় নৃত্যনৈপুণ্য বা সম্ভ্রান্তৈপুণ্য খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো শিক্ষা নিয়ে যায়, কেবল একজোড়া কৌতূহলী চক্ষু ও একটা শুচিবাস্তুগ্রস্ত মন নিয়ে যায় না। পারীর বহুসংখ্যক প্রদোদাগার বিদেশীদের জন্যই অভিপ্রেত এবং তাদেরই দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। মার্কিনের টাকার লোভে মার্কিনের বৈশ্যসুলভ স্থূল রুচির ফরমাস তারা খাটছে। এই আভিজাত্যহীন পঙ্করস-বোধ, এই চর্চা-অবসরহীন পল্লবগাহী সমঝদারী, এই অবিশ্রান্ত অফুরন্ত থ্রিল পিপাসা ফরাসী কালচারকে ডলারের গালা মেরে উড়িয়ে দিতে বসেছে, এর আক্রমণে ফরাসীদের বিপুল আর্ট হয়তো আর বেশিদিন টিকবে না, ফরাসী সভ্যতার সরস্বতী অবশেষে বাঈজীর মতো সস্তা গান গুনিয়ে ও সস্তা নাচ নেচে সরাব পান ক'রে নাসিকাধ্বনি করবেন। ফরাসী জাতিটার অমেয় জীবনীশক্তির ওপরে আমার অটল আস্থা আছে ব'লেই যা' আশা হয় চর্চদৃশ লুই ও প্রথম নাপোলেনের দেশ এই নতুন আঘাতকেও যথাকালে কাটিয়ে উঠবে, এই বিষকেও পরিপাক করবে নীলকণ্ঠের মতো।

ফরাসীরা একটা আত্মবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিস্ট, তারা দু'দল চরমপন্থীর সমন্বয়—গোঁড়া ক্যাথলিক আ- গোঁড়া যুক্তিবাদী। যারা মানে তারা সমস্ত মানে, ঈশ্বর শয়তান স্বর্গ নরক যীশু যীশুর কুমারী-মাতা পোপ কন্ফেসন প্রতিমা কর্মকাণ্ড। যারা মানে না তারা কিছু মানে না, তারা জ্ঞানমার্গের নাইহিলিস্ট, তারা বদ্ধ নীলিক, তারা পাঁড় এপিফিওর। জাতটা অতিমাত্রায় শক্তের ভক্ত অথচ নৈরাজ্যবাদী। বাঙালী জাতিটার সঙ্গে এ বিষয়ে এদের মিল আছে—যেমন ইমোশনাল তেমনি নাস্তিক; তারা মানে তারা মন দিয়ে মানে না, হৃদয় দিয়ে মানে,—যারা মানে না তারা মন দিয়ে উড়িয়ে দেয়, হৃদয় দিয়ে পারে না। নইলে আনাভোল ফ্রাঁসের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ কখনো গত মহাযুদ্ধের মতো নির্বোধ একটা ব্যাপারের তলা পর্যন্ত দেখেও সস্তা পেট্রিয়টিজনের ঢাক পিটতে যান?

গোঁড়া ধার্মিক হোক গোঁড়া অধার্মিক হোক রসবোধ জিনিসটা এদের জাতিগত, ও জিনিস

এরা খ্রীষ্টধর্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি ব'লে ও নিয়ে এরা বগড়া করে না। Venus de Milo-র উলদ সৌন্দর্য এরা পিতাপুত্র মিলে দেখে এবং পিতাপুত্র মিলে আলোচনা করে। উলদ তা নিয়ে তর্ক বাধে না, ওটা চোখ-সওয়া হয়ে গেছে, ওটা স্বাভাবিক, ওটা উভয় পক্ষেই আবশ্যক ব'লে ধ'রে নিয়েছে, তর্ক বাধে সৌন্দর্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বললে অবাস্তব হবে না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটা তফাৎ আছে—ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক প্রভৃতি জাতিরা দেখকে প্রগাঢ় ভালোবাসে ও ভক্তি করে, সহজিয়াদের মতো দেহের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজে পায়। এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতারা সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃমূর্তি আঁকে তখন স্তনের ওপরে বস্ত্র টেনে দেয় না, যখন বালক যীশু আঁকে তখন খানোখা কৌশল দিয়ে দেয় না, বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতৃমূর্তির চোখে সুধা মাখিয়ে দেয়, শিশুমূর্তির মুখে তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলে। উত্তর ইউরোপের লোক প্রোটেষ্ট্যান্ট, গোড়া নিরাকারবাদী, ওদের চিত্রকলা একান্ত দরিদ্র, ভাস্কর্যের বালাই ওদের নেই। ওরা মুসলমান, এরা হিন্দু। ওদের তেজ বেশি, এদের লাভণ্য বেশি।

এখন বলি পারীর থিয়েটারগুলির কথা। প্রথমতঃ, পারীর থিয়েটারগুলি অসম্ভব সস্তা, দ্বিতীয়তঃ, তাদের আয়োজন অসম্ভব জাঁকালো। লগনে যত খরচ ক'রে যে-দরের রাজসভা বা যে-দরের অভিনয় দেখতে পাওয়া যায় পারীতে তার সিকিভাগ খরচ ক'রেও তার চারওণ ভালো রাজসভা চারওণ ভালো অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসীরা ভালো জিনিসের কদর বোঝে, দলে দলে দেখতে যায়, প্রত্যেকে অল্প অল্প দিলেও সবশুদ্ধ অনেক টাকা ওঠে, ফলে প্রযোজনার খরচ পূরিয়ে যায়। এছাড়া গভর্নমেন্টও থিয়েটারওয়ালাদের অর্থসাহায্য করে, যদিও সাহায্যরূপ ডান হাতে যা দেয় ট্যাক্সরূপ বাঁ হাতে তা ফিরিয়ে নেয় ব'লে থিয়েটারওয়ালাদের আক্ষেপ। তবু এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, গভর্নমেন্ট ডান হাতে যা দেয় ওটা মূলধনের কাজ করে ও ঐ থেকে উচ্চাদের প্রযোজনার গোড়াকার খরচ জোটে।

পারীর থিয়েটারগুলোর জাতিবিভাগ আছে, যেটাতে অপেরা হয় সেটাতে কেবল অপেরাই হয়, যেটাতে কমেডী হয় সেটাতে কেবল কমেডীই হয়, যেটাতে ক্লাসিক (গ্রীক নাটকের অভিনয়) হয় সেটাতে কেবল ক্লাসিকই হয়। লগনে কোনো স্থায়ী অপেরা-গৃহ নেই এবং জাতিবিভাগ নেই। একটি স্থায়ী অপেরার ক্রীম চলেছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট এক পেনীও সাহায্য করবে না, এবং জনসাধারণও যথা-প্রয়োজন শোয়ার কিনবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং যতদূর দেখছি লগনের ভাগ্যে আছে ভ্রাম্যমান অপেরার দলগুলির মধ্যে মধ্যে শুভাগমন। তাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি ব্রিটিশ সেগুলি গভর্নমেন্টের সাহায্য পায় না ব'লেই হোক কিংবা জনসাধারণের ওদাসীনা বশতই হোক কন্টিনেন্টাল দলগুলির কাছে মাথা তুলতে পারে না। কন্টিনেন্টাল দলগুলিতে অনেক দেশের শিল্পীরা যোগ দেয়, তাদের পেছনে অনেক দেশের টাকার জোর। পারীর যেটি স্থায়ী অপেরাগৃহ সেটি পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়, তার পেছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তার রাজসভা বহুকালাগত, তার নটনটীরা সমাজে বিশিষ্ট সম্মান পায়, তাতে তাদের গভর্নমেন্ট অনেক টাকা ঢালে ও সেটি তাদের জাতীয় সম্পত্তি\*। অথচ তার সীটগুলি যথেষ্ট সস্তা। পারীর দরিদ্রতম শ্রমিকও তার নিম্নতম শ্রেণীর দাম জোটাতে পারে, ধনী দরিদ্র সকলেরই জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মহার্ঘ বেশভূষা প'রে নহৈশ্বর্যময় স্টেজে অবতীর্ণ হয়। পারীর অন্যান্য থিয়েটারগুলোরও প্রযোজনা খুব চমকপ্রদ, অথচ সীট আরো সস্তা; চার আনা দিয়ে তিন ঘণ্টা আমোদ উপভোগ করতে পারা যায়, তবে এটা ঠিক

\* আমাদের গভর্নমেন্ট একজন মিনিষ্টার অফ ফাইন আর্টস থাকেন, ইলোও সেক্টর নেই, ইংরেজরা সব বিষয়ের মতো গ্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের পরপাতী।

লণ্ডনের সীটের আরাম পারীর সীটে নেই, লণ্ডনের লোক গদীপাড়া চেয়ার ছেড়ে কাঠের বেঞ্চিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে চাইবে না। পারীতে অনেক শ্রেণীর সীট আছে, অন্ততঃ দশ বারো শ্রেণীর; কিন্তু উচ্চতম থেকে নিম্নতম অবধি অল্প দামের ক্রমাধিত ব্যবধান, চার আনার পরে ছ'আনা, ছ'আনার পরে আট আনা, এমনি ক'রে সব চেয়ে দামী সীট হয়তো চার টাকা। লণ্ডনে কিন্তু এক টাকার পরে দু'টাকা তার পরে তিন টাকা, এমনি ক'রে সব চেয়ে দামী সীট হয়তো পনেরো টাকা। সেইজন্যে ইংরেজরা থিয়েটারের চেয়ে সিনেমাই দেখে বেশি, গরীব লোকদের সম্ভ্রতি নেই ব'লে তাদের রসবোধ অচরিতার্থ থেকে যায়। ইংরেজরা আর্টকে সর্বসাধারণের হাতে দেবার মতো স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে পারেনি, (এদিকে একমাত্র সফল প্রচেষ্টা 'Old Vic'), সেইজন্য আর্ট এদের কাছে গঙ্গাজলের মতো ন্যাশনাল নয়। আমরাও যে গ্রামের লোককে গ্রামছাড়া ক'রে শহরের কোণে কোণে বসি গড়ছি আমাদেরও তাবা উচিত গ্রামের যাত্রা পার্বণ কথকতা থেকে ও শহরের নাট্য সংগীত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে তারা সমগ্র দেশকে নিরানন্দ ক'রে তুলছে কি না। নাগরিকতার নাগপাশে জড়িয়ে ইংলণ্ডের আত্মা যে একান্ত ক্রিষ্ট বোধ করছে ইংলণ্ডের অসামান্য স্বাহোর আড়ালে ঢাকা পড়লেও তা সত্য। নাগরিক ইংলণ্ড প্রাণবান, কিন্তু অন্তবান নয়; অজর কিন্তু অমর নয়।

ফরাসীদের আর একটা জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামওলো। জগৎপ্রসিদ্ধ লুভর ছাড়া লুক্সাম্বুর্গ প্রোকাদেরো গীমে ইত্যাদি আরো ডজনখানেক ছোট বড় মিউজিয়াম আছে পারীতে। লুভরের ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না, তার আকার এত বড় যে সেটা একটা যাদুঘর নয় একটা যাদু-পাড়া, সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু'দিন লেগে যায়। Venus de Miloকে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে-ঘরে তার বন্ধুদের জন্যে চমৎকার বসবার বন্দোবস্ত হয়েছে, সে সব আসনে বসে যে কোনো কোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে পারা যায়, বলা বাহুল্য যে-দিক থেকেই দেখি না কেন সব দিক থেকেই সে সমান সুন্দরীনা। তাজমহলকে যেমন বার বার নানা আলোকে দেখেও চির-অপূর্ব মনে হয় গ্রীক ভাস্করের এই মানসী মূর্তিটিকেও তেমনি। তবে আমার ভারতবর্ষীয় চোখ নিছক রূপ দেখে ভূপ্তি পায় না, এবং বিউটিফুলের অভূপ্তির চেয়ে সল্লাইমের ভূপ্তিই তাকে প্রগাঢ়তর রস দেয়। সেইজন্যে 'প্রভ্রা-পারমিতা'র ওপরে তার একটা পক্ষপাত আছে, সে পক্ষপাত নিয়ে সে বিশ্বের সামনে তর্ক করতে চায় না, সেটা ভারতবর্ষীয়ের ধাতের পক্ষপাত।

আমাদের কালিদাস যে নীতিনিপুণ ছিলেন এহেন অপবাদ তাঁকে তাঁর শত্রুতেও দেবে না, আশা করি স্বয়ং দিগ্নাচার্য্যও দেননি। সেই শিল্পীই কিনা উমাকে শেষকালে জননীরূপে না ঐকে ভূপ্তি পেলেন না। ফলবতীর চেয়ে ফলবতী লতার প্রতি আমাদের ধাতুগত পক্ষপাত 'উবশী'র কবিকেও 'কল্যাণী' লিখিয়েছে—পারকেকশন নয়, পরিণতিই আগাদের প্রিয়। এবং নীতি নয় কচিই আমাদের অন্তমুখীন করেছে। বিবসনা শ্যামাকে না বলতে পারি তো বিবসনা Venusকেও প্রিয়া বলতে পারতুম, তবু যে বলিনে এর কারণ যতই নিখুঁত হোক না কেন, Venusএর পরিণতি নেই, বৃদ্ধি নেই, সে আমাদের শুধু একটা রসই দেয়, ভীবনের সমস্ত রস দেয় না, তার মধ্যে আমাদের কুমারের জননীকে দেখিনে—'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধু সুন্দরী রূপসী।'

লুভর মিউজিয়ামে 'মোনা লিসা' (লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-কৃত)-কেও দেখলুম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা করলেও চেষ্টা করলেও ভুলতে পারিনে। লুভরে কিছু না হোক লাখখানেক ছবি তো আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। কেমন ক'রে বলব যে তার চেয়ে কেউ সুন্দরী নয়? তখন তো মনে হচ্ছিল অনেকেই

সুন্দরতরা। একে একে সকলেই মিথ্যা হ'য়ে গেছে, বপুদুটার মতো। প্রভাতী তারার মতো চোখে লেগে আছে শুধু 'মোনা লিসা'র হাসিটি।

ফরাসীরা এসব ছবি এসব মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলি বুদ্ধলব্ধ। রাজা ভয় ক'রে অনেক বিজ্ঞতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসীরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসীদের হারিয়ে দিয়ে বিসমার্ক অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা আদায় ক'রেছিলেন, সে সোনা এতদিনে ধূলা হয়ে গেছে, জার্মানী এখন পুনর্মুখিক। কোন্ জাতি কোন্ জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস। ভারতবর্ষ যদি আত্মাকে সত্যিই তার সর্বস্ব দিয়ে কিনে থাকে তবে ভারতবর্ষের আত্মা মরবে না।

ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে যা' মনে হ'য়েছিল ফ্রান্সের লুভ্র ত্রোকাদেবো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে তাই মনে হলো—ভাবলুম, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জন্ম নিয়ে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হব, বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করব, তখন যদি আর্টক্রিটিক হ'য়ে উঠি তো বাংলা মানিকপত্রের মানিক সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে রসবোধের শ্রদ্ধা করব না, চোখ পাকবে কিন্তু মন পাকবে না, প্রতিদিন একটু ক'রে বড় হব কিন্তু বুড়ো হব না, আমার প্রাচীন দেশের পরিপক্ব শিক্ষাকে আমার চির-তরুণ অন্তরে ধারণ করব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ করব।

ফরাসী জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে কসমোপলিট্যান্—এর মানে এ নয় যে ওরা বিশ্বপ্রেনিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথ-ঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাদের সময় নেই তাঁরা কেবল পারীর মানচিত্রখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার নাম লণ্ডনের মতো প্রত্যেক পাতায় একটা করে Old Street, New Street, High Street ও Park Road নয়, রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Peking, Constantinople ইত্যাদি ও President Wilson, Edouard VII, Garibaldi, Hausmann ইত্যাদি। ফ্রান্সের নাম Etats-unis (যুনাইটেড স্টেটস্), Italie, Europ ইত্যাদি ও রেলস্টেশনের নাম George V, St. Francis Xavier, Michel-Ange (মাইকেল এঞ্জেলো) ইত্যাদি। এছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারীর সর্বাস্থে যেক্ষেত্রে সর্বাস্থে ত্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নামের মতো ছাপা। ফ্রান্সের লোকের দেশাত্মজ্ঞান অমনিক ক'রেই হয় ব'লেই তাদের দেশাত্মবোধ আপনা আপনি জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথে চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের—যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে; আর তাদের দেশের প্রতি জেলায় প্রতি শহরের প্রতি পর্বতের নাম—যাদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে ব'লেই তারা স্ববিশ্বকেও চিনতে পারে।



এ দেশে স্বতন্ত্র বর্ষাঋতু নেই ব'লে প্রত্যেক ঋতুই অংশত বর্ষাঋতু। সময় নেই অসময় নেই বর্ষাঋতুর বর্গীরা অপর ঋতুদের খাজনা থেকে চৌথ আদায় ক'রে যায়। সকালবেলা ওয়ে ওয়ে দেখলুম আলোতে ঘর ভ'রে গেছে, ফুটফুটে খোকার মুখে হাসি আর ধরে না, আকাশের সেই হাসি তরুণী ধরণীর মাড়-মুখখানিকে পুলকে গর্বে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। এটা বসন্তকাল। কোকিলের কুৎ শুনছিনে, কিন্তু সমস্তদিন কত পাখির কিচিমিচি। গাছেরা নতুন দিনের নতুন ফ্যাশান অনুযায়ী সাজ বদলে ফেলেছে, তাদের এই কাঁচা সবুজ রঙের ফ্রকটিকে তারা নানা ছলে দেখাচ্ছে, ঘুরে ফিরে দেখাচ্ছে, আধেক খুলে দেখাচ্ছে। বাতাস একজন গ্যালাণ্ট যুবার মতো তাদের শ্রীমুখের তুচ্ছতম মামুলীতম কামাদা-দুরন্ত ফরমাস ওনবে ব'লে উৎকর্ষ হ'য়ে নিমেষ ওনছে এবং ওনবামাত্র শশবাত্ত হ'য়ে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার সেই ব্যস্ততার উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে উঠে বসলুম। ভাবলুম এবারকার বসন্তটাকে এক ফার্সিং-ও ফাঁকি দেব না, পরিপূর্ণভাবে ভোগ ক'রে নেব। আকাশ এত নীল, মাটি এত সবুজ, বাতাস এত করবোষ, পাখি এত অহির, ফুল এত অজস্র—এই ভরা ভোগের মাঝখানে আমি যদি আনমনা থাকি তো আমার শিরসি চতুরানন কী না লিখবেন?

কিন্তু, এ কি হা হস্ত কোথা বসন্ত! দেখতে দেখতে এলেন কি না ইন্দ্রাজের ঐরাবতের পাল, স্বর্গরাজ্যের ইস্কুলমাস্টার তাঁরা, অত্যন্ত পক্ষ প্রবীণ অভ্যাস তাঁদের গুপ্তশিক্ষ-ধবল বদন-মণ্ডল। তাঁদের হুল হুতাবলপনে আকাশের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল, তার সদ্যোজাত লাভণ্য গেল এক ধমকে মলিন হয়ে। হায় হায় ক'রে উঠল পৃথিবীর জননী-হৃদয়টা।

এ দেশের এই খেয়ালী ওয়েদার দু'দিনেই মানুষকে মরীয়া ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। বার বার আশাভঙ্গের মতো পরীক্ষা আর নেই, প্রতিদিন সেই একই পরীক্ষা। সকালের আশা দু'পুরে ভাঙে, রাত্রের আশা সকালে ভাঙে। নিত্য অনিশ্চয়ের মধ্যে বাস করতে করতে জীবনের ফিলঞ্জ-সীটাই যায় বদলে। মনে হয়, দূর হোক ছাই, বাইরের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করব না, কালেভদ্রে যখন যেটুকু পাই তখন সেইটুকু ঢের, যেন সেইটুকুকেই হাতে হাতে ভোগ ক'রে নিতে প্রস্তুত থাকি, অন্যমনস্ক ভাবে লগ্ন না বইয়ে দিই, কিংবা চপল লগ্নকে র'য়ে স'য়ে ভোগ করতে গিয়ে মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত না হই।

বাইরের কাছ থেকে আনুকূল্য না পেয়ে ইংলণ্ড একদিকে হয়েছে ভোগগ্রাহী, অন্যদিকে হয়েছে ভোগসংগ্রাহী। সে বাইরে থেকে যা পায় তার তলানি অবধি শুবে নেয়, যা পায় না তাকে প্রাণপণে অর্জন করে। বার বার আশাভঙ্গজনিত অনিশ্চয় তাকে অভিভূত করতে পারলে সে কবে মরত, কিন্তু অভিভূত করা দূরে থাক তার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে তার যে পরিচয় সে যেন 'খড়গ খড়গে ভীম পরিচয়।' প্রতিপক্ষকে হার মানাবে ব'লে সে প্রতিপক্ষের নাড়ী-নক্ষত্র জোনে নিয়েছে—সেই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। জগৎটাকে মায়া বলবার মতো সাহস যে তার হয়নি তার কারণ মরীচিকা দেখতে পাবার মতো চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোক এ দেশে দুর্লভ। যা পায় তাকে অগিত্য ব'লে ত্যাগ করবার মতো বাবুয়ানাও তার সাজে না, কেননা সে যা পায় তা অপ্রসঙ্গ প্রকৃতির বাম হস্তের মুষ্টিভিক্ষা, আর আমরা যা পাই তা অম্পূর্ণ প্রকৃতির অঞ্জলিভরা দান। ভিক্ষা ক'রে এ দেশে একমুঠো ভিক্ষার সঙ্গে এত মুঠো অপমান মালে যে, নিতান্ত দায়ে ঠেকলে ভিক্ষার চেয়ে উদ্ধমনই

হয় শ্রেয়। অথচ ভিক্ষা করাটা আমাদের উপন্যাসের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন, আমাদের শিব দয়ং ভিখারী। অবশেষে এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে সন্ন্যাসী যত আছে গৃহস্থ তত নেই, মুখের চেয়ে হাতের সংখ্যা কম, পুঙ্খকাের অভাবে সমস্ত দেশজোড়া ক্রৈব্য। সেইজন্যে ভোগের নামটা পর্যন্ত আমাদের কানে অশ্রীল।

ইংলণ্ডের মানুষের একমাত্র ভাবনা যে, জীবনটাকে এন্জয় করতে পারছে কি না; এন্জয় করা ছাড়া তার কাছে জীবনের অন্য কোনো মানে নেই। ভোগের জন্যে সে প্রাণপণে ভুগেছে, বার বার আশাভঙ্গ সন্তোষ প্রাণ ভ'রে আশা রেখেছে, যে লক্ষ্মীকে সে অর্জন করল তাকে যদি সে ভোগ করতে না পারল তবে তার জীবনটাই ব্যর্থ হলো। তার স্ত্রীকে তো সে পিতার হাত থেকে পায়নি যে অতি সহজে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীমানা করবে! সে স্বয়ম্বর-সভার বীর, প্রকৃতি তার ভোগ্যা। প্রকৃতিকে এড়াবার তপস্যা তার নয়, মুক্তি নয় ভুক্তিই তার লক্ষ্য, এর জন্যে যে ক্ষমতা চাই সেই ক্ষমতার তপস্যাই ইংলণ্ডের তপস্যা।

ঈস্টারের ছুটিতে লণ্ডনের বাইরে গিয়ে ভোগের চেহারা দেখলুম। তপস্যার জন্যে কাজের জন্যে লণ্ডন। ভোগের জন্যে ছুটির জন্যে সমস্ত ইংলণ্ড। যেখানে যাই সেখানে দেখি অসংখ্য হোটেল, বোর্ডিং হাউস, সরাই, রেস্টুরাঁ, পেরীং গেন্ড্‌ রাখতে ইচ্ছুক গৃহস্থ বাড়ি। সর্বত্র মোটরগণ্য মজবুত তকতকে রাস্তা। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলিতে মান সাঁতার নৌ-চালনার আয়োজন। কোথাও মাছধরা কোথাও শিকার করা। সর্বত্র টেনিসকোর্ট সর্বত্র গল্ফকোর্স। এমন স্থান অতি অল্পই আছে যেখানে সিনেমা নেই রেডিও নেই টেলিগ্রাফ টেলিফোন ডাকঘর নেই সারকুলেটিং লাইব্রেরী নেই। যার যতদূর সাধ্য সে ততদূর খরচ ক'রে ছুটি কাটাতে যায়, অভ্যস্ত অন্নবিস্তদের পক্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার ব্যতিক্রম, এদের তেমনি হলি-ডে হ্যাণ্ডি। কাজের সময় যেমন কাজকে এক মিনিট ফাঁকি দেয় না, ছুটির সময় তেমনি ছুটিকে এক সেকেন্ড ফাঁকি দেয় না। ছুটি পেলেই এক একখানে সুটকেস হাতে ক'রে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা কর্মস্থল ছেড়ে ক্রীড়াস্থলে রওনা হয়। তারপর একস্থানে যতদিন খুশি হোটেল বাস, char-a-banc পূর্বক স্থান-পরিক্রম, খেলাধূলায় ধূম, পানাহারের আড্ডা, নাচ-গানের মজলিস। গত যুগের পূজা পার্বণ আর নেই, দেড় শতাব্দীর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইংলণ্ডের চেহারা বদলে দিয়েছে। কর্মের সঙ্গে ধর্মের এবং ছুটির সঙ্গে পার্বণের যে সৌন্দর্য সম্বন্ধ ছিল এখন সে সম্বন্ধ অনেক দূর সম্বন্ধ, মাঝখানে অনেক পুঙ্খ গত হয়েছে।

আমি যে অঞ্চলে গিয়েছিলুম তার নাম আইল্‌ অব ওয়াইট্‌। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৬০ মাইল, কিন্তু তারি মধ্যে গুটি আট দশ ছোট ছোট শহর ও বিশ পঁচিশটি ছোট ছোট গ্রাম। এই শহর ও গ্রামগুলির অধিকাংশই টুরিস্টজীবী। গ্রীষ্মকালে যে সব টুরিস্ট আসে তাদের খাইয়ে খেলিয়ে ঘুরিয়ে কিরিয়ে তাদের দৌলতে বৎসরের বাকি সময়টা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তখন হোটেলগুলো খা খা করতে থাকে, দোকান পাট কোনো মতে বেঁচেবর্তে রয়, খেলার মাঠে আগাছা গজায়। স্থানীয় লোকগুলি সাধারণত চাষা মুদি রুটিনির্মাণ্ডা মাঝি জেলে মজুর। তবু এরাই নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে এই সব শহর গ্রাম শাসন করে। খুব ছোট ছোট গ্রামগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

শহর যেমন সব দেশেই প্রায় একই রকম গ্রামও দেখলুম সব দেশেই প্রায় এক রকম। মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে ইট পাথরের দেয়ালের ওপরে খড়ের চাল্লা বা টালির ছাদ, দেয়ালের গায়ে লতা উঠেছে, ছাদের উপরে ঘাস গজিয়েছে—এরি নাম কটেজ। তবে নতনের সঙ্গে সন্ধি না ক'রে পুরাতনের গতি নেই। সংকীর্ণ গবাক্ষ, কিন্তু কাঁচের সার্শী। সেকলে গড়ন, কিন্তু একেলে সরঞ্জাম।

মুদির দোকানের ভিতরে ডাকঘর বসেছে, তানাক-চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেল স্টেশনের ভিতরে স্ট্রীক স্টেশন মাস্টারের আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে, পাব্লিক লাইব্রেরী আছে। স্কুলের চেয়েও এ দুটো জিনিস উপকারী। স্কুলের সংখ্যা ক'মে এ দুটোর সংখ্যা বাড়লে ছেলেওলি বাঁচে। শিক্ষার নামে শিশুমনের ওপর যে-বলাৎকার সব দেশেই চ'লে এসেছে এ যুগের শিশু সে-বলাৎকার সহ্য করবে না। শিশুও চায় স্বরাজ। তার নিজস্ব শিক্ষা সে নিজেই খুঁজে নেবে।

শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিপাটি। ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও পথঘাট অনবদ্য এবং বাড়িঘর সুন্দর্য। অতি দরিদ্র ঝাড়ুদার (চিম্নী-সুইপ) যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির বাইরে বেল আছে, তার কাঁচের জানলার ওপাশে ধবধবে পর্দা, যথাহানে সন্নিবেশিত অল্পবিস্তর আসবাব, সমস্ত গৃহটির বাইরে ভিতরে এমন একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের আভাস যে তেমনটি আমাদের ধনীদেব গৃহেও বিরল। ধন নয়, মনই রয়েছে এর পিছনে, সে মন ভোগ-তৎপর মন। সেইটি যদি থাকে তো উপকরণের অভাব হয় না, যা জোটে তাকেই কাজে লাগানো যায়, যা জোটে না তাকে অর্জন ক'রে নেওয়া যায়। এ সংকেত আমরা জানিনে, কেননা পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোকের বাসাকে আমরা এক রাত্রির পাহুশালা ভেবে এসেছি, তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব মানিনি; যে-দেহে বাস করি সে-দেহকে যেমন অনিত্য ভেবে অন্যত্ব দেখাই, যে-গৃহে বাস করি সে-গৃহকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। এদিকে কিন্তু ইহলোককে এরা ম'রেও ছাড়তে চায় না, কফিনের ভিতরে শুয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের বিশ্বাস জগতের শেষ দিন অবধি এদের এই মাটির শরীরখানা থাকবে।

তা ছাড়া আমার মনে হয় এ দেশের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের মূলে রয়েছে এ দেশের নারী-শক্তির সক্রিয়তা। আমাদের ইহবিমুখ ধর্ম হচ্ছে নারীবিমুখ ধর্ম, আমাদের একান্তবর্তী পরিবারে নারীর অন্তরের সায় নেই, আমাদের গৃহ নারীর সৃষ্টি নয় এবং গৃহের বাইরেও নারী আমাদের সৃষ্টি করতে পায় না। ইংলণ্ডের নারী তার স্বামীগৃহের রানী, শাওড়ী-জা'দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে, সেইজন্যে ইংলণ্ডের গৃহিণীর হাত এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায় না, ঘরটির ঝাড়া মোছা ঘষা মাজাতে সর্বক্ষণ ব্যাপ্ত। সন্তান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি দায়িত্ব এবং ততখানি স্বাধীনতা। জা-শাওড়ীর সাহায্য নেই হস্তক্ষেপ নেই। ইংলণ্ডের ছেলেরা 'হোম' নামক যে-জিনিসটি পায় সেটির একদিকে মা অন্যদিকে বাবা, মাঝখানে ছোটবড় ভাইবোনওলি। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এক টেবিলে সকল ক'টিতে মিলে খায়, রাত্রে এক অগ্নিহলে সকল ক'টিতে মিলে গল্প বা গান বাজনা করে, অল্পে সম্পূর্ণ ছোট এককুখানি নীড়। এর মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজ, এর মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিত্য কলহ নেই, এটা একটা বিরাট যজ্ঞশালার মতো কোলাহলমুখর নয়।

সে যাই হোক, ইংলণ্ডের গৃহিণীদের কাছ থেকে আমাদের গৃহিণীদের অন্ততঃ একটি বিষয় ভক্তিতে শিক্ষা করবার আছে। সেটি, গৃহের শৃঙ্খলাবিধান ও পারিপাট্যসাধন। নিজের আশপাশকে নিয়েই নারীর সৃষ্টি। নারীর আভ্যমণ্ডল হচ্ছে নারীর পরিচ্ছদ, নারীর গৃহ। কিন্তু আমাদের রন্ধনপর্ব এত অধিক সময় নেয় যে, তার পরে অন্য কিছু করবার না থাকে অবসর, না থাকে বল। অথচ গ্যাসের উন্নতির সাহায্যে এ দেশে দরিদ্রতম গৃহিণীরাও আধ ঘণ্টায় এক বেলার রান্না চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তার পরে হায়ার পারচেজ প্রথার প্রবর্তন হ'য়ে অবধি গরীবের ঘরেও আসবাবের নিঃস্বতা নেই, অনেকের একটি পিআনো পর্যন্ত আছে। কোন বিষয়ে খরচ কমিয়ে কোন বিষয়ে খরচ বাড়াতে

হয় সেটা একটা আর্ট। খরচ কমানো মানে কেবল টাকার খরচ না, সময়েরও খরচ। আমাদের দেশে যা দাসীর কাজ এ দেশের গৃহিণীরাও তা যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত ক’রে স্বহস্তে সারেন। তার ফলে যে টাকা ও সময় বাঁচে সে টাকায় ও সময়ে বিদ্যাবতী কলাবতী রাষ্ট্রবতী হওয়া যায়। গ্রামে দেখলুম প্রায় প্রত্যেকেরই বাগান আছে, সে বাগানে বাড়ির মেয়েরাই কাজ করে, ছেলেরা বাইরের কাজে বাস্তু। লওনেও অনেক বাড়িতে ছোট একটুখানি বাগান আছে, বাগানকে ইংরেজেরা বড় ভালোবাসে। বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে বাগানের কাজ করা এদের অনেকেরই একটা হবি। গ্রামে দেখলুম অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসেছেন, গল্প গুজবে গা ঢেলে দিয়েও হাতের কাজটিতে টিলে দিচ্ছেন না। হাজারো বিলাসিতা করুক এ দেশের মেয়েরা উপার্জন করতে পটু, তথা উপার্জন বাঁচাতে পটু। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কারুশিল্পের ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির। জনপিছু ছ’ পেনী খরচ ক’রে কতখানি সাপার (নেশ ভোজন) রাঁধা যেতে পারে কিংবা অল্প খরচে কি কি পোষাক স্বহস্তে তৈরি করা যেতে পারে প্রতিযোগিতার এইরূপ বিষয় নির্দেশ ক’রে দেন গ্রামের কর্তৃপক্ষ। অনেক বাড়িতে যে বাগান আছে সেই বাগানে পর্যটকদের চা’ খাইয়ে অনেকে সংসারের আয় বাড়ায়। এই সব ‘চী-গার্ডন’ ছাড়া অনেকের বাড়িতে বা ফার্ম হাউসে দু’ তিনটে ঘর খালি থাকে, সেখানে পেয়িং গেস্ট রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের মুরগী ওয়ারের গোরু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পোষ্য আছে। অর্থগণের ও অর্থসঞ্চয়ের যতো উপায় আছে কোনোটাই কেউ পারৎপক্ষে বাদ দেয় না।

গ্রামে দেখলুম সাইক্লের চল কিছু বেশি। এবং ওটা সাধারণতঃ মেয়েদেরই যান। মেয়েরা ঐ চ’ড়ে বাজার করতে যায়। ছেলেরা চড়ে মোটর সাইক্ল। তবে মেয়েরা যেমন উঠে প’ড়ে লেগেছে আর কিছুকাল পরে ওটাও হবে প্রধানত মেয়েলি যান। এরোপ্লেনে ক’রে এ্যাটলান্টিক অতিক্রম করতে গিয়ে মরাটাই হচ্ছে এখন তাদের আধুনিকতম ফ্যাশান। হিস্ট্রিরিয়ায় মরার চেয়ে এটা তবু স্বাস্থ্যকর ফ্যাশান। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে cult of joy-এর চর্চা বেড়েছে। যুবকরা জেনেছে, যে-কোনো দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে, এই নিষ্ঠুর যুগে প্রাণের মূল্য নেই, প্রাণ সম্বন্ধে সীরিয়াস কেউ নয়। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ হাস। যুবতীরা জেনেছে পুরুষ-সংখ্যার স্বল্পতাবশতঃ বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নেই, আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ মাতৃদুঃ আরো অনেকের ভাগ্যে নেই। সুতরাং যতটুকু পাই হেসে লবো তাই। ঘোরতর মোহভঙ্গের ভিতরে এ যুগের তরুণ তরুণীরা বাস করছে। ছেলেদের চোখে ডেমক্রেসীর কালো দিকটা ধরা প’ড়ে গেছে, উনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ থেলো হ’য়ে গেছে, জীবন নামক চিত্রিত পর্দাখানা তারা তুলে দেখলে এর পেছনে লক্ষ্য ব’লে কিছু নেই। শুধু বাঁচবার আনন্দে বাঁচতে হবে, হাসবার আনন্দে হাসতে হবে। এ যুগের তরুণ যত হাসে তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে, ভোট এবং আর্থিক অনধীনতাই সব কথা নয়, ওসব পেয়েও যা বাকি থাকে তার ওপরে জোর খাটে না, সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মতো দুঃখিনী আর নেই। তবু তারা পণ করেছে কিছুতেই কাঁদবে না, কিছুতেই হটবে না। জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা চলে না, এইটে এ যুগের ইউরোপের মূল সুর। বেটুকু আমাদের নিজেদের আয়ত্তগম্য সেইটুকুর ওপরে এ যুগের ইউরোপের ঠোক পড়েছে। সেইজন্যে এত দেহের দিকে নজর, আয়ুর দিকে নজর, যৌবনের দিকে নজর। ক্রমশই ইউরোপের লোকের স্বাস্থ্য বেড়ে চলেছে, আয়ু বেড়ে চলেছে, যৌবন বেড়ে চলেছে। সেই গর্বে এ যুগের অগ্রসরপন্থীরা খ্রীস্টীয় চরিত্রনীতি মানতে চায় না, ইউরোপে এখন পেগানিজমের যুগ ফিরে এসেছে, দেহের উৎকর্ষের জন্যে এখন চরিত্রের সাতখুন মাপ।

এ যুগের মানুষ নির্জনতাকে বাঘের মতো ডরায়। গ্রামের আদিম নির্জনতার ভয়েই সে শহর

গরণ করেছে, শহরে অরুচি হলে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে সে গ্রামে যায়, সেই সঙ্গে শহরে গ্রামোদ প্রনোদ আরাম বিলাসগুলোকেও পুঁটলি বেঁধে গ্রামে নিয়ে যায়। প্রতি গ্রামের যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল নাগরিক সভ্যতার স্তীম্ রোলার তাকে খেঁবেল গুঁড়িয়ে সমতল ক'রে দিচ্ছে। সেই সমতলের ওপর দিয়ে নাগরিকের দল char-a-banc চ'ড়ে দু'ঘণ্টায় ষাট মাইল চক্কর দিয়ে ফান, তারি নাম দেশ-ভ্রমণ। এবং ছেঁটে কেটে সমান ক'রে আনা দৃশ্যগুলোকে মুহূর্তমাত্র চোখে ঝুঁয়ে পরমুহূর্তে বিশ্বভির ওয়েস্ট পেপার বাসকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তারি নাম দেশ-দর্শন। তারপর সন্ধ্যা জুড়ে বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকূপ রচনা ক'রে সেই গর্ভের মধ্যে সিনেমা দেখা এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ধ'রে আহার নিদ্রা বিশ্রান্তালাপ। কাজের দিনে ভূতের মতো খাটুনি, ছুটির দিনে অরসিকের মতো সময়ক্ষেপ।

শহরে এ জিনিস চোখে লাগে না। কিন্তু গ্রামে যখন এই জিনিস দেখি তখন কেমন খাপছাড়া ঠেকে, চারিদিকের সঙ্গে এর মেলে না। প্রকৃতি সেই আদিকালের মতো শান্ত সুস্থির আত্মস্থভাবে কাজের সঙ্গে ছুটির মিতালি ক'রে গরজের সঙ্গে আনন্দের তাল রেখে একঠাই দাঁড়িয়ে একটি পায়ে তুপুর বাজাচ্ছে। আর মানুষ কি না কাজকে দাসখং লিখে দিয়ে তার অনুগ্রহদণ্ড অবকাশটুকু নাটকের মতো ঘুরে অপচয় করছে। সমুদ্রের কলরোলের দিকে কান দেবার অবসর নেই, তৃণের সীমাহীন গ্যানলতার আহানে চোখ সাড়া দেয় না। মাথার ওপরে উড়ছে এরোপ্লেন, সমুদ্রের ওপরে ভাসছে নাইনার জাহাজ, রাতা তোলপাড় করছে বাস মোটর, মাঠ তোলপাড় করছেন গলফ্‌ক্লীড়ারত টেনিসক্লীড়ারত মানব-মানবীর দল। গতিশীল সভ্যতা যে জীবনের আনন্দ বাড়িয়েছে এমন তো মনে হয় না, বাড়িয়েছে কেবল জীবনের উত্তেজনা। জীবনকে সচেতন ভাবে ভোগ করা নয়, কোনোমতে হেসে খেলে ভুলে কাটিয়ে দেওয়া। নির্জনতার মধ্যে নিজের সঙ্গে একলা থাকার মতো গাতি আর নেই। কাজে হোক অকাজে হোক কিছু একটাতে ব্যাপৃত না থাকতে পারলে মনে হয় ময়টা মাটি হলো, এই সময়টা অন্যেরা কাজে লাগাচ্ছে, ফুটি লুটছে। কাজের দিনে এক মুহূর্ত গ্যানহ হবার জন্যে হির হবার জো নেই পাছে প্রতিযোগীরা দল মার্টিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়, পেছিয়ে প'ড়ে প্রাণে মরি। ছুটে চলার এই বেগ ছুটির দিনেও সংবরণ করতে পারিনে, নানা ব্যসনে নিজেকে গুস্ত রেখে মনে করি খুব এনজয় করছি বটে, এই তো সক্রিয় আনন্দ, এই তো জ্যাস্ত মানবের মতো। আসলে কিন্তু এইটেই হচ্ছে চূড়ান্ত নিক্রিয়তা। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলার চেয়ে দাঁড়িয়ে থকে ঢেউ ভাঙা বড় কঠিন আনন্দ। আত্মস্থ না হয়ে ভোগ নেই।

তবে এই একটা মস্ত কথা যে, একালের ব্যাসন সেকালের মতো বলক্ষয়ী নয়। একালের মানুষ হাতো দৃশ্য-গন্ধ-সংগীতের রসগ্রাহী নয়, কলার নামে কৃত্রিমতাকেই সে মহামূল্য মনে করে, গন্তবতার অয়েষণে সে কল্পনাবৃত্তি খুঁয়েছে, প্রগাঢ় প্যাসনের পরিবর্তে উগ্র সেনসেশনই তার ননুভূতি জুড়েছে। তবু এসব সত্ত্বেও সে স্বাস্থ্যবান প্রাণবান বলবান। বিষপান করেও সে নীলকণ্ঠ। ফুর হাস্যরস তার স্বাস্থ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, অজব খেলাধূলা তার বল বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিজ্ঞান তাকে মাঞ্চাস দিয়ে বলছে—‘অহং ভ্গাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।’

আহিল্ অব ওয়াইট্ বড় সুন্দর স্থান। নীলরঙের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মতো দ্বন্দ্র। তবে এ দেশের সবুজ যেন আমাদের সবুজের মতো কান্ত নয়, ব্রিঞ্চ নয়, কেমন যেন তীব্র বার ঝাঁঝালো। ভূপ্তি দেয় না, উদ্‌যাদনা দেয়; ছাড়তে চায় না, টেনে রাখে; আবেশের চেয়ে জ্বালা বশি। দ্বীপটির কোনো কোনো স্থল এত নিরালো যে নেশার মতো লাগে। দিন যেদিন উজ্জ্বল থাকে চাখ সেদিন তন্ডালনে নুয়ে পড়তে চায়। বাতাসে পাল ভুলে দিয়ে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। গম্ভীর

ভাবে ওপারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরদেশগামী জাহাজ। মাথার ওপরে চিলের মতো উড়ছে এরোপ্লেন—এত ওপরে যে, তার বিকট কণ্ঠরব কানে পৌছয় না। কানে বাজছে শুধু জলকণ্ঠের ছলাং ছল ছলাং ছল ছলাং ছল। ভটকে যেন আদি কাল থেকে সেধে আসছে, তবু তার মাং ভাঙতে পারছে না। মাটি তার সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ ঘূমের থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়, চেতনার থেকে প্রতীতি কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে যেন স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম। সত্য কেবল ঐ আপনভোলা শিশুগুলি, ঐ যারা বালি দিয়ে ঘ: তৈরি করছে, বাঁধ তৈরি করছে, ঘরের মধ্যে ভালোবাসার পুতুলকে রাখছে। সন্দের এক ডেউ এতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তাই দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠছে, আবার সেই ঘর ইত্যাদি

গ্রামের লোকগুলিকে ভালো লাগল। বিদেশী দেখলেই সম্মান করে, কুশল প্রণ করে, সাহায্য করতে ছুটে আসে। শহরে ইংরেজদের দেখে ইংরেজ জাতিকে যতটা নিঃশব্দপ্রকৃতি ভেবেছিল: গ্রামা ইংরেজদের দেখে ততটা মনে হলো না। সৌজন্যের চেয়ে বড় জিনিস সৌহার্দ্য। গ্রামে লোকের কাছে অল্পতেই ও জিনিস পাওয়া যায়। শহরের লোকের সঙ্গে বিনা ইন্ট্রোডাকশনে ভা: করবার উপায় নেই, যেটুকু আলাপ হয় সেটুকু ঘড়ির উপরে চোখ রেখে। কিন্তু গ্রামের লোকে: হাতে কাল অভ্যস্ত। সময়কে তারা কাঁকি দিতে ডরায় না, সময়ের মূল্য নামক কুসংস্কারটা তাদের তেমন জানা নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মনে অভ্যস্ততা যেমন সব দেশে, তেমনি এ দেশেও। নিজের গ্রামের যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময়, সুখদুঃখে আলোচনা। মুখ ঝুঁজে না দেখার ভান ক'রে পালাবার পথ খোঁজা নেই, কিংবা ওয়েদার সম্বন্ধে দুটো তুচ্ছ প্রশ্নোত্তর ক'রে ঘণ্টা ধরে চুপ ক'রে এক গাড়িতে ভ্রমণ করা নেই।

তবে গ্রাম্য সভ্যতার এখন দিন ঘনিয়ে এসেছে সব দেশে। ইংলণ্ডে এখন পল্লীতে যত লো: থাকে তার তিনগুণ থাকে নগরে। ফ্রান্সে জার্মানীতেও ক্রমশ গ্রামকে শোষণ ক'রে নগর নো: হচ্ছে। Back to the village যে ভারতবর্ষে সম্ভব হবে এমন তো মনে হয় না। বড় জোর গ্রা: থাকবে দেহে, তার আত্মা যাবে বদলে। গ্রাম্য সভ্যতার শব্দখানাতে ভর করবে নাগরিক সভ্যতা তাল বেতাল। গ্রামগুলি হবে নগরেরই ক্ষুদ্রে সংস্করণ। তাছাড়া গ্রামে নগরে ভেদরেখা কোন্খা: টানব? লোকসংখ্যা বাড়লেই গ্রামের নাম হচ্ছে নগর। নগরে ও গ্রামে যে প্রভেদ সেটা আকৃতিগ: নয়, আকারগত প্রভেদ। নগরেরই মতো গ্রামও হোটেলের ভ'রে যাচ্ছে, ভাড়াঘরে ভ'রে যাচ্ছে। এ: মানে এই যে, এ যুগের মানুষ কোথাও স্থায়ী হতে চায় না। বেদেরা তাঁবু ঘাড়ে ক'রে বেড়া: আমরা ভা: করিনে। অন্যলোক আমাদের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে রাখে, সারাজীবন আমরা কেবল এ: তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে পাড়ি দিতে থাকি। এক কালে আমরা যাবাবর ছিলুম। তারপর কো: একদিন ধানের ক্ষেতের ডাকে ঘর গড়লুম, স্থিতিশীল হলুম। এখন আমরা বাণিজ্যের পণ্য নি: ফেরিওয়ালার মতো পথে বেরিয়ে পড়েছি, আমরা গতিশীল। পথও মনোহর। এতে শীত-আতপে কষ্ট আছে ধূলা-বালির ঝড় আছে, কোথাও কর্মদ কোথাও কলর, তবু এও ভালো।

লগনের বাইরে গিয়ে দেখলুম লগনের জনতার ভিড়কে অনামনস্বভাবে ভালোবো: ফেলেছি। কাউকে চিনি, তবু সকলের প্রতি অজ্ঞাত টান। যেখানে যাই সেখানে দেখি লগনে লোক পরস্পরকে ঠিক চিনে নিচ্ছে, লগনে থাকলে যার সঙ্গে কোনোদিন নমস্কার বিনিময়টা পয় হয়ে উঠত না, তার সঙ্গে অল্পতেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাচ্ছে। শহরের আড়ষ্টতা বাইরে থাকে না, আ: কায়দা চুলোয় যায়, শহর ছেড়ে যারা গেছে তাদের সেই অল্প ক'জনের মধ্যে কতকটা পারিবারি: সম্বন্ধের মতো দাঁড়ায়। তবে এটা দীর্ঘকালের নয় ব'লেই এত মধুর। সকলেই মনে মনে জানে ( ছাড়াছাড়ি যে-কোনো মুহূর্তে হ'তে পারে। বিচ্ছেদটা অনিশ্চিত নয়, মিলনটাই অনিশ্চিত। অবু:বে

মতো ভাবতে ইচ্ছা করে, ব'লেও বসা যায় যে, আবার দেখা হবে। পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু আধার রাতের অপার সমুদ্রের জাহাজ দু'টির সেই যে সংকেত-বিনিময়, সেই আরম্ভ সেই শেষ। তারপর মাথা খুঁড়লেও আর দেখা হবে না। যদি হয়ও তবে সে দেখা বন্দরের সহস্র জাহাজের ভিড়ে। তখন জনতার টানে টানছে, জনের টান গায়ে লাগে না। তখন সে দেখায় চমক থাকে না, মামুলি মনে হয়।

এটা পুনর্যাবরণের যুগ, আমরা সকলকেই চাই, কাউকেই চাইনে, আমাদের আলাপী বন্ধু শত শত, কিন্তু দরদী বন্ধু একটিও নেই, আমরা বিশ্বওদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের নাড়ীর খবর জানি, কিন্তু আমাদের পাড়াপড়শীদের নাম পর্যন্ত জানিনে। পাড়াপড়শী দূরে থাক আমাদের ম্যাগেটের নিচের তলায় যারা থাকে চোখেও তাদের দেখিনি। রেল স্টীমার এরোপ্লেনের কল্যাণে জগৎটা তো ছোট হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের মানুষকে যে মনে হচ্ছে লক্ষ যোজন দূর। তবু এও সুন্দর। আমরা পথিক, আগদের স্নেহ প্রীতি বন্ধুতার বোকা হালকা হওয়াই তো দরকার, নইলে পদে পদে বাঁধা পড়তে পড়তে চলাই যে হবে না। একটি প্রেমে আমরা সকল প্রেমের স্বাদ পেয়েছি—সেটি চলার পথের প্রেম। এর মধ্যে আর যাই থাক আসক্তি নেই। আমরা নিষ্কাম ভোগী, আমরা ভোগ করি লোভ করিনে। কেননা লোভ করলে পথে থামতে হয়, আর পথে থামাই হচ্ছে পথিকের মৃত্যু।

## ॥ আট ॥

এই ক'টি দিন সুধায় গেল ভ'রে। কয়েকদিন থেকে আলোর আর অবধি নেই, ভোর চারটের থেকে রাত (?) ন'টা অবধি আলো। যেদিন সূর্য থাকে সেদিন তো স্বর্গসুখ, যেদিন মেঘলা সেদিনও সুখ বড় কম নয়, কেবল আলো—সেও অনেকখানি। আর উত্তাপ কোনো দিন আমাদের কাছান নাসের মতো, কোনো দিন আমাদের চৈত্র মাসের মতো। আমার পক্ষে তো বেশ আরামের, কিন্তু এ দেশের লোকগুলি ছটফট করতে শুরু করেছে। এদের মতে এটা অকাল গ্রীষ্ম। শীত, বর্ষা, কুয়াশা এদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, ও নিয়ে এরা প্রতিদিন খুঁৎ খুঁৎ করে বটে, কিন্তু ওছাড়া আর কিছু ভালোও বানে না।

অবশ্য সাধারণের কথাই বলছি, কেন না অসাধারণেরা তো এখন কোনো দেশের বাসিন্দা নন, তাঁরা সব-দেশের বাসান্ধে। তাঁরা শীতকালটা রিভিয়েরায় কাটান, বসন্তটা সুইট্‌জারলণ্ডে, গ্রীষ্মকালটা বরফের সন্ধানে কাটান, শরৎকালটা পৃথিবী পরিক্রমায়। তা' ব'লে সাধারণরাও যে একই স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে এমন নয়। তারাও এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে বাসা বদলাতে লেগেছে। অসাধারণদের সঙ্গে তাদের তফাৎটা কেবল এই যে, তাদের টান ছুটির টান নয় কাজের টান। তবু কাজের টানে বারোমাস বেউ কর্মস্থলে কাটায় না, এক আধ মাসের জন্যে হ'লেও দশ বিশ ফ্রোশ দূরে গিয়ে মুখ বদলিয়ে আসে। আর ছুটির টানে বারো মাস যারা বিশ্বময় ঘুরপাক খাচ্ছেন তাঁরাও বড় সাবধানী পথিক, তাঁরা এজেন্সী নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে কাগজে লিখে পাথের ছোটান।

পাথের যে যেমন ক'রেই ছোটাক সকলেই একালে পথিক, কেউ একালে গৃহস্থ হ'তে চায়

না। এই লণ্ডন শহরে কত ফরাসী ফ্যাশানজ, জার্মান সংগীতজ্ঞ, ইতালীয়ান নৃত্যনিপুণ, রশিয়ান পলাতক, দিনেমার চাষীদের এজেন্ট, চাট্‌গেয়ে জাহাজের খানাসী, চাইনিজ কোকেন চালানদার ইত্যাদি নানা দিগদেশাগত মানুষ এক আধ বৎসরের জন্যে বাসা বেঁধেছে। এ শহরে না পোষালে নিউইয়র্কে কিংবা ব্রুনস্‌ এয়ার্‌সে ভাগ্যব্লেষণ করবে। এদের সামনে সারা পৃথিবী ঝুড়ে রয়েছে, যেখানে যতদিন থাকতে পারে ততদিন থাকবে। তারপরে স্ট্রুটসে হাতে নিয়ে পথে বেঁধিয়ে পড়বে।

রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যে পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে কাটিয়ে এসেছে—কেউ জাহাজে কাড় নিয়ে হনলুলু যুরে এসেছে, কেউ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ল'ড়ে এসেছে। রোজ এমন লোকও দেখি যে কিছু পয়সা জমাতে পারলে এখানকার ব্যবসা ভুলে দিয়ে আরজেন্টাইনায় ব্যবসা ফাঁদবে, কিংবা নিউজিল্যান্ডে চাকরীর যোগাড় করবে। এদের কাছে পৃথিবীটা এত ছোট বোধ হচ্ছে যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী। এদের অপরাধ কী, আমরাি তো এখন মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষ ছোট একটা দেশ, বদে কলকাতা ছোট এক-একটা শহর। নিউইয়র্কের লোক জাহাজে চড়ে ছ'সাতদিনে পারী পৌঁছয়, সেখানে বাড়ির লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে। আর কিছুকাল পরে যখন পারীর সঙ্গে নিউইয়র্কে এরোপ্লেন চলাচল সহজ হবে, তখন নিউইয়র্কে ডিনার খেয়ে পারীতে ব্রেকফাস্ট খেতে পারা যাবে, যেমন কলকাতায় ডিনার খেয়ে কাশীতে ব্রেকফাস্ট।

এর ফলে দেশে আর মানুষের মন টিকছে না, বিদেশের স্বপ্ন মন বিভোর। শনিবার হ'লেই চলো লণ্ডন ছেড়ে পারী, সেখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো লণ্ডনে। পরের শনিবারে চলো বেলজিয়াম, কিংবা হল্যান্ড। সাতদিনের ছুটি পেলে চলো জার্মানী কিংবা সুইটজারলণ্ড। তিন সপ্তাহের ছুটি পেলে চলো নিউইয়র্ক কিংবা ওয়েস্টইন্ডিজ। দেড় মাসের ছুটি পেলে চলো সাউথ আফ্রিকা কিংবা ইণ্ডিয়া। ছ'মাসের ছুটি পেলে চলো ওয়ার্ল্ড টুরে। এগুলো অবশ্য জাহাজী যুগের মানুষের স্বপ্ন। এরোপ্লেনী যুগের মানুষ—অর্থাৎ এরোপ্লেন যখন জাহাজের মতো সস্তা ও নিরাপদ ও সর্বত্রগামী হবে, তখনকার মানুষ আপিসের ঘড়িতে ছটা বাজলেই ছুটবে পারীর এরোপ্লেন ধরতে। এখন এরোপ্লেনে পারী পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগছে, তখন লাগবে দেড় ঘণ্টা। সূত্রাং ডিনারের সময় পারীতে হাজির হতে পারবে। শনিবার হলে সে ভাববে যাওয়া যাক দ্রিগস্টে, রবিবারটা পিরামিড দেখে সোমবার সকালে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট খেয়ে লণ্ডনের আপিসে আসা যাবে গাধা-খাটুনি (ড্রাজারী) খাটতে। খাটুনির ফাঁকে রেডিওতে শোনা যাবে ব্রুনস্‌ এয়ার্‌সের ট্যাম্পো নাচের বাজনা আর টেলিভিসনে দেখা যাবে সেই নাচের দৃশ্য। ঐ উত্তেজনায় আরো কিছুক্ষণ গাধা-খাটুনি সুস্থ হবে। তারপরে ছুটি, পারী-গমন, রাব্রিভোজন, থিয়েটার-দর্শন, নিদ্রা।

আমাদের নাতিনাতনীরা ভাববে, এই তো জীবন! আমরাই তো সেট পারদেট বাঁচছি! আমাদের পূর্বপুরুষগুলো কি বাঁচতে জানত? ছিল ওদের আমলে এমন সব পাড়া-ময় শহর-ময় হোটেল? পেত ওরা এমন সব কলে ভৈরি বিখ্যাত হাইজিনিক খাবার? পারত ওরা নিউইয়র্কের ব্যাণ্ড ওনতে ওনতে কলকাতায় নাচতে? সারা জগতের কোথায় কী ঘটছে তা চোখে দেখতে দেখতে বিশ্বামকাল কাটাতে? ওদের সময় নাকি স্নেহ প্রেম আতিথ্য ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল—বাজে কথা। ওদের সময় গ্রামে গ্রামে নামলা মোকদ্দমা দেশে দেশে যুদ্ধ লেগেই থাকত, ইতিহাসে লেখে। মেয়েরা নাকি গৃহকাণে বন্দী হয়ে স্বামীপুত্রের সেবা করত—ধিক্। মেয়েদের যেন নিজস্ব প্রতিভা নেই, তারা যেন পুরুষের মতো ভাই নিয়ে দিনরাত ব্যাপৃত থাকতে পারে না, তাদের যেন পারিক্রের প্রতি দায়িত্ব নেই, তারা থাকবে স্বার্থপরের মতো গৃহ সংসার নিয়ে!

হায়! গতি-গর্বে গর্বিত হয়ে ওরা তো বুঝবে না ওদের পূর্বপুরুষদের স্থিতিসুখ। ওরা যখন



ঘন্টায় একশো মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে থ্রিলের আতিশয্যে মূর্ছাসুখ পাবে, তখন তো ওরা বুঝবে না গোরুর গাড়িতে চ'ড়ে ঘন্টায় এক মাইল অগ্রসর হবার তন্দ্ৰাসুখ। মার্স ভেনাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার উদ্বেজনা য় ওরা ভুলে থাকবে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দাস্তা বাধাবার উদ্বেজনা। পৃথিবীটাই যখন ওদের আরাম ক'রে পা ছড়াবার পক্ষে নিতান্ত অপরিচর্য ঠেকবে তখন ওরা কী ক'রে বুঝবে আমার নগণ্য আউনিটুকুই আমার জীবির চোখে কত বৃহৎ ব'লে সে-বেচারী লজ্জায় ভয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। আমাদের সেই রাত ভোর ক'রে বেলা দশটা অবধি যাত্রা দেখা, দুপুর বেলা ঘুম দিয়ে রাত ন'টায় ওঠা, একটি গ্রামে একটা জীবন সাদ ক'রেও তৃপ্তি না মানা, ভাঙের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখা—এসব ওদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। 'সেকেন্দ্রে' ব'লে ওরা আমাদের অবজ্ঞা করবে।

তা করুক, কিন্তু একথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করব না যে, কোনো একটা যুগ কোনো আরেকটা যুগের চেয়ে সুখের, কোনো এক যুগের মানুষ কোনো আরেক যুগের মানুষের চেয়ে সুখী। পৃথিবী দিন দিন বদলে যাচ্ছে, মানুষ দিন দিন বদলে যাচ্ছে, সমাজ দিন দিন বদলে যাচ্ছে—কিন্তু উন্নতি? প্রগতি? পারফেকশন? তা' কোনো দিন ছিলও না, কোনো দিন হবারও নয়। অতীত-পূজকরা বলবেন, সত্যযুগ ছিল না তো কোন্ আদর্শের আমরা অনুসরণ করব? ভবিষ্যৎ-পূজকরা বলবেন, সত্যযুগ হবে না তো কোন্ আদর্শের অভিমুখে আমরা যাব? আমরা কিন্তু বর্তমান-প্রেমিক, আমরা বলি, এইটাই সত্যযুগ, এইটাই কলিযুগ, এটা ভালোও বটে মন্দও বটে। লাখ বছর পরে যারা আসবে তাদের যুগ এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এমনি ভালোয়-মন্দে-মেশা দুঃখে-সুখে-বিচিত্র প্রেম-হিংসায়-জটিল থাকবেই। আমরা চলার আনন্দে চলি, কারুর অনুসরণেও না, কারুর অভিমুখেও না। গতিটাই আনন্দের; শব্দকের গতি আর পক্ষিরাজের গতি বেগের দিক থেকে ভিন্ন, আনন্দের দিক থেকে একই।

কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, ক্রমেই আমাদের চলার বেগ বাড়ছে, ধীরে চলার আনন্দ গিয়ে ছুটে চলার আনন্দ আসছে। মানুষ এখন ঘর ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল, উদ্ভিদের মতো একটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চাইল না, পাখির মতো ঠাঁই ঠাঁই উড়তে উড়তে চলল। কোনো স্থানের প্রতি তার স্থায়ী আসক্তি রইল না। আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তার পরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। দেখতে দেখতে এক-একটা দেশের বৈশিষ্ট্য চ'লে যাচ্ছে, দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের লোক দেশে আসছে, কে যে কোন্ দেশে জন্মাচ্ছে কোথায় বিয়ে করছে কোন্‌খানে মরছে তার ঠিক নেই। এই ইংলণ্ডের এক অতি অখ্যাত অতি বিজ্ঞান পল্লীগ্রামে এক তামিল চাষা—ঘোর কৃষক ও ঘোর অশিক্ষিত—ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ছেলোপিলে নিয়ে সংসার করছে। সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ঘর ছেড়েছিল, এখন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়েছে। এর ছেলোপিলে হয়তো ক্যানাডায় বাসা বাঁধবে কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। কোন্ দেশের প্রতি তাদের পেট্রিয়টিজম যাবে? বাপের মাতৃভূমি, না নিজের মাতৃভূমি, না নিজের ছেলের মাতৃভূমি—কার প্রতি?

কত চীনা-মালয়-কাক্সির ইংরেজ ছেলে দেখছি, কত কত ইংরেজের ফরাসী, জার্মান, জাপানী ছেলে দেখছি, কত শাদা-রঙের আয়া লালচে কালো-রঙের ছেলেকে ঠেলা গাড়ি ক'রে বেড়াতে নিয়ে যায়, কত আর্থ-ধাঁচের মুখে মঙ্গোলীয়-ধাঁচের ভুরু শোভা পায়। জগৎ জুড়ে একটা সঙ্কর জাতি গ'ড়ে উঠেছে, সে জাতির নাম মানব জাতি। এই নতুন মানবের জন্য যে নতুন সমাজ খাড়া হচ্ছে সে সমাজের নীতিসূত্রও নতুন। সে সব নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি, গোরুর গাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা।

দুটোও স্বল্প ধর্যে নর নারীর মিলন-নীতি। গোরুর গাড়ির যুগের নর নারী অল্প বয়সে বিবাহ করত পিতামাতার নির্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাখ্যায় ক্রী-পুরুষকে চিনত না জানত না দেখত না, দুজনেই একস্থানে থেকে জীবন শেষ করত এবং একজন করত গৃহের অঙ্গরের কাজ, অন্যজন করত গৃহের সদরের কাজ। এরোপ্লেনের যুগের নর নারী বিবাহ করে বেশি বয়সে পঞ্চাশের নির্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাখ্যায় ক্রী-পুরুষকে শৈশবে দেখতে পায় ইচ্ছুক; যৌবনে দেখতে পায় আপিসে; বিবাহের পূর্বে দেখতে পায় ক্লাবে নাচঘরে টেনিস কোর্টে ক্যাফে-রেস্তুরায়; বিবাহের পর দেখতে পায় আপিসের সহকর্মী বা সহকর্মীরূপে, একলা পথের সহযোগিনী বা সহযোগিনীরূপে, একলা প্রবাসের বান্ধবী বা বান্ধবরূপে। তারপর স্বামী ক্রী একস্থানে থাকতে পায় না, দু'জনের দুইস্থানে জীবিকা। দু'জনেই বাইরের কাজ করে, হোটеле বাস করে, রেস্তুরায় খায় এবং সুবিধা না হ'লে দেখা করতে পায় না। সন্তানরা মেটানিটি হোমে জন্মায়, বোর্ডিং স্কুলে বাড়ে এবং বড় হলে জীবিকার সন্ধানে দেশে-বিদেশে বেড়ায়।

এহেন যুগে প্রেম ও সত্যের নীতি বদলাতে বাধ্য। প্রেম বা সত্যই থাকবে না এমন নয়, থাকবে, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা হবে অন্যরকম। একনিষ্ঠতা সুকর ছিল যখন স্বামী ক্রী থাকত একস্থানই এবং যখন অনাখ্যায় আখ্যায়াদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল অল্পই। এখন স্বামী লণ্ডনের দোকানে কাজ করে তো ক্রী কাজ করে শিকাগোর দোকানে, এবং উভয়েরই দোকানে বা দোকানের বাইরে বান্ধব-বান্ধবীর সংখ্যা নেই। একদিন যে প্রেম এ্যাটলান্টিকের এক জাহাজে যেতে যেতে হয়েছিল, চিরদিন সে প্রেম নাও টিকতে পারে এবং সে প্রেমের পথে প্রলোভনও তো অল্প নয়। সূত্রাং ডিভোর্স এবং পুনর্বিবাহ এবং আবার ডিভোর্স। কিংবা বিবাহটা একজনের সঙ্গে পাকা, মিলনটা অন্যান্য জনের সঙ্গে কাঁচা। এটা অবশ্য গোরুর গাড়ির ধর্মনিষ্ঠতার সঙ্গে এরোপ্লেনের হৃদয়-গীতির সন্ধি করার প্রয়াস। কেননা ডিভোর্স আইন এখনো গোরুর গাড়ির অনুশাসন অনুসারে কড়া, এবং রোমান্যন ক্যাথলিক ধর্মে নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতে সন্ধির দরকার হবে না, গোরুর গাড়ি ইটবেই, ডিভোর্সটা বিবাহের মতো নোজা হবে এবং বিবাহটা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে বদলাবে। কেবল মুশকিল এই যে, মানুষের হৃদয়টা অত সহজে বদলাবার নয়, এডেনিসকে হারিয়ে ভেনাস কেঁদে আকুল হবে, ইউরিডিসকে খুঁজতে অর্কিউস পাড়াল প্রবেশ করবে; সীতার শোকে রঘুপতি ঋণীতাকেই হৃদয় দেবেন।

এতদিন নারী নরের সম্বন্ধগুলো ছিল পারিবারিক—মাতা ও পুত্র, ভগিনী ও ভ্রাতা, ক্রী ও স্বামী, কন্যা ও পিতা। এখন এক নতুন সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েছে—সখা ও সখী। বিয়ের আগে বৃকতে পারা যাচ্ছে না শতকে সখীর মধ্যে কোনটি প্রিয়তমা—কোনটি ক্রী। বিয়ের পরেও পদে পদে সন্দেহ হচ্ছে, যাকে বিয়ে করেছে সে ক্রী না সখী, এবং যাদের সঙ্গে সখ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন একজন সখী না ক্রী। গুরুজনের নির্বন্ধে যখন বিয়ে করা যেত এবং অনাখ্যায় নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটত না, তখন যাকে পাওয়া যেত সেই ছিল ক্রী। কিন্তু এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে, ঠিক করতে গিয়ে ভুল ক'রে ফেলা অতি সহজ, এবং ভুল থেকে উদ্ধার পাওয়া অতি শক্ত। এখন অনাখ্যায়াদের সঙ্গে নানা সূত্রে পরিচয়। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও ক্রীর সঙ্গে যত না সাক্ষাৎ হয় সখীদের সঙ্গে ততোধিক, ক্রী যখন নিকটে থাকে তখন শোবার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখা করবার ফুরসৎ কোনো পক্ষেরই নেই। যে যার নিজের কাজে যায় ও রেস্তুরায় একা একা খায়। আর ক্রী যখন দূরে থাকে তখন তো দেখা হবারই নয়।

এই দূরে থাকাথাকিটাই বেশির ভাগ হলে ঘটছে। কেননা বিয়ের আগে ক্রী যে কাজে বিশেষজ্ঞ

হয়েছে বিয়ের পরে সে কাজটি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক কর্মস্থল থেকে আরেক কর্মস্থলে ঘুরতে থাকা তার পক্ষে মস্ত বড় ত্যাগ, এবং সে ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি। সূতরাং প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর স্বামী যদি সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয় তো স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয় বৎসরান্তে একবার। কিংবা কৃষক স্বামীর স্ত্রী যদি ভ্রাম্যমাণ চিত্রকর হয় তো স্বামীর সঙ্গে সে একেবারে বেশিদিন থাকতে পারে না। অথচ অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন নতুন পুরুষের আলাপ-বন্ধুতা এবং সংবাদদাতার সঙ্গে প্রতিদিন নতুন নারীর সাক্ষাৎ পরিচয়। এরূপ হলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, কে স্ত্রী, কে সখী—যাকে বিবাহ করেছে সে নাও হ'তে পারে স্ত্রী, যাকে বিবাহের আগে দেখিনি সেই হ'তে পারে সখীর অধিক। যারা হৃদয় সম্বন্ধে অনেস্ট তাদের পক্ষে এটা এক বিষম সমস্যা, যারা সমাজকে ভয় ক'রে ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে কিছু নয়। তারা হয় চূপ ক'রে স'য়ে যায়, কঁাদে; নয় যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ ডুবে ডুবে জল খায়।

বিশ বছর আগেও স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুতা ছিল সমাজের চোখে সন্দেহাত্মক, বিশেষত বিবাহের পরেও স্বামীর বা স্ত্রীর অনভিমতে। এখন বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে স্পষ্ট বোঝাপড়া হ'য়ে যাচ্ছে যে, স্ত্রীর সখাদের নিয়ে স্বামী কিছু বলতে পারে না, স্বামীর সখীদের নিয়ে স্ত্রী কিছু বলতে পারে না, পরস্পরের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুতা কোনো কোনো স্থলে সৰু ঘটলেও মোটের ওপর সমাজ-সম্মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ-সম্মত না হ'লে চলতও না। কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন একটা ব্যবধান অনিবার্য হ'য়ে পড়েছে, দূরত্ব-জনিত ব্যবধান। স্ত্রী আর গৃহিণী নয়, হোটেলবাসীর গৃহিণীর প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী আর সচিবও নয়, ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা তার অভিনেত্রী-স্ত্রীর কাছে কি মত্ৰণা প্রত্যাশা করতে পারে? স্ত্রী নিজের কাজে ব্যস্ত। বরং একজন সাংবাদিকার কাছে মত্ৰণা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। তারপর স্ত্রী যদি বা সখী হয় তবু দূরে থাকে ব'লে বন্ধুতার সব দাবী মেটাতে পারে না,—ধরো, একসঙ্গে টেনিস খেলতে পারে না, সিনেমায় যেতে পারে না, টেবিলে খেতে পারে না, মোটরে বেড়াতে পারে না, অবসরকালে গল্প করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে অনিবার্য ব্যবধানটি, এটিকে পূরণ করতে পারে অন্য নারী বা অন্য পুরুষ—সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন। সেই জন্যে এখন পুরুষ-পুরুষ বা নারীতে-নারীতে বন্ধুতার মতো স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতাও চলতি হ'য়ে গেছে, এ নিয়ে কেউ কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে ল'খা হয় না।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে সেকালের প্রেম ও সত্যীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমতঃ, প্রেম যে চিরস্থায়ী, এমন কি দীর্ঘস্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিবাহের সময় এখনকার তরুণ তরুণীরা তাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা'র মতো গভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করে না যে, বাব্বজীবন পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেই। প্রতিজ্ঞা যদিও বাঁধা-নিয়ম মেনে করে, তবু লঘুভাবেরই করে, মুখে যা বলে মনে তা' বলে না। মনে মনে যোগ ক'রে দেয়—‘আশা করি’। যেক্ষেত্রে ডিভোর্স যত সুলভ সেক্ষেত্রে লঘুভাবটা তত বেশি। এই লঘুভাবটা না থাকলে মানুষ ভয়ে আধমরা হতো। কেননা এখন তো বিবাহ পিতামাতার নির্বন্ধে নয় যে, ভুলের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভগবানকে ডেকে আশ্রস্ত হবে। নির্বন্ধ যখন নিজেরি হাতে তখন ভুলের দায়িত্বও নিজেরি। একদিনের ভুলের জন্যে চিরজীবন প্রায়শ্চিত্ত করা অসহ্য। তা ছাড়া ভুল নাই হোক, ঠিকই হোক, একদিনের ঠিক কি চিরদিন ঠিক থাকে? বিশ বছর বয়সের ঠিক কি ত্রিশ বছর বয়সেও ঠিক থাকে? দু'পক্ষই বদলায়, দু'পক্ষই নতুন সত্যকে পায় পুরোনো সত্যকে ভোলে। রলার ‘আনেং’ যাকে প্রাণ ভ'রে ভালোবাসত তাকে কথা দিতে পারল না যে চিরদিন তেমনি ভালোবাসবে, সেই জন্যে তাকে বিবাহই করতে পারল না, অথচ তার ভালোবাসার চিহ্ন ধারণ করল তার সন্তানের মা হ'য়ে।

দ্বিতীয়তঃ, সতী নারীর স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের সঙ্গে তেমনি অন্তরঙ্গতা থাকতে পারে যেমন অন্তরঙ্গতা এ যাবৎ কেবল সখীর সঙ্গেই সম্ভব ছিল। পর-পুরুষকেও ভালোবাসা যায়, তার সঙ্গে গা-ঘেঁষে বসা যায়, তার কোলে মাথা রাখা যায়, অভিনয়কালে তাকে চুদন আলিঙ্গনও করা যায়, এমন কি অন্য সময়ও। স্বামীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার সখার সঙ্গে তেমনি। অথচ সতী ধর্মের ব্যত্যয় হয় না। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ়তম ভালোবাসা থাকে। এক কথায় সখ্য প্রেম ও মধুর প্রেম পরস্পর বিরোধী নয়, একই হৃদয়ে দু'য়েরই স্থান হতে পারে। এবং এমনো একদিন হতে পারে যে সখ্য প্রেমই মধুর প্রেমে পরিণত হয়েছে, মধুর প্রেম সখ্য প্রেমে পর্যবসিত। সেরূপ হলে সম্বন্ধ-পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী ঠাই ঠাই থাকার ফলে এমন ঘটনা বিচিত্র নয়। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই স্বতন্ত্র, দু'জনেই স্বাবলম্বী, দু'জনেই ভ্রাম্যমাণ—একদিন যে দু'টি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে মিলেছিল চিরদিন তারা সেইস্থানে থাকতে পারে না, পরস্পরের থেকে সমান দূরত্ব রাখতে পারে না, দূরত্বের কম বেশি ঘটে, অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এক সম্বন্ধ আরেক হয়ে ওঠে। যে ক্ষেত্রে তেমন ঘটনা,—দাম্পত্য ও সখ্য যেমন ছিল তেমনি থাকে, সে ক্ষেত্রেও যে সতীত্বের পুরোনো আদর্শ খাটে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা পুরোনো সতীত্বের সঙ্গে ছিল নিজের দ্বারা স্ত্রীকে বা স্বামীকে সাতপাকে ঘিরে রাখা, এখন অনেকখানি ঢিলে দিতে হচ্ছে, কোনো পক্ষেই বিশ্বস্ততার জন্যে পীড়াপীড়ি নেই, বিশ্বস্ততার জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই, ওথেলো ক্রমশ সেকালে হয়ে পড়েছে। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে। চিরকুমার থাকলে সেকালে উপবাসী থেকে যেতে হতো, চিরকুমার থাকলে একালে আধপেটা থাকতে পারা যায়—সখী থাকে কাছে। বিবাহ করলে সেকালে পেট ভরে উঠত, বিবাহ ক'রেও একালে আধপেটা থাকতে হয়—স্ত্রী থাকে দূরে। একালের কুমারীদের অনেক দুঃখ থেকে অব্যাহতি মিলেছে, সেইজন্য তারা বিবাহের জন্যে কৈঁদে মরছে না। এবং একালের বিবাহিতারাও অনেক সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই জন্যে তারা সৌভাগ্যগর্বে বাড়াবাড়ি করছে না।

তবে ইংলও ফ্রান্স প্রমুখ দেশে স্ত্রী-পুরুষের সাতিশয় সংখ্যা-বৈষম্যের দরুন প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিমতার উৎপত্তি হয়েছে বটে। কর্তারা দুনিয়া দখল করতে ব্যস্ত, যুদ্ধ না করলে তাদের চলে না, দেশের নারী সংখ্যার অনুপাতে পুরুষ সংখ্যা যে কমতেই লেগেছে আর সেজন্যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই যে নীতিভ্রংশ (demoralisation) হচ্ছে একথা কর্তারা বুঝেও বুঝছেন না। ছেলেরা জানে মেয়েরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, সূতরাং বিবাহের গরজটা মেয়েদেরই বেশি, সাধতে হয় তো ওরাই সাধবে, তপস্যাটা একেবারে ও-তরফ। মেয়েরা জানে সকলের বরাতে বিবাহ নেই, বিবাহ যদি বা হয় তবু স্বামীকে ধ'রে রাখতে পারা যাবে না, একজনকে হারালে আরেক জনকে পাবার আশা নেই, তপস্যাটা অনর্থক এ-তরফ। এর পরিণাম এই হচ্ছে যে, তপস্যাটাকে কোনো ভরফই স্বীকার করছে না, হাতে হাতে যখন যা পাচ্ছে তখন তা নিচ্ছে, পরমুহূর্তে ছেলেরা ফেলে যাচ্ছে, মেয়েরা কান্না চাপছে। এ বড় নিষ্ঠুর খেলা। দু'পক্ষে সমান নিয়ম খাটছে না, একপক্ষ ফাউল করতে করতে অতি সহজে জিতছে, অপরপক্ষ ফাউল সইতে সইতে অতি সহজে হারছে। দু'পক্ষেরই নীতিভ্রংশ, তবু মেয়েরা দোষ ধরছে ছেলেদের, ছেলেরা দোষ ধরছে মেয়েদের। মেয়েরা বলছে, বাপ রে! একেলে ছেলেগুলোর কী দেমাক; এরা আমাদের খাওয়াবে না পরাবে না প্রতিপালন করবে না, শুধু আমাদের বিয়ে ক'রে মাথা কিনবে, এরই জন্যে এত খোশামোদ। আমাদের ঠাকুরমাদের জন্যে আমাদের ঠাকুরদা'রা কী না করতেন, ডুয়েল ল'ড়ে প্রাণ বিপন্ন করতেন, যাকে অত কষ্টে পেতেন তাকে কত যত্নে রাখতেন! আর আমাদের এরা—!

ছেলেরা বলছে, তোমরা সব স্বাধীনা স্বতন্ত্রা আলোকপ্রাপ্তা শী-ম্যান, আমাদেরকে না হ'লে তোমাদের যে চলে না এ তো বড় লজ্জার কথা! আর, আমরা তো বেশ লক্ষীছেলেই ছিনুম, তোমরা এতগুলোতে মিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণীর কাকে ছেড়ে কাকে ধরা দেব আমরা পুরুষ চন্দ্রমারা!

## ॥ নয় ॥

এ দেশে এসে অবধি দেখছি বিপুলভাবে ধর্মচর্চা চলেছে। পাড়ায় পাড়ায় গির্জা, পথে ঘাটে ধর্মপ্রচার, কুলীর পিঠে ধর্মবিজ্ঞাপন। যে জাতীয় সংবাদপত্রে কুকুর-দৌড়ের শেয়ার মার্কেটের ও ডিভোর্স কোর্টের খবর থাকে সে জাতীয় সংবাদপত্রেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রগোস্তর। রেলের ও বাসে আপিস থেকে ফেরবার সময় এক হাতে সান্ধ্য কাগজ ও অন্য হাতে ছ'পেনী দামের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে একবার এটাতে ও একবার ওটাতে চোখ বুলিয়ে যেতে কত লোককেই দেখি। গুনতে পাই এখন ধর্মগ্রন্থগুলোর যত কাটতি নভেল নাটকেরও নাকি তার বেশি নয়। বছর পনেরো কুড়ি আগে নাকি এতটা ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে হঠাৎ ধর্মচর্চার মরা গাঙে বান ডেকেছে। তা ব'লে অর্থচর্চা বা কামচর্চা যে কিছুমাত্র কমেছে এমন নয়। এক সঙ্গে ত্রিমূর্তির উপাসনা চলেছে—গড, ম্যামন, Eros। ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জে ডার্বীতে থিয়েটারে নাচঘরে হোটেল পার্কে গির্জায় সর্বত্র লোকারণ্য, কোনো একটার ওপরে বিশেষ পক্ষপাত কারুর নেই; স্কুলে কলেজে লাইব্রেরীতে কারখানায় যেখানে যাই সেখানে লোকের ভিড়; মিউজিয়ামে চিত্রশালায় হাসপাতালে অন্ধ-আতুর-অনাথাশ্রমে যুদ্ধনিবারণী সভায় কোথাও কারুর আগ্রহ কম নয়। একটা জীবন্ত জাতির হাজারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই সমান জীবন্ত, যেমন তাদের বৈচিত্র্য তেমনি তাদের বৈপরীত্য, ভালো মন্দ সুন্দর কুৎসিত পদ্ম পাক ঐশ্বর্য দৈন্য প্রেম হিংসা সবই একাধারে বিধৃত, এবং সবই সমান প্রচুর। সেইজন্যে ধর্ম সম্বন্ধে সকলেই ভাবতে শুরু করেছে, একুশ বছর বয়সের ফ্ল্যাপার পর্যন্ত। শনিবারের দিন সন্ধ্যাবেলা যে-সব যুবক যুবতী পরস্পরের কোলে মাথা রেখে মাঠে বাগানে সকলের সামনে প্রেমলাপ করে, রবিবারের দিন সকালবেলা সেই সব যুবক যুবতী গির্জায় ভিড় ক'রে অখণ্ড মনোযোগের সহিত ধর্মোপদেশ শোনে, কলের পুতুলের মতো হাঁটু গাড়ে। এবং সোমবারের দিন দুপুরে যখন তারা আপিসে গিয়ে পাশাপাশি কাজ করে তখন কেউ কারুর সঙ্গে ইস্তিতেও কথা বলে না, এমনি কঠোর ডিসিপ্লিন। কাল যদি যুদ্ধ বাধে ছেলেরা হুসিমুখে বন্দুক কাঁধে নিয়ে মরণযাত্রা করবে, মেয়েরা দেশের ভার কাঁধে নিয়ে ঘর ও বাহির দুই আগলাবে। সুখের সময় সুখ, দুঃখের সময় আশা, সব সময় প্রস্তুত ভাব—এই হচ্ছে ইংলণ্ডের ধর্ম, ইউরোপের ধর্ম।

সামরিক সংস্কার বর্ধন হ'তে আমাদের সমাজে নেই, যখন ছিল তখন সমস্ত সগাজটার একটি বিশেষ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মেরও উচ্ছেদ হয়েছে। ইউরোপের সমাজের সর্বশ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বাসী, এ বিশ্বাসের ওপরে এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না, এ বিশ্বাস এদের প্রকৃতিগত, যুদ্ধহীন জগৎ এরা মনেও আনতে পারে না। মানুষে-মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা' এদের অনেকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে কিন্তু সংস্কার থেকে পায়নি। পণ্ডতে মানুষে যুদ্ধ

যে মন্দ তা আমরা আড়াই হাজার বছর আগে বৃদ্ধের সময় থেকে জেনেছি, এরা এখনো জানেনি। প্রকৃতিতে পুরুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা দৈব-বাদীরা কবে শিখলুম জানিনে, এরা কোনোদিন শিখবে না। এদের ভাবজগতেও আইডিয়াতে আইডিয়াতে বৃদ্ধ। এদের ধর্ম বৃদ্ধের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকার ধর্ম। ন কিঞ্চিদপি বলহীনেন লভ্যম্। নিশ্চেষ্ট যদি এক মুহূর্তের জন্যেও হও তবে অপরে তোমাকে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

ধর্ম ও রিলিজন্স এক জিনিস নয়। আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, লোকমুখে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু মানে ভারতীয়, সূতরাং ভারতীয় ধর্ম। আমাদের রিলিজন্সগুলোর নাম বৈষ্ণব মত, শাক্ত মত, সৌর মত, শৈব মত, গাণপত্য মত ইত্যাদি। আমরা যদি খ্রীস্টীয় মত বা মহম্মদীয় মত নিই তবু আমরা হিন্দুই থাকব, ধর্মত হিন্দু। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ধর্মমতের তেমন সহজ সম্বন্ধ থাকবে না, কতকটা স্বতঃবিবোধ এসে পড়বে। আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান বা খ্রীস্টান হয়েছেন তাঁরা হিন্দুই আছেন, কিন্তু ভিতর থেকে সৃষ্টির স্ফূর্তি পাচ্ছেন না, ইচ্ছানুসারে ইসলামকে বা খ্রীস্টিয়ানিটিকে পরিবর্তন করতে পারছেন না, পরমুখাপেক্ষী হচ্ছেন। ইউরোপেরও এই দশা। ইউরোপের ধর্ম ও ধর্মমত অদ্বাদী নয়, বিরুদ্ধ। ইউরোপের প্রকৃতি হোমারের আমলে যা ছিল এখনো তাই কিন্তু মাঝখানে উড়ে এসে ভুড়ে বসেছে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের একটি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ইউরোপের প্রকৃতির পক্ষে আড়ষ্টতাজনক। খ্রীস্টিয়ানিটির দ্বারা ইউরোপের অশেষ উপকার হয়েছে, কিন্তু খ্রীস্টিয়ানিটির পেছনে ইউরোপের আত্মা সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি পায়নি। ইউরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল, ইউরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। ইউরোপ বিনা পরীক্ষায় কিছুই মানে না, পরীক্ষার পর যা মানে তার বাইরে সত্য খুঁজে পায় না। আমরা অগ্নানবদনে সব মেনে নিই, অধিকারী ভেদে মিথ্যাকেও বলি সত্য। ইউরোপ বিশ্বাস করে যোগ্যতমের উদ্বর্তনে, আমরা বিশ্বাস করি সমন্বয়ে। এহেন যে ইউরোপ তাকে তার নিজস্ব রিলিজন্স অভিযুক্ত করতে না দিয়ে রাহুগ্ৰস্ত করে রাখল খ্রীস্টিয়ানিটি। সেই দুঃখে গোটা মধ্য যুগটা ইউরোপ অন্ধকারেই কাটল। যেদিন গ্রীসকে দেবাৎ পুনরাবিষ্কার করে সে আপনাকে চিনল সেদিন ঘটল Renaissance, তার পর থেকে শুরু হলো Reformation অর্থাৎ খ্রীস্টিয়ানিটির অগ্নিপরীক্ষা। সে অগ্নিপরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু ধর্মচর্চার এই প্রাবল্য দেখে মনে হয় এ বোধ হয় নির্বাণ দীপের শেষ দীপ্তি, এর পরে হয় খ্রীস্টিয়ানিটিকে ভেঙে বিজ্ঞানের আলোয় নিজস্ব করে গড়া হবে, নয় বিজ্ঞানের ভিতর থেকে নতুন একটা রিলিজন্স বা'র করা হবে। বিজ্ঞান কথাটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। ইউরোপীয় দর্শনটাও বিজ্ঞানেরই তাঁবেদার। এবং বিজ্ঞান বলতে কেবল Physics ও Biology নয়, Psychologyও বোঝায়। এখনো বিজ্ঞানের সামনে বিরাট একটা অজানা রাজ্য রয়েছে—মানুষের মন। ক্রমে ক্রমে যতই তাকে চেনা যাবে ততই একটা নতুন রিলিজন্সের মালমশলা পাওয়া যাবে।

রিলিজন্সের জন্যে মানব হৃদয়ের যে সহজ তৃষা তাকে শান্ত করবার তার অপরকে দিলে চলে না; নিজের ওপরে নিতে হয় সে ভার। ইউরোপের ভার এতদিন অনো বয়েছে। অনোর ফরমাস খেটে ও বাঁধা বরাদ্দ পেয়ে ইউরোপের তৃষা তো মেটেনি, অধিকন্তু খ্রীস্টিয়ানিটির ওপরে রাগ করে রিলিজন্সের প্রতি জন্মেছে অনাস্থা—যেন রিলিজন্সকে না হলেও মানুষের চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে সে উন্নতি বহু দিনের রুদ্ধ জ্বলের নিষ্কাশন, তাই সে এমন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রীসের যদি মরণ না হতো, তবে গ্রীসের ছেলেরা আয়ার কোলে অমানুষ না হয়ে তার নিজের কোলে দিন দিন শশিকলার মতো বাড়তে বাড়তে এতদিনে স্কেন হয়ে উঠত

জানিনে, কিন্তু খ্রীস্টীয়ানিটির ওপরে আধুনিক ইউরোপের মহা মনীষীদের এমন অশ্রদ্ধা ও রিলিজনের ওপরে তাঁদের এমন অন্যস্থা দেখতুম না। তাঁরা বলছেন, এই হতভাগা ধর্মমতটার জন্যেই এত যুদ্ধ, এত অশান্তি, এত গোড়ামি, এত কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাসী যাজকরা সেন্সকে পাপ বলে নিজেরা বৈরাগী হয়েছে, অথচ অন্যদের বলেছে বহু সন্তানবান হতে, আর জনবৃদ্ধির ফলে যখন যুদ্ধ বেধেছে তখন এরাই দিয়েছে মরণ-মারণের উত্তেজনা; এরা প্রচার করেছে আত্মসম্মাননাশী উৎকট পাপবাদ—‘We are born in sin’, আমরা অধম, একমাত্র যীশুই ভরসা; গণতন্ত্রের এরাই শত্রু, স্বাধীন মানুষকে এরা সহ্য করতে পারে না; দাসব্যবসায়ের এরাই সমর্থক; এরা বড়লোকের মোসাহেব, ক্যাপিটালিস্টের বাহন, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে রাশিয়া থেকে চার্চ উঠে গেল, ফ্রান্সে চার্চের ওপরে কড়া নজর, ইংলণ্ডে চার্চের প্রতিপত্তি কিছুদিন থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে ততটা ছিল না। তবে ইংলণ্ডের চার্চ ইংলণ্ডের স্টেটেরই মতো জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। সেই জন্যে জনসাধারণকে খুশি রাখার জন্যে এর অবিশ্রাম চেষ্টা।

চার্চ ও স্টেট এ দেশের সমাজের এপিঠ ওপিঠ। যারা চার্চের নেতা তাঁরা পার্লামেন্টে বসেন, যারা স্টেটের কর্ণধার তাঁরাও পার্লামেন্টে বসেন, পার্লামেন্টই হচ্ছে এ দেশের সমাজপতিদের আড্ডা। আমাদের দেশে স্টেট ও সমাজ এক নয় এবং চার্চ আমাদের নেই। চার্চ যে এদের কতখানি তা’ আমরা দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারব না, কেন না চার্চ মানে শুধু গির্জা নয়, চার্চ মানে সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধ আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগের পর থেকে নেই। কেশবচন্দ্র সেন সঙ্ঘের পুনঃ প্রবর্তন করেন, আমাদের আধুনিক সঙ্ঘের নাম ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজকে কেউ কেউ ব্রাহ্মচার্চ বলে থাকেন, প্রবর্তক সম্বন্ধেও প্রবর্তক চার্চ নাম দেওয়া চলে। কিন্তু হিন্দুসমাজকে হিন্দু চার্চ বলা চলে না। হিন্দুসমাজ কোনো একটা বিশেষ ধর্মমতকে প্রতিপদে মেনে চলবার জন্যে গঠিত একটা কৃত্রিম সম্বন্ধ নয়, হিন্দুর কাছে ধর্মমত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্বামী শাক্ত ও স্ত্রী বৈষ্ণব ও সন্তান নাস্তিক হলেও হিন্দুসমাজ আপত্তি করে না। আজ যদি হিন্দুসমাজ সেকালের মতো জীবন্ত থাকত তবে স্বামী শৈব ও স্ত্রী মুসলমান হলেও আপত্তি করত না। হিন্দু ধর্ম ছিল দেশের ধর্ম, দেশে যে কেউ বাস করত সে ছিল হিন্দু। জাতিভেদের উৎপত্তি হয়েছিল পেশাভেদের দ্বারা, পেশা বদলালে জাতিও বদলাত; কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো অধিবাসীকেই অহিন্দু বলা হতো না, যাই হোক না কেন তার ধর্মমত বা রিলিজন।

হিন্দুসমাজ কোনো দিন ধর্মমত নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু দেশের আচারকে বা দেশের প্রথাকে শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে মেনেছে। এখনো কি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-আর্য খ্রীস্টান-মুসলমান ভারতীয়রা সাকারবাদী শাক্ত বৈষ্ণবদের মতো একায়বত্তী পরিবার ও তার অনিবার্য পরিণাম বাল্যবিবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? একায়বত্তী পরিবারের সঙ্গে বাল্যবিবাহ উঠে যাচ্ছে ইণ্ডিয়াল রেভলুশনের ফলে। এর সঙ্গে ধর্মমতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ধর্মমত নির্বিশেষে অথও হিন্দুসমাজের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, খ্রীস্টান-মুসলমান-বৈষ্ণব-শাক্ত সকল ভারতীয়দের মধ্যে একই সংস্কার বিদ্যমান। তবু কয়েকটা ধর্মমতকে হিন্দু নাম দিয়ে অন্যগুলিকে অহিন্দু নাম দেওয়া হচ্ছে ধর্মমতকে ধর্ম বলে ভুল করে।

চার্চ বা সম্বন্ধ হচ্ছে একটা ধর্মমতের বা রিলিজনের দ্বারা পরিচালিত সমাজ, জাতীয় প্রকৃতি বা জাতীয় ধর্মের সঙ্গে তার রক্ত-সম্পর্ক নেই। চার্চ অনায়াসেই আন্তর্জাতিক হতে পারে। রোমান চার্চ একদিন সমস্ত ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাবেই শাসন করছিল, ক্রমশ আধিভৌতিক দিকটাকে নিয়ে আধুনিক ধরনের স্টেট গ’ড়ে ওঠে, চার্চের কাজ লাঘব হয়। তারপর নানা দেশে স্টেটের সঙ্গে চার্চের নানা বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কোথাও স্টেট চার্চকে গ্রাস করে, কোথাও

স্টেট চার্চকে ভাঙে মারে, কোথাও স্টেট চার্চকে কোনো মতে টিকে থাকবার অনুমতি দেয়। ইংলণ্ডে কিন্তু স্টেট ও চার্চ বেশ বনিবনা করে চলছে, চার্চ অবশ্য এখন দ্বৈগুণ্যে রম্য মতো স্টেটের বিশেষ অনুগত, নইলে রাশিয়ার চার্চের মতো তাকেও ভিটে ছাড়া হয়ে বনে পালাতে হতো। কিন্তু অত্যাধুনিক খ্রীস্টের খোশ মেজাজের ওপর অতটা ভরসা রাখা স্বামী মাত্রেই পক্ষে ভয়াবহ। ইংলণ্ডের চার্চও কবে disestablished হয়ে মনের দুঃখে বনে যাবে বলা যায় না, স্টেটের জুলুম দিন দিন বাড়ছে।

খ্রীস্টীয় আদর্শের যারা সমর্থক তাঁদের অনেকে বলছেন, 'Christianity never had a trial.' খ্রীস্টীয় আদর্শকে আমরা গ্রহণই করিনি এতদিন, আমরা গ্রহণ করেছি চার্চের কর্ম কাণ্ড, আমরা শরণ করেছি সংঘকে। চার্চের দ্বারা খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব এতকাল ঢাকা পড়ে এসেছে, খ্রীস্টের সরল উক্তিগুলিকে চার্চের মহামহোপাধ্যায়রা ঢাকা ভাষ্যের দ্বারা জটিল করে—কুটিল করে ব্যাখ্যা করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্ব ও নিউ টেস্টামেন্টের ত্রাণতত্ত্বকে গোড়াতে স্বীকার না করেও খ্রীস্টের অনুজ্ঞা পালন করা সম্ভব, খ্রীস্টকে অনুসরণ করা সম্ভব। খ্রীস্টের জন্মঘটিত রহস্যগুলো সম্বন্ধে খ্রীস্ট স্বয়ং কিছু বলেননি, চার্চই যা-খুশি বানিয়েছে। নিজের প্রতিপত্তির জন্যে চার্চ খ্রীস্টকে এল্লপ্রয়েট করেছে, খ্রীস্টকে ইচ্ছামতো ভেঙে গড়েছে। আমরা সত্যিকার খ্রীস্টকেই চাই, আমরা চার্চের হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমরা খ্রীস্টের সৃষ্ট খ্রীস্টীয়ানিটিকেই চাই, আমরা চার্চের বানানো খ্রীস্টীয়ানিটি বর্জন করব।—চার্চের হাত থেকে রিলিজনকে উদ্ধার করে তাকে ব্যক্তির ক্ষুধাভূক্তার বিষয় করবার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এতকালের চার্চকে এক কথায় বিদায় দেওয়া যায় না, তুলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সংঘের মধ্যেও একটা সত্য আছে, সংঘবদ্ধ সাধনারও একটা মূল্য আছে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝখানে হয়তো চিরকাল একটা মধ্যস্থ থেকে যাবেই, সেটার নাম গ্রুপ বা পার্টি বা সম্প্রদায় যাই হোক না কেন। নির্ভালা ব্যক্তিত্ববাদ বা নির্ভালা সমাজতত্ত্ববাদ সফল হতে না জানি কত কাল লাগবে। হিন্দুসমাজের পেশাগত জাতি একদিন জন্মগত জাতি হয়ে না দাঁড়িয়ে থাকলে হিন্দুসমাজই জগৎকে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকত।

রিলিজনের ক্ষেত্রে পূর্ব দেশের কাছ থেকে কোনো রকম দিশা পাওয়া যায় কি না এই নিয়ে অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, বুদ্ধকেও নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছর রিলিজন বলতে কেবল খ্রীস্টীয়ানিটিই যারা বুঝেছেন, তাঁদের মুখ বদলাবার পক্ষে পৃথিবীর অপরাধের রিলিজনগুলোর মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তারা স্থায়ীভাবে ওগুলিকে গ্রহণ করবেন এমন ভাবা ভুল। কারণ ওসব রিলিজন খ্রীস্টীয়ানিটিরই মতো অন্য মাটির গাছ, ইউরোপের মাটিতে রোপণ করলে ওদের বৃদ্ধি তো হবেই না, ইউরোপের নিজের ফসল ফলাবার জন্যে যথেষ্ট জায়গাও থাকবে না। ইউরোপের ধর্মের সঙ্গে বাইরের ধর্মমতের নাড়ীর বান্ধন নেই, তেলে জলে মিশ খাবার নয়। ইউরোপের প্রকৃতি নিজের ফুল নিজে ফোটাতে পারে তো নিজেই একদিন ফোটাবে, অন্যের ফুল আদর করে দেখতে পারে, পরতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে তাজা রাখতে পারবে না। ইউরোপের আপনার জিনিস তার ফিলজফি তার বিজ্ঞান। পরের কাছে ধার করা খিওলজিক সে এখনো আপনার করতে পারল না, দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। আবার যদি ধার করতে যায় তো দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধার করবে, নিজের ধাতের ভিত্তির ওপরে পরের মতের সৌধ-প্রতিষ্ঠা করবে, ভূমিকম্প হয় তো ভিত্তি টলবে না, সৌধই ধসে পড়বে। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হাড়ে দৈব। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি; আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। ইউরোপ



অর্জন ক'রে উড়িয়ে দেয়; আমরা অমনি ভিতর থেকে পাই, সঞ্চয় করি। আমাদের উপলব্ধি ইউরোপ যদি নেয় তো নিজের মনের মতো ক'রে নেবে, খ্রীস্টিয়ানিটির আত্মটুকু বাদ দিয়ে যেমন ধড়টাকে চার্চে ঝুলিয়ে রাখল, এবং নিজের যুদ্ধপ্রিয়তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে বেতাল ক'রে তুলল, আমাদের বেদান্ত বা বৈক্যব তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই করবে, এবং নিজের বিজ্ঞান-দর্শনের দ্বারা ডিস্টিল ক'রে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই তার গ্রহণ করবে না। সেইজন্যেই আমার মনে হয় ইউরোপকে আমরা মূর্খবির মতো শিক্ষা দিতে পারব না, কেবল বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারব। আমাদের সাহায্যে ইউরোপ যদি নিজের রিলিজেন নিজে সৃষ্টি করে, আর ইউরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজেনগুলোকে বিজ্ঞান শোষিত ক'রে নিই, তবে অতি দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম; দু'টিতে হবে হরিহরায়। তার পরে যখন আরো দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের প্রকৃতি এক হ'য়ে আসবে, ধর্ম এক হ'য়ে আসবে, তখন দু'টিতে হবে এক দেহমন, একাধ্য।

এই মুহূর্তে রিলিজেন সম্বন্ধে ছোটবড় ইতরভদ্র সকলেই কিছু কিছু ভাবছে কিন্তু এখনো সে ভাবনা তেমন ঐকান্তিক হয়নি, যেমন হ'লে নতুন একটা রিলিজনের জন্ম-লক্ষণ দেখা যেত। মাত্র দেড়শো বৎসরের বিজ্ঞান চর্চা জীবনকে এখনো যথেষ্ট উদ্ভাস্ত করেনি, দেড়শো বছর আগের গোক্ষ ঘোড়ার গাড়ি থেকে মাত্র এরোপ্লেন অবধি উঠেছে, এখনো অসংখ্য উদ্ভাবন বাকি। আগামী দেড়শো বছরে হয়তো আকাশে বাড়ি তৈরি ক'রে বাগান তৈরি ক'রে ফুল ফুটিয়ে দেবে। জীবন যতই জটিল হয় রিলিজেনকে ততই দরকার হয়—রিলিজেন খুলে দেয় গ্রহি, রিলিজেন ক'রে তোলে সরল। সরলীকরণের আকাঙ্ক্ষা এখনো তীব্র হয়নি বটে, তবু সরলীকরণ যে দরকার সে জ্ঞান সকলেরই কতকটা হয়েছে। ভারতবর্ষে গান্ধীর জন্ম, তিনি যন্ত্রের প্রতাপ সামান্যই দেখেছেন, তাঁর বিশ্বাস যন্ত্রকে না হলেও মানুষের চলে, তিনি জীবন থেকে যন্ত্রকে ছেঁটে ফেললেই সরলীকরণের সাক্ষাৎ পান। কিন্তু ইউরোপে যে সব মনীষীর জন্ম তাঁরা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাঁদের জন্মের বয়স পূর্ব হতেই যন্ত্র ও জীবন এক হয়ে গেছে, যন্ত্রকে ছেঁটে ফেলা ও শরীরের চর্ম তুলে ফেলা তাঁদের পক্ষে একই কথা, সরলীকরণের জন্যে তাঁরা যন্ত্রকে ছেড়ে যন্ত্রীর দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন, যন্ত্রকে রেখেও জীবনকে কতখানি সরল করা যায় এই হচ্ছে তাঁদের প্রশ্ন।

সেইজন্যে দেখা যায় ধনীদেব ঘরেও আসবাবের বাহ্যিক কমছে, সুন্দর দেখে অল্প কয়েকটি আসবাব রাখা হচ্ছে। মেয়েদের পোশাকের ওজন কমছে, বহর কমছে; সুরচিকর দেখে অল্প কয়েকখানা কাপড় পরা হচ্ছে। খোলা আকাশ খোলা হাওয়া খোলা মাঠের টানে ছেলেরা পায়ে হেঁটে পৃথিবীময় ঘুরছে। অল্প কাপড়, সাদাসিধে খাবার, প্রচুর শারীরিক শ্রম, খোলা জায়গায় নিদ্রা—এই সব হলো ইয়ুথ মুভমেন্টের মূলসূত্র। জার্মানী অঞ্চলে কাপড় জিনিসটাকে যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টা চলেছে, অঞ্চল ঐ ভয়ানক শীতে; উলঙ্গ ব্যায়াম উলঙ্গ সঁতার অর্ধোলঙ্গ নাচ ক্রমেই চলতি হচ্ছে। খাদ্যগুলো ক্রমেই কাঁচার দিকে যাচ্ছে। বাসগৃহগুলোর জানলাগুলো বড় হতে হতে এত বড় হয়ে উঠছে যে ঘরে থেকে বাইরে থাকা যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বরফ বিছিয়ে কেট করা হচ্ছে। দারণ শীতেও বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে উঠে অল্প সংখ্যক পাংলা কাপড় পরা হচ্ছে। এক কথায় দেহটাকে লোহার মতো মজবুত ক'রে গড়া হচ্ছে। গ্রীক মূর্তির মতো সবল সুখম সুন্দর দেহ এখনকার আদর্শ। নর-নারী উভয়েই এ আদর্শ গ্রহণ করছে। খ্রীস্টিয়ানিটি দেহকে ত্যাগিল্য ক'রে ইন্দ্রিয়কে রিপূ ব'লে উপবাসকে শ্রেয় ব'লে আত্মনিগ্রহকে ধর্ম ব'লে চালিয়েছিল, কিন্তু এ ধর্ম ইউরোপের প্রকৃতিগত নয়। সেই জন্যে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলেছে। সেক্ষেত্রে খ্রীস্টিয়ানিটি

এত ঘূণা করেছিল ব'লেই সেন্নকে হঠাৎ এত শঙ্কা করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার সময় কোন জিনিসের যে কত দাম তা স্থির করা শক্ত হয়। মানুষের মধ্যে যে-ভাগটা পও নে-ভাগটাকে অবস্থা নিন্দা ক'রে অবস্থা নির্বাচন করা হয়েছে; পরিণামে আজ সেই ভাগটাই সবচেয়ে বড় ভাগ, হয়তো সেইটাই সব, এমন কথাও গুনতে হচ্ছে। গ্রীককে অক্ষুণ্ন রেখে তার ওপরে খ্রীস্টানকে ঢেলে সাজালেই হয়তো সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু কোনোপক্ষের গোঁড়ারা সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়বেন না।

সরলীকরণ বলতে যারা পেগানিজম বুঝে দেহের বোঝা লাঘব করছে, তারাই রিলিজনের মোহ এড়াতে না পেরে গির্জায় যাচ্ছে, ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, ধর্মালোচনা করছে, ঘরে ব'সে রেডিওতে ধর্মকথা শুনছে। শ্যাম ও কুল দুই রাখছে, কিন্তু দু'য়ের সময় করতে পারছে না। দু'হাজার বছরের অভ্যাস বড় সহজ কথা নয়, বাঘকে আফিং অভ্যাস করালে বাঘও হাই তোলে। আফিংয়ের বদলে কোকেন ধরিয়ে লাভ নেই—প্রাচ্য রিলিজন মাঝেই ইউরোপের পক্ষে পরধর্ম। তার যখন ক্ষুধা প্রবল হবে সে তখন নেশার বদলে খাদ্য খুঁজে নিলেই সব দিক থেকে ভালো। সে খাদ্য তার নিজের ডাঁড়ার ঘরে মালমশলা আকারে প'ড়ে রয়েছে, নিজের রান্নাঘরে নিয়ে পাক ক'রে নিলে পরে পরিপাকযোগ্য হবে। ইউরোপের রিলিজন ইউরোপের লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী-স্টুডিও-স্টেডিয়াম থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে, গির্জা-মসজিদ-মন্দির থেকে নয়।

## ॥ দশ ॥

পার্লামেন্টের সদস্যনির্বাচন অবশ্য বছরে তিনশো পঁয়ষাট দিন হয় না, কিন্তু এক নির্বাচনের পর থেকে আরেক নির্বাচন অবধি প্রত্যেকটি দিন সমস্ত দেশটাই নির্বাচনের মালা জপতে থাকে। এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে না, কেন না চোখ কাড়বার মতো দৃশ্য এই একটি নয়, ইংলণ্ডের মতো দেশে দু'টি চোখ নিয়ে বাস করা এক ঝকমারি। সম্প্রতি এখানে বৈশাখ মাসের গরম, ষোলো সত্তরো ঘণ্টা সূর্যালোক, তাই মাস চার পাঁচ আগে যে সময় ঘুমুতে যেতুম, সেই সময় বেড়াতে বেরিয়ে দেখি রাতের আহার শেষ ক'রে লোকে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে বকুতা শুনছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক-একজন বক্তা এক-একখানা টুল বা চেয়ার বা ভাঙা বাস্স বা কোনো রকম এক উঁচু আসন যোগাড় ক'রে তার উপরে দাঁড়িয়ে বকুতা দিচ্ছেন। দেখবামাত্র আমাদের দেশের সঙ্গে দুটো তফাৎ ধরতে পারি। প্রথমতঃ, বক্তা যে দলেরি হোন তিনি যুক্তি দেখান, দেখাতে বাধ্য হন, প্রশ্নের চোটে তাঁকে নাকাল করবার মতো শ্রোতার অভাব হয় না, নানা দলের লেখা বকুতা প'ড়ে শুনে প্রত্যেকেরি চোখ কান এতটা সজাগ হয়েছে যে, কান্নুর চোখে ধুলো দেওয়া বা কানে মস্তুর দেওয়া সোজা কথা নয়। ভাব-প্রবণতা এ জাতটার ধাতে নেই, গোলদীঘির বক্তাদের হাইড পার্কে দাঁড় করিয়ে দিলে শ্রোতা নয় দর্শক যদি বা জোটে তবে তাদের একজনেরো চোখের পাতা ভিজবে না, কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হবে না, শিরায় বিদ্যুৎ খেলবে না। সূতরাং বক্তারা শ্রোতাদের অন্য রকম দুর্বলতার সুযোগ নেন। ইংলণ্ডে জনসাধারণ হয় বোঝে যুক্তিতথ্য, নয় বোঝে মদ; সেকালে মদ খাইয়ে ভোট আদায় করা হতো, একালে ও সব উঠে গেছে, তাই যুক্তিতথ্যকে এমন কৌশলে পরিবেশন করতে হয় যাতে শ্রোতার বা পাঠকের নেশা ধরবে। Statisticsএর মারপ্যাচে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে

মিথ্যা করতে না জানলে ইংলণ্ডের ভবীকে ভুলানো যায় না। তাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা ব্যথা, কান্না পাওয়ানোর চেষ্টা হাস্যকর। বক্তারা তর্জন গর্জন বা বিলাপ প্রলাপের দিক দিয়েও যান না, তাঁরা নিপুণ ক্যানভাসারের মতো বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেন।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা-সম্পন্ন নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। গালাগালি সহ্য করা তো ভুচ্ছ কথা, কোনো মতেই তাঁরা মেজাজ হারাবেন না, বোফাঁস কথা ব'লে বসবেন না, তাঁদের ব্যক্তিগত মান অপমানের প্রতি ভূক্ষেপ করবেন না, তাঁদের একমাত্র ভাবনা তাঁদের দল কেমন ক'রে পুঙ্ক হবে। অথচ তাঁরা ভাড়াটে বক্তা নন; হয়তো পেশাদার বক্তাও নন; কেউ দুপুর বেলা মাটি কেটে এসেছেন, কেউ গাড়োয়ানী ক'রে এসেছেন, এখন চান দলের লোকের সাহায্য করতে। রাজনৈতিক দলাদলির ঠিক নিচে ধর্মনৈতিক দলাদলি। কিন্তু সব দলেই অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অসংখ্য দেখ্ছাসেবিকা আছে—তারা দলের জন্যে আর কিছু ত্যাগ করুক না করুক অন্ততঃ অনহিংসুড়টুকু ত্যাগ করেছে। তাদের দলের তালিকায় যদি একটাও নাম বাড়ে তবে বোধ করি তারা জ্বতোর মারও সহ্য করবে। মিশনারীরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে তারা ধর্মপ্রচার করেনি, এমন ভাষা নেই যে ভাষার বর্ণমালা না থাকলেও যে ভাষায় তারা বাইবেল ছাপায়নি। এই অসাধারণ উদ্যোগিতা এদের জাতিগত। ভোট দেবার অধিকার লাভ করবার জন্যে এদের মেয়েরা পঞ্চাশ বছর ধ'রে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে—কী অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন খেটে এসেছে! জনকয়েকের প্রচেষ্টা ক্রমশঃ লক্ষ লক্ষ জনের হলো, তারপরে জয়। কিন্তু ঐটুকুতে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা খ্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব বিষয়ে সমান অধিকারী করবে, তার আগে থামবে না। এখন তাদের যুদ্ধ চলেছে খ্রীপুরুষকে সমান খাটুনির বিনিময়ে সমান মজুরি দেওয়া নিয়ে, বিবাহিতা নারীকে বিবাহিত পুরুষের মতো চাকরি করতে দেওয়া নিয়ে, সব রকম জীবিকায় খ্রীপুরুষকে সমান শর্তে স্থান দেওয়া নিয়ে। এদের শ্রমিকরাও এমনি নাছোড়বান্দা প্রকৃতির যোদ্ধা। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তারা সর্বস্বণ সচেষ্ট। আমাদের শ্রমিকদের এখন যে অবস্থা, এদের শ্রমিকদেরও এক শতাব্দী আগে সেই অবস্থা ছিল। কিন্তু তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে সামান্য জমিভ্রমাকে শতভাগ ক'রে মাস্তাতার আমলের চরকাখানাকে শতবার ঘুরিয়ে ফল পেল না, কলকারখানার কাছে Slum তৈরি ক'রে ঐখানেই জেদ ক'রে প'ড়ে রইল, এবং জেদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। এখনো তাদের অবস্থার যেটুকু উন্নতি হয়েছে সেটুকু তাদের মনঃপূত নয়, তাই তাদের লড়াই থামছে না, তারা সব বিষয়ে ধনিকদের মতো না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাবেই। ধনিকরাও চুপ ক'রে ব'সে থাকেনি, এরা ডালে ডালে চলে তো ওরা পাতায় পাতায় চলে, সুতরাং লড়াই কোনো কালে থামবার নয়।

লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে। তাই বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়। সেটা তাদের শৌখিন বাচালতা নয়, সেজন্য তারা কারুর হাততালির আশা রাখে না, কেউ না শুনলেও তারা রণে ভদ্র দেয় না, যে পর্যন্ত একটিও শ্রোতা থাকে সে পর্যন্ত তাদের বক্তৃতা চলতে থাকে, বরং তখনই তাদের বক্তৃতা জোরালো হয়। আমাদের দেশে মাত্র দুটি শ্রেণীর লোককে আমি এমন নাছোড়বান্দা হতে দেখেছি—পাণ্ডা আর ঘটক। অভিমান কাকে বলে কেবল এই দুই শ্রেণীর লোক জানে না; বাকি সকলেই অল্প-বিস্তার অভিমানী। কিন্তু ইংলণ্ডে পরের উপর মান করলে ঘরের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তাই অভিমান কথাটা ইংরেজী ভাষায় নেই। এতে ইংরেজী ভাষার ক্ষতি হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু ইংরেজ জাতটার বুদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার সর্বত্র জাহাজ না পাঠালে ইংলণ্ডকে প্রায়োপবেশন মরতে হয়, সুতরাং ইংলণ্ডকে দুনিয়ার সকলের দ্বারে ধাক্কা দিতেই হয়—'Knock and it shall be opened unto you.' এমনি ক'রে ইংলণ্ড আমেরিকার অস্ট্রেলিয়ার আফ্রিকার বহু

দুয়ার খুলল, ভারতবর্ষকেও ঘুমাতে দিল না।

যে কারণে ইংলণ্ডকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফিরতে হয় সেই কারণে ইংলণ্ডের লোককে ঘরের ভাঙারে ভাগ বসাবার চেষ্টা করতে হয়। পার্লামেন্টের হাতে ভাঙারের চাবি। চাবিটার জন্যে দিনরাত লড়াই। এক মুহূর্ত ঢিলে দিলে সর্বনাশ। চাবিটা যাদের হাতে আছে তাদের যেমন ভাবনা, চাবিটা যাদের হাতে নেই তাদেরো তেমনি ভাবনা। আমাদের দেশে রাজনীতিককে লোকে জীবনমরণের ব্যাপার বলে ভাবতে শেখেনি; আমাদের কাজের লোকেদের শেষ জীবন কাটে কানীতে বন্দাবনে; রাজনীতি চর্চটা এখনো আমাদের চোখে দেশের প্রতি একটা অনুগ্রহ; সে অনুগ্রহটুকু যাঁরা করেন তাঁরা একলক্ষ্যে দেশপূজ্য। এ দেশে কিন্তু ওটা ধর্মচর্চার মতো অবশ্যকরণীয় ব্যাপার; যাঁরা করেন তাঁরা নিজের বা নিজের দলের বা নিজের দেশের গরজে করেন; সেজন্যে বাহবা পাবার কথাই ওঠে না; দেশপূজ্য হওয়া দূরে থাক দেশের কাজে লাঞ্ছনা পাওয়াটাই ঘটে। লয়েড জর্জ কানী-বন্দাবনে না গিয়ে পার্লামেন্টে যান—সে জন্যে তাঁকে ছেড়ে কথা কইতে হবে কেন? তাঁর পূণ্যার্জনের লোভ আছে; তাই তিনি ভারতবর্ষ হ'লে কানী যেতেন, ইংলণ্ড ব'লে পার্লামেন্টে গেলেন; লোকে যেমন কানীবাসীকে ছেড়ে কথা কয় না, পার্লামেন্টবাসীকেও ছেড়ে কথা কয় না। বলডুইন দেশের জন্যে ত্যাগ বড় কম করেননি, ইংলণ্ডের আদর্শে সে ত্যাগ চিত্তরঞ্জন করে চেয়ে ছোট নয়। তবু তাঁকে তচ্ছিল্য করতে রাস্তার টম্ ডিক্-ও পশ্চাৎপদ নয়। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তাকে রক্ষা করলেন—অথচ তাঁকে ঠাট্টা করা ও ক্ষ্যাপানো এখনকার একটা ফ্যাশান।

ইংলণ্ড দিনকের দিন যতই গণতান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার মহাপুরুষ-ভীতি বাড়ছে। মাঝারি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ ক্রমশঃই ইংলণ্ডের মাটিতে অসম্ভব হ'য়ে আসছে। একজন ক্রমওয়েল্কে বা একজন মুসোলিনিকে ইংলণ্ড দু'চক্ষে দেখতে পারবে না। এমন কি একজন পীল্বে বা ব্লাডস্টোনকেও না। ইংলণ্ডের মতো অতি স্বাধীন দেশে কোনো মানুষই যথেষ্ট স্বাধীন নয়। হাজারো আইন কানুন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দশজনের একটা mass suggestion আছে, সমাজের দশজন চায় না যে তাদের মধ্যে কোনো একজন সর্বস্বা হোক কিংবা বাধি ন'জনের চেয়ে মাথায় উঁচু হোক। গণতন্ত্রের আন্তরিক ইচ্ছা, কেউ বামন হবে না কেউ দৈত্য হবে না, সবাই প্রমাণ সাইজ হবে। তাই ইংলণ্ডের মহাপুরুষরা, কেবল রাজনীতিতে নয়, কোনো বিষয়েই আকাশস্পর্শী হচ্ছেন না। সাহিত্য ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর ব্রাউনিং টেনিসন কার্লাইল ডিকেন্সে দোসর দেখা যাচ্ছে না, বিজ্ঞানেও কোনো একজন লোক ডার্বাইনের মতো অতি অসাধারণ নন অথচ মাঝারি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিজ্ঞেরা গত শতাব্দীতে চেয়ে এ শতাব্দীতে সংখ্যা অধিক ও উৎকর্ষে বড়। তাঁরা লোকের নিন্দা প্রশংসা পাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা বা বিশেষ অশ্রদ্ধ পাবার মতো মহান তাঁরা নন। তাঁদের নিয়ে এক-একটা school দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য school-এর সঙ্গে মাথা ফাটাফাটি বাধছে এমন নয়। গণতন্ত্রের দেশের জনসাধারণ কোতে একজনকে অসাধারণ হ'তে দেয় না। আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার চেয়েও ইংলণ্ডের গণতন্ত্র খাঁটি সেইজন্যে ইংলণ্ডে একটি ফোর্ড বা আনাডোল ফ্রাঁস বা লেনিন সম্ভব হয় না।

তবে এটা কেবল ইংলণ্ডের নয়, এ যুগের সব দেশের অবশ্যস্বাভাবী দুর্ভাগ্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে মহাপুরুষের খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সব সুখ, কেবল ঐ একটি দুঃখ। গণতন্ত্র সকলকে সমা করতে চায়, কাউকে অসমান করতে চায় না। আগে ছিল ভোটের সাম্য, এখন আসছে মজুরি সাম্য, তারপর আসবে মাথার সাম্য। ইকুল নাস্টারের সাহায্যে সকলের মাথাকে সমান শক্তিবিশি

না করলে বুদ্ধির জোরে গোটাকয়েক লোক বাকি সকলের চেয়ে সুবিধা ক'রে নিতে পারে। এখন থেকেই কোনো কোনো লোক স্টেট সোশ্যালিজমের বিকল্পে এই ব'লে আপত্তি করছে যে, সকলকে যদি সব বিষয়ে সমান সুযোগ দেওয়া হয় তবে তাদের মধ্যে যারা ইহুদীবংশীয় তারা ই বুদ্ধির জোরে বড় বড় পদগুলো দখল করবে ও বাকী সকলের উপরে সর্দারি করবে। সব সইতে রাজি আছি, কিন্তু ইহুদীর কর্তৃত্ব! কিন্তু ইহুদীকে কোনো বিষয়ে কোনো সুযোগ না দিলেও কি তাকে দাবিয়ে রাখা যায়? ইহুদী যে সোবার মতো, তাকে সমুদ্রের তলে পাথর চাপা দিলেও সে ভাসবেই। ইউরোপ আমেরিকার এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে ইহুদীকে হাজার দাবিয়ে রাখলেও সে উপরে ওঠেনি? ভারী কালের গণতন্ত্র রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র মুড়ি মিছরি—সকলেরি একদর হবে, কিন্তু কতগুলো লোক যদি বেশি বুদ্ধিমান হয় তারা তো বেশি সুবিধা ক'রে নেবেই—তারা ইহুদী বা আর যাই হোক না কেন। শেষকালে তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বংশধরদের মাথা সমান করতে হবে। রাশিয়ার মানুষের মাথাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা ক'রে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কিন্তু উৎকর্ষের তারতম্য থেকে গেলে তম-প্রত্যাস্ত মাথাগুলো তর-প্রত্যাস্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইবে না কি?

এমন কথাও আজকাল শুনতে হয় যে আটকে সকলের হাতে পৌছে দিতে হবে, দর্শনকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে, সব শাস্ত্রের অ-আ-ক-খ সকলের জানা চাই, সকলেই একখানা ক'রে মোটর গাড়ি পাবে, সকলের মাথায় bowler hat না থাকলে সর্বমানবের ঐক্যবোধ হবে না, সকলের গায়ে কটিবস্ত্র না থাকলে ভারতবর্ষের মধ্যে ধনী দরিদ্র ভেদ থেকে যাবে। গণতন্ত্রের যুগের যতগুলি প্রোফেট সকলেই সাম্যবাদী এবং সাম্য বললে এ যুগে বোঝায় বহিঃসাম্য। গান্ধী লেনিন ফের্ড বার্নার্ড শ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউটোপিয়ায় সব মানুষকে সমান বানাতে চান। কিন্তু সব মানুষ কি আত্মীয় সমান নয়—কোনো দিন সমান ছিল না? সব মানুষ কি দেহে মনে সমান হতে পারে—কোনো দিন সমান হবে? অতীতে আমরা অধিকারী ভেদের উপরে বড় বেশি জোর দিয়েছিলুম, বর্তমানে আমরা অধিকারী সাম্যের উপরে বড় বেশি জোর দিচ্ছি। সেইজন্যে আমাদের মধ্যে যারা আর্টিস্ট তাঁরা ভাবছেন, যে আর্ট জনকয়েক সমঝদারের মধ্যে নিবদ্ধ সে আর্ট একটা মহার্য বিলাসিতা, আর্টকে জনসাধারণের যোগ্য করতে গিয়ে দুধের সঙ্গে ডল মেশাতে হবে। যারা উদ্ভাবক তাঁরা এমন মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করতেই ব্যস্ত যে মোটর গাড়ি সব চেয়ে সস্তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো হবে, তা নইলে বেশি-লোকে মোটর কেনবার সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। যারা শিক্ষাতত্ত্ব তাঁদের ইচ্ছা শিক্ষাকে এমন সুকর করা হয় যাতে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্বল্পতম সময়ে বহু বিষয়ে শিক্ষিত হ'য়ে উঠতে পারবে। ইংলণ্ডে দেখছি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক শ্রেণীর বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। 'Children, do you know?' এই হলো প্রশ্ন। এর উত্তর বইয়ের পাতায়। কে সর্বপ্রথম কিনিমাঞ্জারো পাহাড়ের চূড়ায় হাতী দেখেছিল, কোথায় গাছের ডালে বিহানা পেতে মানুষে শোয়, কোন্ তারাটার আলো পৃথিবীতে পৌছতে ঠিক বারো বছর এগারো মাস ঊনত্রিশ দিন তেইশ ঘণ্টা লাগে—এমনি সব উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর না জেনে রাখলে ভদ্র সমাজে বোচার শিও পণ্ডিত ব'লে মুখ দেখাতে পারবে না, প্রতি প্রশ্নে অপদহ হবে।

সব জিনিস যে সম্প্রদেয় জানতেই হবে পেতেই হবে করতেই হবে এইটে আমাদের যুগের কুসংস্কার। এরি উৎপাত আমরা গভীরতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রসারের দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছি বেশি। একটা তাজমহল সৃষ্টি না ক'রে এক লাখ বাসগৃহ তৈরি করছি। একটি যীশুর জন্যে প্রস্তুত না হ'য়ে নহস্ নহস্ পাত্রী প্রস্তুত করছি। Mass production-এর পেছনেও এই মনোভাব। দু' একজন কোর্টপতির ভোগের জন্যে নির্মিত একটি ময়ূর সিংহাসন এ যুগে অসম্ভব, এ যুগের শিল্পীদের চোখ

public-এর ভোগযোগ্য একরাশ এক প্যাটার্নে তৈরি লোহার বেঞ্চির উপরে, যে বেঞ্চিতে ব'সে একজন কয়লাফেরিওয়াল। এক পেনী দামের Daily Mail পড়তে পড়তে বিশ্রাম করবে। রাশিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো এখন নাকি ওদামঘরে পরিণত হয়েছে, Versailles-এর রাজনগর এখন একটা চিত্র প্রদর্শনী। আভিজাত্যের ভাটটা পর্যন্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যারা লোপ পেতে দিচ্ছে তারা আর কেউ নয়, অভিজাতেরা স্বয়ং। রুমেনিয়ার রাণী এক পেনী দামের খবরের কাগজের জন্যে নিজের ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনী লিখে প্রচুর টাকা পান, তবে তাঁর ঠাট বজায় রয়! লর্ডেরাও কেউ মদ বিক্রি ক'রে লক্ষপতি হবার পরে লর্ড পদবী পেয়েছেন। কেউ জাহাজের খালানীপিরি করবার পরে ওকালতিতে উন্নতি ক'রে লর্ড পদবী পেয়েছেন। ইংলণ্ডে তবু নামমাত্র একটা লর্ড শ্রেণী আছে, ফ্রান্স জার্মানী প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়ারাই সর্বোচ্চ শ্রেণী এবং রাশিয়াতে সে শ্রেণীও নেই।

একদিন মানুষ প্রাণপণে যা চায় আরেকদিন যখন হাতের মুঠায় তা পায় তখন ভাববার সময় আসে যা পেলুম সত্যিই কি তা এতই ভালো যে এর জন্যে যা হাতে ছিল তাকে ছাড়লুম! ইউরোপের কেউ কেউ এখন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, গণতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্রের চেয়ে সত্যিই ভালো? লাখ লাখ মাঝারি মানুষ কি এক আধজন মহাপুরুষের চেয়ে সত্যিই কামা? The greatest good of the greatest number কি প্রতি মানুষকে একটি ক'রে ভোট ও একশো টাকা ক'রে মাইনে দিলে হয়? খাওয়া পরার কষ্ট ও পরাধীনতার কষ্ট অতি অসহ্য কষ্ট—কিন্তু এ কষ্ট দূর করলেও কি সব চেয়ে বড় কষ্টটা থাকবে না? সব চেয়ে বড় কষ্ট অভিজাতের অভাব, কোয়ালিটির অভাব। দু'একটি মানুষ যদি বাকী সকলের চেয়ে অত্যন্ত বেশি বড় হয় তবে সেই অত্যন্ত বেশি বড় হওয়াটা কি বাকী সকলের পক্ষে greatest good নয়? ক্যাপিটালিজমের পেছনেও একপ্রকার আভিজাত্য ছিল। এক একজন ক্যাপিটালিস্ট যখন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা কাঁদেন, প্রকাণ্ড একটা combine-এর কর্তা হন, তখন তাঁর সেই শ্রেষ্ঠতা কি মানব জাতির শ্রেষ্ঠতা নয়? কিন্তু ইংলণ্ডের মতো দেশে ক্যাপিটালিজমের দৌড় সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে, আমেরিকাতেও হ'য়ে আসবে। ক্যাপিটালিজম থামবেই কিন্তু যে-বুদ্ধিবলের আভিজাত্য ক্যাপিটালিজমের পেছনে সেই আভিজাত্যও যদি সেই সঙ্গে থানে তবে তাতে মানুষের লাভ বেশি না, ক্ষতি বেশি?

আমেরিকার স্বাধীনতা ফ্রান্সের বিপ্লব ও ইংলণ্ডের যান্ত্রিকতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যে সাম্যবাদ জড়িত ছিল সে সাম্যবাদ সমস্ত পৃথিবীকে সমতল না ক'রে ছাড়বে না। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যে সে ইউরোপ আমেরিকাকে একাকার ক'রে তুলেছে। এখন এক স্থানে ব'সেই দেশভ্রমণের ফল পাওয়া যায়। ইতর ভদ্র শূদ্র ব্রাহ্মণ শ্রমিক ধনিক প্রজা রাজা নারী নর তরুণ প্রবীণ সকলকেই এক নেশায় পেয়েছে—পরস্পরের সঙ্গে সমান হতে হবে। এ যুগের একমাত্র বিরোধী সুর কেবল নীটশে! কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁর পরুর কণ্ঠকে যথেষ্ট ললিত করতে লেগেছেন, তা নইলে ডেমক্রেসীসীর কর্ণপট্টে ব্যাথা লাগবে। আসল কথা বৈষম্যবাদের সবে শুরু হচ্ছে। অসম পুরুষকে ঠিক মতো কল্পনা করতে পারা যাচ্ছে না। কল্পনা ক'রেও কোনো ফল নেই। তিনি যখন আসবেন তখন আপনি আসবেন, তাঁকে বানাবার ভার যে বামনরা নিতে চায় তাদের সব কল্পনার চেয়ে তিনি বড়। তিনি এলে তাঁর সমাজের যে কেমন চেহারা হবে তার নকশা তৈরি করা এইচ. জি. ওয়েল্‌সেরও অসাধ্য।

সম্প্রতি এখানে air raid হয়ে গেল। একদল লোক এরোপ্লেনে লণ্ডন আক্রমণ করলে, আরেক দল লোক লণ্ডন রক্ষা করলে। যুদ্ধটা এমন নিঃশব্দে হলো যে খবরের কাগজ ছাড়া কোথাও রেশ রেখে গেল না। নিশ্চুকেরা বলছে আসল যুদ্ধ এত সহজ ব্যাপার নয় এবং যারা সত্যিই লণ্ডন আক্রমণ করবে তারা এই যাত্রার দলের যোদ্ধাদের রিহার্সেলের সুযোগ দেবে না।

ইংলণ্ডের মতো দেশে যুদ্ধ একটা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। যারা পেশাদার সৈনিক তারা ভারী যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত রয়েছে, যারা অব্যবসায়ী তারাও 'দরকার পড়লে সৈনিক হব' এই মনোভাব নিয়ে খাটছে ও খেলছে। এ ক্ষেত্রে বড়লোক ছোটলোক নেই, সব শ্রেণীর সব অবস্থার লোকের পক্ষে এটা সন্ধ্যাহিকের মতো আচরণীয়। পাঁচ বছরের ছেলের দলও মার্চ ক'রে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রায় চলে, বড়দের তো কথাই নেই। মেয়েরা তাদের নকল করে, উৎসাহ দেয়, এবং নিজেরা দল ক'রে যুদ্ধের আনুসঙ্গিক ক্রিয়াগুলোর জন্যে তৈরি হয়। আহতদের গুহাঘার ভার তো মেয়েদের উপরে। আকাশ-যোদ্ধাদের মধ্যে মেয়েও আছে।

সামরিক সংস্কার এদের আবালবৃদ্ধবনিতার মজাগত। পরিবারের দু'টি একটি ছেলে যুদ্ধকে তাদের জীবিকা করবেই, একথা প্রত্যেক পিতা মাতা একরকম ধরেই রাখেন, এবং পরিবারের দু'টি একটি মেয়ে সৈনিককে বিবাহ ক'রে বিধবা হ'লেও হ'তে পারে, এও পিতা মাতার দূরদৃষ্টির বাইরে নয়। একানবর্তী পরিবার এ দেশে নেই, ছেলে বড় হ'লে ঘর ছেড়ে যায়, তার উপরে বাপ মায়ের দাবী নগণ্য। সুতরাং ছেলে যদি যুদ্ধে প্রাণ হারায় তবে বাপ মায়ের শোক যত বড়ই হোক অস্বিধা অপ্রত্যাশিত হয় না। একানবর্তী-পরিবার-প্রথা না থাকায় এ দেশের যুবকদের পক্ষে দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের তুলনায় সহজ। বিধবাবিবাহও এ দেশে নিষিদ্ধ নয়, সুতরাং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্ত্রীর শোক যত বড়ই হোক, আশার স্ত্রীণ রশ্মি থাকে। সেই জন্যে হয় প্রাণ দিতে, নয় যশস্বী হ'তে, এদের স্ত্রীরা যেমন এদের যুদ্ধে ঠেলে, আমাদের স্ত্রীরা তেমনি আমাদের যুদ্ধে দূরের কথা, বিদেশে যেতেও ঠেলে না; অধিকন্তু বাধা দেয়। যখন সহমরণ প্রথা ছিল তখন স্ত্রীর আনুকূল্য পাওয়া দুষ্কর ছিল না; কেননা বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিচ্ছৃতির উপায় ছিল; এবং পুনর্মিলনের আশাও ছিল নিকট।

আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে দেহময়ী এমন মনে করলে দেশকাল-নিরপেক্ষ নারীপ্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহাঙ্ক, তারা আমাদের 'রেখেছে বাঙালী ক'রে, মানুষ করেনি।' কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হতভাগিনীদের আমরা 'পথি বিবর্জিতা' ক'রে সম্মানী হ'য়ে যাওয়াটাকেই মনে কঁরি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সম্মানী হ'য়ে যাই, তখন কুলবনিতায় বারবনিতায় ভেদ রাখিনে, এক নিঃশ্বাসে ব'লে যাই নারী কালভূজসিনী কামিনী, কাঙ্ক্ষনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক! ইউরোপের উপরে যে খ্রীস্টিয়ানিটি নামক সম্মানীশাসিত ধর্মমতটি চাপানো হয়েছে সেটিও সম্ভবতঃ বৃহৎ-পরিবার-কন্টকিত কাঁটা গাছের ফল। কিন্তু খ্রীস্টিয়ানিটি তো ইউরোপের সত্যিকার ধর্ম নয়, সরকারী ধর্ম; তাই চার্চের কর্তারাও স্টেটের কর্তাদের মতো যুদ্ধ বিগ্রহে পাণ্ডার কাজ ক'রে থাকেন; এমন কি ফরাসী যাজকরা

উঁচুদের ডিপ্লম্যাট ও পূর্তগীজ যাজকরা উঁচুদের ব্যবসাদারও হ'য়ে থাকেন। এই যে এখন যুদ্ধ নিবারণের প্রচেষ্টা চলছে, এতে চার্চের নেতৃত্ব নেই, এবং যেটুকু যোগ আছে সেটুকু চার্চভুক্ত জনকয়েক ব্যক্তিবিশেষের।

ইংলণ্ডে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যে কারণে বাড়ছে সে কারণটা ইংলণ্ডের বার্ষিক্যের লক্ষণ কি না বলা যায় না। শান্তিবাদীদের দলে যাদের নাম দেখি তাঁরা সাধারণতঃ বর্ষীয়ান এবং তাঁদের ভাবনা এই যে, আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়াকে যদি একটুও প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে ভাবী যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হ'য়ে যাবে। এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুঁড়ে এত শতাব্দীর এত বড় লণ্ডন শহরটাকে একদিনেই শ্মশান ক'রে দেওয়া সম্ভব। মানুষ যত সহজে ধ্বংস করতে শিখেছে তত সহজে নির্মাণ করতে শেখেনি। একটা যুদ্ধের ক্ষতি পূরণে নিতে কত বৎসর চলে যায়। আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়া এমন মারাত্মক যে, যে-সব দেশ যুদ্ধে যোগ দেবে না সে-সব দেশেও মহামারী পৌছাতে পারবে। এবং এক দেশের বিধে সব দেশ জর্জর হ'তে পারবে। এক জাতির ক্ষতিতে সব জাতির ক্ষয়, এটা যে কত বড় সত্য তা মানুষ এতকাল বুঝত না, এখন বুঝছে। কিন্তু বুঝলে কি হয়, বুদ্ধি তো মানুষের সব নয়, প্রবৃত্তি যে তার বুদ্ধির অবাধ্য। 'জানাম্যদর্শনং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।' গত মহাযুদ্ধে যে শিক্ষাটা হলো, সে শিক্ষা ইতিমধ্যেই বাসি হ'য়ে গেছে। আর কয়েক বছরেই নতুন জেনারেশন রাজত্ব করবে; নবীন চিরদিনই বেপরোয়া; শৈশবের যুদ্ধস্মৃতি সৌন্দর্যে মিলিয়ে যাবে; তখন চলবে নতুন যুদ্ধে নতুন কীর্তির আয়োজন। সে আয়োজনে তরুণকে প্রেরণা দেবে তরুণী; সে তার কানে কানে বলবে, 'None but the brave deserves the fair'; অর্জুনের রথে সারথি হবে সুভদ্রা। তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; তারপরে পতিপুত্রহীনাদের নারীপর্ব; তারপরে আবার নতুন বংশ নতুন পুরুষ নতুন সৃষ্টি।

বৈচে থেকে মানুষ করবে কি? মানুষ যে কঠিন কিছু না করতে পারলে জড় হ'য়ে যায়, ভীর্ণ হ'য়ে যায়। যুদ্ধ মানুষ হাজার হাজার বছর ক'রে আসছে শুধু কঠিন কিছু না ক'রে তার শান্তি নেই ব'লে। যুদ্ধহীন জগতের শান্তির মতো অশান্তি তার পক্ষে আর নেই। মানুষ যে মানুষকে হিংসাই করে এটা মিথ্যা, সূতরাং 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' মানুষের পরম ধর্ম নয়। মানুষ আঘাত করতে ও আঘাত পেতে ভালোবাসে, কারণ মানুষ প্রেমিক। তার প্রেমে আঘাত আছে অবহেলা নেই; অহিংসা তো অবহেলারই নামান্তর। আমি তোমাকে অহিংসা করি বললে তোমার প্রতি কিছুই করা হয় না, না ভালো না মন্দ। অহিংসা হচ্ছে একলা মানুষের নিষ্ক্রিয় মানুষের ধর্ম, সে মানুষ অসহযোগী বটে। তেমন মানুষের সমাজে বাস ক'রে আনন্দ নেই। আমরা চাই দু'টো মারতে দু'টো মার খেতে, আমরা রাগীও বটে অনুরাগীও বটে, কিন্তু রক্ষা করো, আমরা বৈরাগী নই।

আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়ায় মানুষকে কি মানুষের নিকট ক'রে তোলেনি? মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলানি? অধিকাংশ মানুষ দেশের বাইরে যাবার সুযোগ পায় না, প্রধানত আর্থিক কারণে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তারা যখন বিদেশ অভিযান করে তখন বিদেশকে জানবার সুযোগ পায়, বিদেশীকেও জানে। গত মহাযুদ্ধে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজ প্রথমবার জার্মান সংস্পর্শে এসে জার্মান জাতিকে জানল, তার ফলে এখন জার্মানীর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের কত! গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স থেকে যাঁরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো লেখায় পড়লুম, জীবন মরণের সন্ধিক্ষণেই দুই যোদ্ধা বাঁধে যে তারা দু'জনেই মানুষ; তাদের দু'জনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। কিসের এক অবোধ্য প্রেরণায় তাদের এক ক্ষেত্রে মিলিয়েছে; অমূল্য এ মিলন, কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে জীবন দান ক'রে। মিলন মাঝেই বিরোগাশু!

ভাবী যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী মহামারীতে মানুষকে আরেকটুখানি মিলাবে। অকথ্য লোকসান দিয়ে



মানুষ জানবে যে, সকলেরই হান এক নৌকায়। ভারতবর্ষের লোক রূপের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখে গেছে পৃথিবীটা নেহাৎ ছোট, ইনফ্রুয়েঞ্জার ভূগে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর এক কোণের ছোঁয়াচ আরেক কোণে পৌঁছায়। গত মহাযুদ্ধের পর সকলেই অল্পাধিক বুঝেছে যে, জেলায় জেলায় যুদ্ধ যেমন জাতিবিরোধ দেশে দেশে যুদ্ধও তেমনি জাতিবিরোধ। সেদিন এক গির্জার দ্বারে লিখেছে 'Duelling is illegal. War is the duel between nations. Why not make it illegal by taking your national quarrel to an international court of justice?'

এ দেশের 'লীগ অব নেশনস ইউনিয়ন' যুদ্ধনিবারণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। নানাদেশের নানা জাতির মানুষের যাতে দেখাওনা আলাপ পরিচয় হয় সে চেষ্টারও বিরাম নেই। ভাবী যুদ্ধ যদি নিকট ভবিষ্যতে ঘটে তবে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আশ্রয়স্থান গুরুতর কারণ না দেখলে যুদ্ধে নামতে চাইবে কি না সন্দেহ। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটে তবে বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিই প্রবল হবে বোধ হয়। পৃথিবীকে এক রাষ্ট্রে পরিণত না করা অবধি যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। শুধু এক রাষ্ট্র নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শুধু গণতান্ত্রিক নয়, ধনসাম্যমূলক। রেল স্ট্রীমার যেমন কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ দিল্লীকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর ক'রে ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্র করেছে, এরোপ্লেন তেমনি নিউইয়র্ক লণ্ডন কায়রো সিঙ্গাপুর টোকিওকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর না করা অবধি পৃথিবীব্যাপী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার আশা নেই। তবে ইউরোপ যে তাড়াতাড়ি এক রাষ্ট্র হ'য়ে উঠছে এর সন্দেহ নেই। 'United States of Europe' আর বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বছর।

যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যুদ্ধেরই মতো কঠিন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে। নতুন মৃত্যু-সংখ্যা কমানোর জন্যেই যদি যুদ্ধ তুলে দিতে হয়, তবে বৃদ্ধির সংখ্যা বেড়ে যাবে; সমগ্র পৃথিবীটাই একটা ভারতবর্ষ হ'য়ে উঠবে, যেখানে যযাতির রাজত্ব হাজার কয়েক বছর থেকে চ'লে আসছে। তখন পৃথিবীময় 'পিতা স্বর্গ' ও 'জননী স্বর্গাদপি'র জ্বালায় মাথাটা ভক্তিতে এমন নুয়ে আসবে যে মেরুদণ্ড যাবে বঁকে, এবং পিঠের উপর চেপে বসবেন পতিব্রতের দল। ইউরোপেরও যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে পৃথিবীর কোথাও বাস ক'রে শান্তি থাকবে না, সর্বত্রই এত শান্তি! যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যৌবনের পক্ষে সে বড় দুর্দিন। ভাবুকরা বলছেন প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যাবে, ভয় নেই। এই যেমন Olympic games। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এমন কিছু চাই যা আরো বিপজ্জনক, আরো প্রাণান্তক। সমাজকে অতীতকালের মতো ভাবীকালেও প্রচুর প্রাণক্ষয় ক'রে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হবে; সমাজের বাজেটে লোকসানের ঘরের অল্প চিরকাল সমান বিপুল হওয়া চাই। ইতিহাসে এই দেখা গেছে যে, কোটি প্রাণীর তপস্যায় কয়েকটি প্রাণী সিন্ধিলাভ করেছে, অভিব্যক্তির ইতিহাসে যোগ্যতমেরই উদ্ধর্তন। যে মানুষ সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে যোগ্যতম, সে মানুষকে সহজ পথ দেখিয়ে মানবজাতি লাভবান হবে না।

যুদ্ধকে অনাবশ্যক ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তো ভালোই, কিন্তু ক্ষতিকর ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে ক্ষতি স্বীকার করবার মতো ক্ষমতা মানবজাতির নেই। সে ক্ষমতা বর্বরের ছিল, কেননা বর্বরের প্রাণশক্তি ছিল প্রভূত। সভ্যতা যদি মানবের প্রাণশক্তি হরণ ক'রে থাকে তবে সভ্যতার পক্ষে সেটা ভয়ের কথা! বর্বরতার শক্ত বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সভ্যতার পাকা দালানে ফাটল দেখা দেয়। মানবের মধ্যে যে পণ্ড আছে তাকে দুর্বল করলে মানব দুর্বলই হয়। বহুকাল মানবকে মনে করা হয়েছে পণ্ড থেকে স্বতন্ত্র একটা সৃষ্টি, একেবারে ভুঁইফোড়। সভ্য মানবকে মনে করা হয়েছে বর্বর থেকে স্বতন্ত্র একটা জাতি, পূর্বপুরুষহীন। কৌলীন্যের পেছনে যেন সাক্ষর নেই, আভিজাত্যের পেছনে যেন ভারজতা নেই, পক্ষের পেছনে যেন পাক নেই! আসলে কিন্তু পাকই হচ্ছে সার, সে না থাকলে জলের পদ্ম হতো কাগড়ের পদ্ম। বহুকাল থেকে

আমরা বর্বরতার তেজ হারিয়ে সভ্যতার আলো নিয়ে খেলা ক'রে এসেছি, তৈমুরের ভোঁতা তরোয়ালে শান দিয়ে তাকে দাড়ি চাঁচবার ক্ষুর বানিয়েছি, জীবনের মোটা কথাগুলোর সূত্র হারিয়ে সূক্ষ্ম ভব্দের জট পাকিয়েছি।

সেই জন্যে দেখি আমাদের যুগে আদিম যুগের সঙ্গে অবয়বরক্ষার চেঁটা; কেউ বলছে 'back to the village'; কেউ বলছে 'back to the forest'; কেউ বলছে বর্বরের মতো দিগন্তের হও; কেউ বলছে পশুর মতো আকাশের তলে ঘাসের উপরে খাও-শাও। এ সবের তাৎপৰ্য এই যে, আমরা আদিম প্রাণীর জোর হারিয়েছি, আপনার গাঁথা জালে জড়িয়েছি। অতি বুদ্ধির নাকে দড়ি; সেই হয়েছে সভা মানবের দশা। যুদ্ধ দোষের নয়, দোষের হচ্ছে কুটনীতি, গুপ্তচরবৃত্তি, বিষবায়ু-প্রয়োগ, ব্যাধিবীজনিষ্ক্ষেপ ইত্যাদি কৌরবসুলভ কুকার্য। মানুষ ধর্মযুদ্ধ ভালোবাসে, যে যুদ্ধে তার গুণগুলোর পরিচয় দিয়ে সে তৃপ্তি পায় মরণেও। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের বারো আনাই যে মিথ্যাগ্রচার, কাগজে কাগজে যুদ্ধ। অসির চেয়ে মসীর উপদ্রব বেশি। আধুনিক যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণে মরে তার বেশি মানুষ আত্মায় মরে,—এইখানেই অধর্ম, যুদ্ধে অধর্ম নেই।

যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার পরীক্ষা। যুদ্ধের চেয়ে সহজ উপলক্ষ্য চাইনে, যুদ্ধের পরিবর্তে অন্যবিধ উপলক্ষ্যে আপত্তি নেই। কিন্তু সে উপলক্ষ্য যেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত রাখে, সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে প্রত্যেককে ভ'রে দেয়। যুদ্ধনিবারণী প্রচেষ্টার যাঁরা নায়ক তাঁরা যুদ্ধের বদলে করবার কী আছে তা বলেননি, শুধু বলছেন, 'যুদ্ধ কোরো না'; হাঁ-মন্ত্র না দিয়ে দিচ্ছেন না-মন্ত্র; 'Thou shalt' না ব'লে বলছেন 'Thou shalt not'। যুবকের প্রাণ ভাবের বদলে অভাবে ভ'রে ওঠে না, যুবক চায় positive commandment। যুদ্ধের বদলে সালিশি করা তরুণের কাছ নয় এবং যুদ্ধের বদলে পুলিশি ক'রেও তরুণের তৃপ্তি নেই। তাই শান্তিবাদীদের আবেদন তরুণের বুক গোলায় না। এখন যদি কেউ এসে বলতেন 'তোমরা প্রেমের অভিযানে জগতের হৃদয় জিনে লও' তবে সেও হতো এক রকম যুদ্ধ, তাতে দুঃখ কিছুমাত্র কম হতো না, মরণাধিক বেদনা থাকতো। সে যুদ্ধে স্বার্থপরতার প্রানি ও মিথ্যাভাষণের পাপ চাপা পড়ত এবং ভীড়তার স্থান থাকতো না। সে যুদ্ধে বর্বরকে ঘৃণা ক'রে তার অবদান হ'তে সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হতো না; পশুকে অবহেলা ক'রে তার সংস্পর্শ হ'তে মানুষকে দূরে রাখা হতো না। যে ডাক গুচিবাতিকগ্রস্তের নয়, নীতিবাতিকগ্রস্তের নয়, অহিংসাবাতিকগ্রস্তের নয়, প্রেমিকের,—সেই ডাকের প্রতীক্ষায় আমাদের যুগ পদচারণ করছে।

## ॥ বারো ॥

বসন্ত যখন আসে তখন এমনি ক'রেই আসে। তখন ফুল যত ফোটে বুঁড়ি ব'রে যায় তার বেশি, যত ফুল সফল হয় তার বেশি ফুল হয় নিখল। 'বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের খেলা রে? দেখিস্ নে কি ঝরা ফুলের মরা ফুলের মেলা রে?' লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি; তবু অপরিসীম লাভ, সেই অপরিসীমতাকে বলি বসন্ত। জীবনের চেয়ে জরা ব্যাধি মৃত্যুই বেশি; তবু অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।

জার্মানীতে এসে দেখতে পাচ্ছি জাতির জীবনে বসন্ত এসেছে। জার্মানদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কিছুদিন আগে এরা যুদ্ধে হেরে সর্বস্বান্ত হয়েছে এবং এখনো এরা অংশত পরাধীন ও অভ্যস্ত ঋণগ্রস্ত। মুখে হাসি নেই এমন মানুষ আছে কিনা খোঁজ নিতে হয়, এবং সকলেরই স্বাস্থ্য অনবদ্য। অথচ যুদ্ধে এরা প্রত্যেকেই ধন জন হারিয়েছে এবং মার্কমুদ্রার পতনকালে এদের অধিকাংশের সর্বস্ব গেছে। কিন্তু সর্বস্ব গেলেও যদি যৌবন থাকে তবে সর্বস্ব ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। জার্মানীর লোক ধন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু যৌবন দেয়নি। তাই এমন অবিশ্রান্ত যৌবনচর্চা চলেছে ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে। যারা গেছে তাদের স্থান পূরণ করছে যারা এসেছে তারা, শিল্পে বিজ্ঞানে ক্রীড়ায় কৌতুকে নবীন জার্মানীর পরাক্রম দেখে মনে হয় না যে, প্রবীণ জার্মানী বেঁচে থাকলে এর বেশি পরাক্রমী হ'তে পারত।

বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ঝরাতে হয় লাখে লাখে, সমাজকে তেমন মানুষ খোয়াতে হয় লাখে লাখে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের শর্ত এই যে, প্রকৃতি আমাদের যা দেবে তা আমরা পালন করে ভোগ করব। আমাদের এক দলকে মরতে হবে আরেক দলকে বাঁচতে দেবার জন্যে। মৃত্যুর মধ্যে যে তত্ত্ব আছে সে আর কিছু নয়, সে এই—যারা জন্মায়নি তাদেরকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে যারা জন্মিয়েছে তারা মরবে। সমাজকে তাই হয় দুর্ভিক্ষের জন্যে, নয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়—দুর্ভিক্ষের মরা তিলে তিলে, যুদ্ধের মরা এক নিমেষে।\* দুর্ভিক্ষে যারা মরে তারা আগে থাকতে দুর্বল, তারা সাধারণতঃ বৃদ্ধ কিংবা শিশু কিংবা স্ত্রীলোক। আর যুদ্ধে যারা মরে তারা যুবা, সব চেয়ে বলবান, সব চেয়ে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। যে সমাজের যৌবন অক্ষুরন্ত সে সমাজ যুবাকেই মরতে পাঠায় যুবাকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে, সে সমাজ কোনোদিন যুবাব অভাব বোধ করে না। আর যে সমাজের যৌবন অল্প তার ব্যবস্থা অন্যরকম, সে সমাজের যৌবন শুকিয়ে শুকিয়ে লোলচর্ম হ'লে পরে তখন তার মৃত্যু আসে তখন এক স্থবিরের স্থান পূরণ করতে খুঁড়খুঁড় করে অগ্রসর হয় আরেক স্থবির। ঠাকুরদা মশায়ের পরে জ্যাঠা মশায়, তার পরে বাবা মশায়, তার পরে কাকা মশায়, তার পরে দাদা, তার পরে আমি। চুল না পাকলে রাজত্ব করবার অধিকার কাকুর নেই। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই বার্ষিক চর্চা করতে হয়।

কিন্তু ইউরোপে দেখছি বিপরীত ব্যাপার। যৌবন রক্ষা করবার জন্যে মহাস্থবিরেরা monkey gland-এর শরণ নিচ্ছেন, শ্রৌঢ় শ্রৌঢ়ারা বালক বালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি গায়ে খেলা জায়গায় সাঁতার কাটছেন, নৌকা চালাচ্ছেন, কঠিন কাঠের তক্তার উপরে প'ড়ে প'ড়ে মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে সিদ্ধ হচ্ছেন। এটাও একটা ফ্যাশান, কিন্তু ফ্যাশান তো weather cock-এর মতো দেখিয়ে দেয় বাতাস কোন দিক থেকে বইছে। যুদ্ধের আগে জার্মানীতে প্রত্যেক পুরুষকেই রণশিক্ষা করতে হতো। এখন তার উপায় নেই, কিন্তু সংস্কার যায় কোথায়? জার্মানদের বহুকলাগত আদর্শ—মানুষকে হ'তে হবে 'blood and iron'। পুরুষদের সঙ্গে এখন মেয়েরাও যোগ দিয়েছে, জাতীয় দুর্দশা স্মরণ করে কেউ তাদের বাধা দিতেও পারছে না। চার্চ একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল। ওরা বললে, অমন করলে চার্চ মানব না। তখন চার্চ হাল ছেড়ে দিলে। জার্মানদের মতো গোঁড়া খ্রীষ্টান জাতি নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে এ অন্যায় সহ্য করতে না।

যারা যুদ্ধে প্রাণ দেয় তারা দেশের সব চেয়ে প্রাণবান পুরুষ। যারা বেঁচে থাকে তারা

\* যে সমাজ দুর্ভিক্ষও চায় না যুদ্ধও চায় না সে সমাজের তৃতীয় পন্থা জন্মশাসন। গান্ধীমার্কী জন্মশাসনে দুর্ভিক্ষের ভাব আছে—অভ্যন্তরীণ শ্রাণের পক্ষে তা সম্ভাব্যতার মত। বটোপদমার্কী জন্মশাসনে যুদ্ধের ভাব আছে—অভ্যন্তরীণ শ্রাণের পক্ষে তা সম্ভাব্যতার মত। কিন্তু যে সমাজ না চায় দুর্ভিক্ষ না চায় যুদ্ধ না চায় কোনো প্রকার জন্মশাসন, সে সমাজের আকাল প্রকৃতির অসহ্য।

বালবৃদ্ধবনিতা। তবু তাদেরি ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টির উদ্গম যখন হয় তখন অবাক হ'য়ে দেখি এ সৃষ্টিও আগের মতো পরাক্রান্ত। তখন মনে হয় একে পরাক্রান্ত হবার সুযোগ দেবার জন্যেই আগের সৃষ্টিকে ধ্বংস হ'তে হলো। জীবনকে আমরা ব'লে থাকি লীলা, এরা ব'লে থাকে সংগ্রাম। একই কথা। কেননা লীলা যেমন নবনবোন্মেষ, সংগ্রামও তেমনি নতুন সৃষ্টির জন্যে পুরাতনের ধ্বংস। বহু শতাব্দী ধ'রে দেখা যাচ্ছে প্রতি জেনারেশনে ফ্রান্স একবার ক'রে নিঃস্রুতি হয়, তার বলবান পুরুষেরা প্রাণ দেয়, তার সুন্দরী নারীরা nun হ'য়ে যায়। তবু ভয়ের ভিতর থেকে আঙন জ্ব'লে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্তি পুরাতন ফ্রান্সের গৌরব স্নান ক'রে দেয়। 'হইলে হইতে পারি'ত' কথাটা অক্ষম দেশের পক্ষে প্রযুক্ত্য; ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফ্রান্স যা হ'য়েছে তাই এত আশ্চর্য যে, এই হওয়াটার খাতিরে তার 'হইলে হইতে পারা'টা চিরকালের মতো না হওয়া থেকে গেল। যা হ'তে পারতুম তাই যদি হতুম, তবে যা হয়েছি তা হ'তে পারতুম না। বাস্তবটা এমন শোচনীয় নয় যে সম্ভাব্যতার জন্যে হাহতাস করব। স্বর্গ থাকলে মর্ত্য যদি না থাকে তবে চাইলে স্বর্গ।

মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন ক'রে দিয়ে জার্মানী নতুন দিনের আলোয় নতুন ক'রে বাঁচছে। তার ধনবল নেই, সৈন্যবল নেই, কিন্তু তার লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা যুবক যুবতী শ্রৌঢ় শ্রৌঢ়া যেকুণ উৎসাহ আগ্রহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবনচর্চা করছে তা দেখে মনে হয় ভারীকালের জার্মান জাডিকে নিয়ে আবার বিপদ বাধবে। জার্মানী যা করছে তার কোথাও কিছু কাঁচা রাখছে না। পৃথিবীর যেখানে যে বিষয়ে যে বই প্রকাশিত হয় জার্মানী তার অনুবাদ ক'রে পড়ে, ক্ষুদ্র শহরে ক্ষুদ্র দোকানেও আমি ভারতীয় আর্টের উপরে লেখা বৃহৎ বই এবং মহাত্মা গান্ধীর Young Indiaর অনুবাদ দেখলুম! তা ব'লে ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানীর পক্ষপাত নেই, Sigrid Undsetএর নৃতনতম বইয়ের অনুবাদও সে দোকানে ছিল এবং যে বই অল্পদিন আগে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে সে বই অনুবাদ করতে জার্মানীর বিলম্ব হয়নি। জার্মানীর ছোট ছোট শহরেও যে সব মিউজিয়াম আছে সেগুলিতে পৃথিবীর কোনও দেশ বাদ পড়েনি। জার্মানীর শিক্ষাপ্রণালীর ওণে দেশের ইতর সাধারণও পৃথিবীর কোন দেশে কোন বিষয়ে কতটা উন্নতি হয়েছে সে খবর রাখে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এমন সর্বজ্ঞ নয়।

কিন্তু আমাকে সব চেয়ে চমৎকৃত করেছে দু'টি বিষয়। প্রথমতঃ, জার্মানীর যে ক'টি ছোট ও বড় গ্রাম ও শহর দেখলুম সে ক'টিতে Slum নেই, বরং মজুরদের বাড়িগুলি আমাদের মধ্যবিত্তদের বাড়ির তুলনায় অনেক উপভোগ্য। জার্মানীর গরীব লোকদের অবস্থা ইংলণ্ডের গরীব লোকদের চেয়ে অনেক ভালো। জার্মানীর জাতীর দুর্দশার দিনে তার শক্তিকে অপচয় থেকে রক্ষা করেছে তার অন্তর্বিবাদের স্বল্পতা। তাছাড়া জার্মানী প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে Slumএর কিছু সৌন্দর্য সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর শ্রীলতাবোধ এমন বনেদী যে কলকারখানার সঙ্গে কদর্যতাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। ফ্যাক্টরিগুলো যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম বা শহরের চতুঃসীমায় বাগান ক'রে দেওয়া হয়েছে কিংবা বাড়ির সঙ্গে একটি বাগান করতে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা যে-সব বাড়িতে থাকে সে-সব বাড়িরও সুন্দর গড়ন সুন্দর রং; কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই আছে। হোটেল বা রেস্টুরাঁর দেয়ালেও ওয়াল পেপারের বদলে একপ্রকার আলপনা। স্টেট থেকে অপেরা হাউস ও থিয়েটার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক শহরে। গান বাজনার একটি আবহাওয়া সর্বত্র বোধ করা যায়। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক বোবা-কালো, এবং সিনেমা দেখে দেখে তাদের চোখও গেছে। কিন্তু জার্মানীর সকলেই গান বাজনায় যোগ দেয়। আর জার্মানীতে ছবি আঁকার ঝোঁক নিয়ে যত লোক বেড়ায় ফোটে ডোলার বাতিক নিয়ে তত লোক বেড়ায় না।

বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দু'টি জাতির আছে, আমেরিকান আর জার্মান। কিন্তু আমেরিকান যখন বেড়ায়, তখন ভেসে ভেসে বেড়ায়, দিনের দু'চার ঘণ্টায় দু'শো মাইল দেখে নিয়ে বাকী সময়টায় বার বার খায় দায় নাচে খেলে। তার জন্যে সব চেয়ে দামী রেল জাহাজ, সব চেয়ে আরামের মোটর কোচ, সব চেয়ে বড় হোটেল। ভ্রমণ করবার সময় যাতে সে বিশ্রাম সুখ পায় সেই দিকেই তার দৃষ্টি। কিন্তু জার্মান যখন বেড়ায় তখন পায়ে হেঁটে বেড়ায়, ফোর্থ ক্লাস রেল গাড়িতে চড়ে, নিজের পিঠে বাঁধা 'ruck sack' থেকে কিছু 'wurst' বার ক'রে খায়, সস্তা সরাইতে গিয়ে পেট ভরে এক ঘড়া সস্তা beer পান করে, বিশ্রাম করতে করতে ছবি আঁকে, আর চলতে চলতে প্রাণ খুলে গান গায়। জার্মানী দেশটি আমাদের যে কোনো প্রদেশের চেয়ে বড়। তার উত্তরটা প্রোটেষ্টান্ট-প্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিক-প্রধান। তার প্রত্যেক জেলার নিজস্ব ইতিহাস আছে, প্রত্যেক জেলাই ছিল স্বতন্ত্র। জার্মানীকে একটি ছোট স্কেলের ভারতবর্ষ বলতে পারা যায়, তেমনি বহুখা বিভক্ত। তাই জার্মানরা চায় নিজেদের দেশের অলিতে গলিতে ঘুরে নিজের দেশকে সমগ্র ভাবে জানতে। তাদের বেড়ানোর নেশার পেছনে তাদের এই উদ্দেশ্যটি আছে। যুদ্ধে হেরে জার্মানী এক হয়েছে। আগে ছিল প্রাণিয়ার একাধিপত্য। তবু প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণ মরেনি এবং প্রোটেষ্টান্টে ক্যাথলিকে বিরোধ আছে।

জার্মানরা ইংরেজদের মতো প্রধানত প্রোটেষ্টান্ট বা ফরাসীদের মতো প্রধানত ক্যাথলিক নয়। এদের দুই সম্প্রদায়ই সমান প্রবল। রাইনল্যান্ড ও ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র ক্যাথলিক প্রভাব লক্ষ্য করছি। গির্জার যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি গির্জার বাইরে ও ভিতরে মূর্তি ও চিত্রেরও সংখ্যা নেই। এখনো লোকে সে-সব প্রতিমার কাছে দীপ জ্বালে, ফুল রাখে, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায়, মনস্কামনা জানায়। খ্রীস্টিয়ানিটি বহুদূর থেকে এলেও ইউরোপের হৃদয় অধিকার করেছে।

মূর্তি ও চিত্রগুলি সচরাচর ক্রশবিক্ষীণ যীশুর কিংবা যীশুজননী মেরীর। যীশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু—এই দুটি বিষয় নিয়ে অসংখ্য চিত্রকর চিত্র এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সংগীতকার গান রচনা করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আর্ট প্রধানত এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেনেসাঁসের পরে ইউরোপ নিজেকে চিনল, বিষয়ে দারিদ্র্য রইল না, এবং ইউরোপীয় আর্ট গির্জার আঁচল ছাড়ল। খ্রীস্টিয়ানিটি যে ইউরোপের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছায়নি তার প্রমাণ খ্রীস্টিয়ানিটিকে ইউরোপ আপন ইচ্ছামতো ভাঙতে গড়তে পারেনি, যেমনটি পেয়েছিল তেমনটি রাখতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর সামগ্রী উপহার রূপে পেলে লোকে সাজিয়ে রাখতেই ব্যস্ত হয়।

খ্রীস্টিয়ানিটিকে তার বাড়ির পাশের আরব পারস্যের লোক গ্রহণ করল না; এমন কি তার বাড়ির লোক ইহুদীরা পর্যন্ত অসম্মান করল, কিন্তু দূর থেকে ইউরোপ ডেকে নিয়ে মান দিল। কেন এমন ঘটল? সম্ভবতঃ ইউরোপের পরিপূরক রূপে এশিয়াকে দরকার ছিল। কিংবা ইউরোপীয় চরিত্রের পরিপূরক রূপে যীশুর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তটির প্রয়োজন ছিল। জার্মানীর যেখানে যাই সেখানে দেখি যীশুর ক্রশবিক্ষীণ করুণ মূর্তিটি বাগবিক্ষীণ পাখির মতো দু'টি ডানা এলিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন বিনা কথায় বলতে চায়, 'আমার দুঃখ দেখে কি তোমাদের মায়া হয় না? তোমরা এখনো পাপ করছো?' ভোগলোলুপ ইউরোপকে ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিল। শুধু কথায় তার মন ভিজত না, দৃষ্টান্ত তাকে মুগ্ধ করলে। আমার কিন্তু এ দৃশ্য ভালো লাগে না—কসাইয়ের দোকানে গোব্বা ভেড়ার খড়্‌ খুলছে, তার ঠিক সামনে গির্জার দেয়ালে যীশুর শব্দ-মূর্তি খুলছে, এ যেন যীশুকে বিদূষ করা। মনে হয় যেন ইউরোপের লোক পরস্পরকে যীশুর দোহাই দিতে চায় এই জন্য যে তাদের কারুর পক্ষে যীশুর আদর্শ অন্তরের দিক থেকে সত্য নয়,

অথচ বাইরের দিক থেকে সে আদর্শের প্রয়োজন আছে।

চোখে দেখতে জার্মান ও ইংরেজ একই রকম, ফরাসীও ভিন্ন নয়। ইউরোপের সব জায়গায় একই পোশাক একই খানা একই আদব-কায়দা—সব জাতির বহিরঙ্গ একই। স্থান ও পাত্র ভেদে যেটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটুকু ধর্তব্য নয়। জার্মানদের ধারণা তারা ভয়ানক কেজো মানুষ। তাই তারা মাথা মুড়ায়, plus fours কিংবা breeches পরে সাধারণত। তাদের মেয়েদেরও মোটা কাপড়ের প্রতি টান—খন্দের পরা মেয়ে অহরহ দেখছি। জার্মান মেয়েরা কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষের দোসর। তারা গোরু ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় ও পিঠে বোঝা বেঁধে হাঁটে। ফরাসী মেয়েদের দেখলে যেমন মনে হয় সারোক্ষণ পুষ্টিমেনির মতো শরীরটিকে ঘ'বে মেজে সাজিয়ে রেখেছে, জার্মান মেয়েদের দেখলে তেমন মনে হয় না। আবার ইংরেজ পুরুষদের দেখলে যেমন মনে হয় মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো অবধি ফিটকাট, জার্মান পুরুষদের দেখলে তেমন মনে হয় না। জার্মানরা কেজো মানুষ, স্মার্ট হবার মতো শৌখীনতা তাদের সাজে না। সাজসজ্জায় তারা ভোলানাতা—তালি দেওয়া চামড়ার হাফপ্যান্ট পরে পা দেখিয়ে রাস্তায় বা'র হ'লে লগনে ভিড় জ'মে যেত, মিউনিকে কেউ কিছু ভাবে না।

## ॥ তেরো ॥

অস্ত্রিয়ায় যাবার আগে বড় ভাবনা ছিল, কী আর দেখব! গত মহাযুদ্ধে অস্ত্রিয়ার যে সর্বনাশ ঘ'টে গেল কোন্ দেশের তেমন ঘটছে! কত শতাব্দীর কত বড় সাম্রাজ্য, চারটি বছরের যুদ্ধে তার চৌচির অবস্থা! কোথায় গেল হান্সেরী, কোথায় ট্রানসিলভেনিয়া, কোথায় গেল ক্রাকাউ, কোথায় বোহেমিয়া, কোথায় গেল ক্রোয়েশিয়া, ড্যালমেশিয়া, বস্‌নিয়া। চারটি বছরে চারশত বছরের কীর্তি নিঃশব্দে ভেঙে পড়ল, যেন একটা তাসের কেল্লা একটি আঙুলের একটু ছোঁয়া সইতে পারল না। সাম্রাজ্য যদিও চার শতাব্দীর রাজবংশ প্রায় আট শতাব্দীর। যেন আলাউদ্দিন খিলজী থেকে পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত একটি রাজবংশ দ্বিতীয় সিংহাসনে ব'সে রাজ্যবিস্তার ক'রে আসছিলেন, ভেবেছিলেন সূর্যচন্দ্র যতদিনের তাঁরাও ততদিনের। ভালোই হলো যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটও গেলেন, নইলে এখনকার ঐটুকু অস্ত্রিয়ায় অত বড় বনেদী রাজবংশকে মানাত না।

বড় ভাবনা ছিল, ভিয়েনায় গিয়ে কী আর দেখব, সুন্দরী ভিয়েনার বিধবার সাজ কি আমার ভালো লাগবে! ভিয়েনাকে রাণীর বেশে সাজাবার সামর্থ্য অস্ত্রিয়ার নেই, অস্ত্রিয়ার না আছে বন্দর না আছে খনি, অস্ত্রিয়ার লোকসংখ্যা এখন এত অল্প যে ভিয়েনার মতো বৃহৎ নগরীর নাগরিক হবার জন্যে আমেরিকানদের সাধাসাধি করতে হয়। আর কিছুদিন প'রে ভিয়েনাটাকেও তারা প্যারিস ক'রে ছাড়বে—প্যারিসেরই মতো আমেরিকার উপনিবেশ।

ভিয়েনার সঙ্গে তার আশপাশের সঙ্গতি নেই। একটা কৃষি-প্রধান দেশের এক প্রান্তে এত বড় একটা শিল্প-প্রধান শহর, যার ত্রিসীমানায় বন্দর বা খনি নেই। বন্দর যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও কেড়ে নিয়েছে ইটালি। আর খনি যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও পড়ল চেকো-স্লোভাকিয়ার ভাগে। কেবল টুরিস্ট নিয়ে তো একটা বড় শহর বাঁচতে পারে না। ভিয়েনার লোকসংখ্যা কমেছে। বাদশাহী

জাঁকজমক আর নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভিয়েনা অতুলনীয় সুন্দরী। তার প্রায় চারদিকে পাহাড়, কাছেই ড্যানিউব নদী, ভিতরে নদীর খাল। 'Ring' নামক রাজপথটি ভিয়েনারই বিশেষত্ব। বার্লিন দেখিনি, কিন্তু লণ্ডন প্যারিসের চেয়েও ভিয়েনা দু'টি কারণে সুন্দর। প্রথমতঃ, ভিয়েনার পথঘাট প্যারিসের চেয়ে তো নিশ্চয়ই, লণ্ডনের চেয়েও পরিষ্কার। দ্বিতীয়তঃ, ভিয়েনার সৌখণ্ডিল লণ্ডনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই প্যারিসের চেয়েও সুধা-ধবল। ধোঁয়া হ্রার কগের ভয়েই বোধ হয় লণ্ডনের বাড়িগুলো চুন মাখতে চায় না। কিন্তু আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটিও যদি অন্ধকার হয় তো মনের উপরে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। ভিয়েনায় এ তাপদ নেই তাই সেখানে নয়ন দু'টি মেলিলে পরে পরাণ হয় খুশি।

কিন্তু ভিয়েনার নির্জনতা লণ্ডন প্যারিসের মনকে ঘুম পাড়াতে চায়। মধ্যাহ্নে মনে হয় মাঝ রাত। কত বড় বড় বাড়ি, কত বড় বড় রাস্তা—কিন্তু এত জনবিরল যে ঘুমন্তপুরীর মতো লাগে। বৃহৎ রেষ্টরাঁ, ঢুকে দেখা গেল লোক নেই, অথচ অমন রান্না সারা ইউরোপ টুড়লেও পাওয়া যায় না, অপিচ অত সস্তায়। প্যারিসে লোক কিলবিল করছে, আর মানুষ যত নেই মোটর আছে তত; আর সে-সব মোটর যারা হাঁকায় তারা বিদ্যুতের সঙ্গে টক্কর দেবার স্পর্ধা রাখে। প্যারিস থেকে ভিয়েনায় গেলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। অথচ ভিয়েনা চিরদিন এমন ছিল না। এই বিগত-যৌবনা রূপসী একদিন ইউরোপের রাণী ছিল। তখন কত ডিপ্লম্যাট কত বণিক কত গুণী ও কত পর্যটক সোনা দিয়ে তার মুখ দেখতে আসত। সংগীতে ভিয়েনার সমান ছিল না। ভিয়েনার অপেরা এখনো তার পূর্ব-গৌরব হারায়নি। কিন্তু মহাকাব্যের মতো অপেরারও দিন যায়-যায়। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিকাগোর অপেরা লণ্ডনে ব'সে দেখবার শোনবার উপায় হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু নতুন একখানা অপেরা লেখবার মতো প্রতিভা একমাত্র Strauss-এর আছে এবং সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গেই লোপ পাবে। থিয়েটারে সাজসজ্জার যে উন্নতি হয়েছে তা শেকস্পীয়রের পক্ষে কল্পনাভীত, কিন্তু শেকস্পীয়রের পায়ের ধূলা নেবার উপযুক্ত নাট্যকার একটিও জন্মাচ্ছে না। এবং রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় ভ্রগভের শেষ মহাকবি।

ঠাঁট বজায় রাখতে ভিয়েনার লোক অদ্বিতীয়। অত বড় সাম্রাজ্য হারাবার পরে সোশ্যালিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা আগের মতোই কায়দা-দুরন্ত আছে। রেষ্টরাঁয় লোকই আসে না, ভবু ওয়েটার বাবাজীদের দরবারী পোশাকটি অপরিহার্য। পাহারাওয়ালা অন্য সব দেশে কেবল পাহারাই দেয়, তার হাতে একটা বেটন থাকলেই যথেষ্ট, কিন্তু ভিয়েনার পাহারাওয়ালার গায়ে সৈনিকের সাজ ও কোমরে সুখচিত্র তরবারি। ভিয়েনার লোক কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে তাদের সম্রাট ও তাঁর সভাসদেও ছিলেন ইউরোপের মধ্যে অভিজাততম, যদিও এখন তারা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বললে হয় এবং যেতে পায় না ব'লে লীগ অব নেশনসের মধ্যস্থতায় টাকা ধার নিয়েছে। অস্ত্রিয়াকে সম্ভবতঃ একদিন বাধ্য হ'য়ে জার্মানীর অন্তর্গত হ'তেই হবে, কিন্তু ভিয়েনা কেমন ক'রে ভুলবে যে সেই ছিল জার্মানীর তথা ইউরোপের দীর্ঘকালের রাজধানী! সেদিনকার বার্লিনের কাছে ভিয়েনা কেমন ক'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াবে! যে-প্রাসিয়া একদিন তার ভূত্বের মতো ছিল তার কাছে অস্ত্রিয়া হবে ছোট। কিন্তু গরজ বড় বালাই। কত বড় বড় উঁচু মাথাকে সে ধূলায় মিশিয়েছে। যে কারণে এখন ছোট ছোট কারবার টিকতে পারছে না, পৃথিবীব্যাপী combine গ'ড়ে উঠছে, ঠিক সেই কারণে এখন ছোট ছোট রাষ্ট্র টিকতে পারবে না, মহাদেশব্যাপী মহারাষ্ট্র গ'ড়ে ভুলতেই হবে।

অস্ত্রিয়ানদের দরিদ্র বললুম ব'লে যেন না মনে করেন ওরা আমাদের মতো দরিদ্র। ভিয়েনার পশ্চিমদিকে যাকে দারিদ্র্য বলা হয় ভিয়েনার পূর্বদিকে তার নাম সম্ভ্রলতা। অর্থাৎ ইউরোপের দরিদ্ররা এশিয়ার মধ্যবিস্তৃত। ইংলণ্ডে যাকে Slum বলে সেটা আমাদের উত্তর কলকাতার চেয়ে

কুৎসিত নয়। ইউরোপের পারিয়াদের দাবীর ফিরিতি আমাদের মধ্যবিশ্বদের তাক লাগিয়ে দেয়—চড়া হারের মজুরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, সস্তায় আনোদ প্রমোদের টিকিট, ঘন ঘন ছুটি, গ্রুহর পেন্সন, আপদে বিপদে জীবনবীমা। আরো কত কী! জীবনের কাছে আমাদের দাবী কোনোমতে বংশ-রক্ষা করা ও মরে গেলে পিঙিটুকু পাওয়া। এদের দাবী হয় রাজসিক জীবন নয় রাজসিক মৃত্যু। সামান্য কারণে এরা বিদ্রোহ ক'রে বসে, যত সহজে মরে তত সহজে মারে। জীবনের মূল্য যত প্রাণের মূল্য তত নয়। স্বল্পতম ভার সহিতে পারে না ব'লে এদের সমাজ লোকসংখ্যা বাড়লেই যুদ্ধের অছিলা খোঁজে। এদের সমাজকে পাতাবাহারের গাছের মতো মাঝে মাঝে হাঁটলে তবে তার স্বাস্থ্য থাকে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শটি এদের কাছে এত মূল্যবান যে এই জন্যে যুদ্ধের আর বিরাম নেই, এই জন্যে এরা শিঙাধিকারী না রেখে চিরকুমার অবস্থায় মরাটাকে অধর্ম জ্ঞান করে না, বেশি বয়সে বিয়ে করার আনুযদিক অন্যায়—হয় আত্মনিগ্রহ নয় অপকীর্তি—তো করেই, বিয়ের পরেও যে-কোনো মতে জন্ম-শাসন করে। এত বড় ইউরোপে কোথাও একটি পণ্ড-পাখি-সাপ-বাঙ-মণা-মাছি দেখতে পাওয়া শক্ত, অমের ভাগ দিতে পারবে না ব'লে অভক্ষ্য প্রাণিকে এরা মেরে সাবাড় করেছে ও ভক্ষ্য প্রাণিকে অমে পরিণত করেছে। একটা পোষা প্রাণীর যদি স্বাস্থ্য গেল তো তাকে এরা তখুনি গুলি ক'রে ভাবল দু'পক্ষের আপদ চুকল। অপরপক্ষে কিন্তু পোষা প্রাণিকে এরা রুগ্ন হ'তেই দেয় না, এত যত্নে রাখে। পীড়িত পণ্ডকে দিয়ে গাড়ি টানালে কঠিন সাজা। হত্যা ব্যাপারটা যাতে এক মুহূর্তে সমাপ্ত হয়, পণ্ডর পক্ষে যন্ত্রণাকর না হয়, সেজন্যে কসাইদের পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একটা মুর্মূষ প্রাণী দশদিন ধ'রে—না, দশ ঘণ্টা ধ'রে—একটু একটু ক'রে মরছে ও অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছে এ দৃশ্য ইউরোপে দেখবার জো নেই। নিজে যন্ত্রণা ভালোবাসে না ব'লে এরা যন্ত্রণা দিতে ভালোবাসে না। Vivisectionএর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে। ইউরোপের সব দেশেই এখন নিরামিষাশী-সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রছন্ন বৌদ্ধ হয়েছে অনেকেই।

অনাবশ্যকে ইউরোপ নির্মমভাবে ছেঁটেছে। বুড়া বুড়ীকেও না খাটিয়ে খেতে দেয় না। 'Dying in harness' তার জীবনের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকের বহরকেও সে বাড়তে লেগেছে। যৌবন আগে ছিল গোটাকয়েক বছরের। এখন চাই শতবর্ষের যৌবন। এর জন্যে কত প্রাণী হত্যা করতে হবে, কত মানুষকে যুদ্ধে মারতে হবে, কত লোককে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে হবে, কত অজ্ঞাত শিঙকে জন্মতে দেওয়া যাবে না, কত শিঙকে প্রকারান্তরে হত্যা করতে হবে। এত কাণ্ড করলে তবে হবে জন কয়েকের দীর্ঘ যৌবন, নিখুঁত স্বাচ্ছন্দ্য। দুর্ভিক্ষের চেয়ে আত্মনিগ্রহের চেয়ে শিঙমৃত্যুর চেয়ে চিররুগ্নতার চেয়ে এ ভালো, না, মন্দ?

দূর থেকে ওনতুম অস্ত্রিয়ানদের মরো মরো অবস্থা, তারা বৃষ্টি আর বাঁচে না, দেখলুম তারা দিবাি আছে, আমাদের চেয়ে সচ্ছল ভাবে। বুঝলুম ইউরোপের লোক সামান্য অনুবিধাকে বাড়িয়ে দেখে, চার বেলার এক বেলো না খেতে পেলে বলে দুর্ভিক্ষে মারা গেলুম! লণ্ডনে সেদিন দশ বারোটো লোক নাকি অনশনে মরেছিল, তাই নিয়ে মস্ত্রিমগুলীর আসন ট'লে উঠল। অথচ ওরা যদি যুদ্ধে মরতো তবে কেউ ওদের কথা ভুলেও ভাবত না। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের দুর্ভাবনা এই যে তাদের ক্রীরা পয়ত্রিশ বছর বয়সে অনবদ্য স্বাস্থ্য অটুট রাখতে পারে না, তাদের স্বামীদের মজুরী এত কম! আর আমাদের বড়লোকের মেয়েরাও কুড়িতে বুড়ী হন। দূর থেকে আমাদের দেশটাকে মাঝে মাঝে মনে হয় একটা বিরাট Slow suicide club—এত আমাদের সহিষ্ণুতা, অমের সন্তোষ, আত্মনিগ্রহ, চক্ষুন্মজ্জা। আমরা বলি, নিজের ছাড়া বাকী সকলের উপকার করো। এরা বলে, 'Help yourself', কেননা 'God helps those who help themselves', অর্থাৎ নিজের মাথায় যদি তেল ঢালো তো



ভগবান তোমার তেলা মাথায় তেল ঢালবেন। বেকার সমস্যা নিয়ে ইংলণ্ড বড় বিব্রত। অথচ ইংলণ্ডের ধনীরা যদি একথানা ক'রে রুটি দেয় তবে ইংলণ্ডের বড় বেকার আছে প্রত্যেকেই এক একজন মোহান্ত মহারাজের মতো বৈষ্ণবী নিয়ে পরম আব্লাদে মালা জপতে পারে। শুধু তাই নয় ইংলণ্ডের ধনীরা ইচ্ছা করলেই বিশ ত্রিশ কোটি ইঁদুর বাদর প্রভৃতি কেব্টের জীবের জন্যে একটা দেশব্যাপী চিড়িয়াখানাও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ভিক্ষা দিয়ে অপরের উপকার করা এ দেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—যোগ্যতা না দেখলে, বাধ্য না হ'লে কেউ দেয় না। ধনী দরিরদের মধ্যে এমন মন কষা-কষি আমাদের দেশে নেই, এত দলাদলিও আমাদের দেশে নেই। তবে সন্ধি করবার কায়দাও এরা জানে। সময় বুঝে সন্ধি না করলে দু'পক্ষের একপক্ষ অবশিষ্ট থাকবে না, একহাতে তালি বাজবে না। যুদ্ধটা হচ্ছে সহিংস সহযোগ, ও ব্যাপার একা একা হয় না। ভবিষ্যতে আবার লড়াই ব'লে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কেননা শত্রুই হচ্ছে যুদ্ধের সহযোগী। যে জন্তুকে এরা শিকার করবে সে জন্তুকেও এরা বন জঙ্গলে পালন করে। খাবার জন্যেই এরা গোরু শূকরকে খাইয়ে মোটা করে।

ইউরোপের বহিঃপ্রকৃতি তার অন্তঃপ্রকৃতিকে কী পরিমাণ নিদ্রকণ করেছে তার একটা নিদর্শন ইউরোপের যে দেশে যাই সে দেশে দেখি। আমাদের যেমন চালের দোকান এদের তেমন মাংসের দোকান; প্রায় প্রত্যেক অলিতে গলিতে আছেই, কষ্ট ক'রে খুঁজতে হয় না, আপনি খোঁচা দেয়। ফোঁটা মুসলমানেরা ক'টাই বা গোরু খায়, যদি বা খায় তবে ক'টা গোরুর ছাল-ছড়া ধড় রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে, খন্দের এলে করাত দিয়ে নির্দিষ্টস্থানের মাংস কেটে ওজন ক'রে প্যাক ক'রে বিক্রি করে? একসঙ্গে একশোটা মরা পাখি পাকা কলাব মতো ঝুলছে কিংবা একশোটা মরা খরগোশ! সাজিয়ে রাখাটাকে এরা একটা আর্ট ক'রে তুলেছে ব'লে বীভৎস ঠেকে না, ক্রমে ক্রমে কলা-মূলো-কপি-কুমড়ার মতো লাগে, আমিষ নিরামিষের পার্থক্যবোধ লোপ পায়। রাগ করবার উপায়ও নেই, কেননা মাছকেও তো আমরা কলা-মুলোর সামিল মনে ক'রে থাকি, বিশেষ ক'রে বাঙালীর চোখে মাছ একটা প্রাণীই নয়। প্রাণ সম্বন্ধে ঐ অসাড়টাকাকে আরেকটু প্রশ্ন দিলে আমরাও ইউরোপীয় হ'য়ে পড়তুম, ঝুলন্ত হাম দেখে—চোখে নয়—জিভে জল এসে পড়ত।

দোকান সাজানোতে ইংরেজ-জার্মান-অস্ট্রিয়ান-সুইস্রা ওস্তাদ। ফরাসীরা আমাদের মতো এলোমেলো। শুধু দোকান নয়, রেল স্টীমার হোটেল রেষ্টুরাঁ পথঘাট প্রদর্শনী—সর্বত্র একটি শৃঙ্খলা ও পরিপাটি উত্তর ইউরোপের বিশেষত্ব ব'লেই মনে হয়। ভিয়েনা ও প্যারিস এই দু'টি শহরের মধ্যে ভিয়েনা অনেক বেশি সৌষ্ঠবসম্পন্ন, যদিও এলোথেলো সৌন্দর্য প্যারিসেরই বেশি। ভিয়েনায় তো সেন নদীর মতো আঁকা বাঁকা নদী নেই, তার কূলে ব'সে মাছধরা নেই, তার কূলে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা নেই, তার বাঁধে পুরোনো বইয়ের দোকানে ঝুঁকে পড়া বই-পাগলা বুড়ো নেই, তার আশেপাশের রাস্তায় রঙিন কাপেট কাঁধে নিয়ে পায়চারি-করতে-থাকা ইজিপশিয়ান ফেরিওয়াল্লা নেই। এত রকম রাস্তার দৃশ্য (street sights) প্যারিসের মতো আর কোথায় আছে? সারাক্ষণ যেন অভিনয় চলেছে প্রতি রাস্তায়। অথচ নোংরা রাস্তা, মোড়ে জল জমেছে, ফুটপাথে দোকানের নিচে দোকান, তাতে একসঙ্গে একশো রকম জিনিস জট পাকিয়েছে, তরমুজ আর বাঁধা-কপির সঙ্গে খরগোশ আর মাছ এবং গেল্লি আর পুলোভার। দোকানের গায়ে-গায়ে একটা কাফে আর মদের দোকান—সেও অকথ্য নোংরা এবং অগোছাল। এ-সব অনাচার ভিয়েনায় কিংবা লণ্ডনে নেই, কোলোনে কিংবা মিউনিকে নেই, বার্নে কিংবা লুসার্নে নেই। মার্সেল্‌সে আছে, জার্নেল্‌সে আছে এবং সম্ভবতঃ সমস্ত ফ্রান্সে আছে। এবং সম্ভবতঃ সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে। প্রদীপের নিচে অন্ধকারের

মতো ফরাসীদের নিখুঁত বাস্তবকলার সঙ্গে প্রচুর ধুলো কাদা যোগ দিয়েছে। ভিয়েনা চিত্রে ভার্কর্নৈ বাস্তবকলায় প্যারিসের নকল, কিন্তু শৃঙ্খলায় ও পারিপাট্যে প্যারিসের বাড়ি। অবস্থা-বিপর্যয় সত্ত্বেও তার এই গুণগুলি যায়নি, তার সোশ্যালিস্ট মিউনিসিপালিটির মেজাজটা বোধ হয় বাদশাহী।

বাদশাহের প্রাসাদগুলি অবশ্য এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। দশ বছর আগে যে বাগানে বাদশাহজাদীরা হাওয়া খেতেন এখন সেখানে গরীবের মেয়েরা খেলা করতে যায়। দশ বছর আগে যে-সব ঘরে বাদশাহ শয়ন বিশ্রাম ভোজন করতেন, যে-সব ঘরে বেগম সখীদের সঙ্গে গল্প করতেন বা অতিথিচর্চা করতেন, বা নাচের মজলিস ডাকতেন, সে-সব ঘর এখন সামান্য কিছু দর্শনী দিলে কিছুক্ষণের জন্যে রাত্তার লোকের সম্পত্তি। দশ বছর আগে সাধারণের চোখে বা আলাদীদের খদীপের মতো ছিল তাই এখন ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তারই মতো সাধারণ মানুষকে বাদশাহ পদবী দিয়ে তারই গৃহের মতো সাধারণ গৃহকে অমর্যবতী কল্পনা করেছিল এবং সমস্ত ব্যাপারটির গায়ে পুরাণ ইতিহাসে রূপকথার সোনার কাঠি ছুঁয়ে সেটিকে নিজের প্রতিদিনের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে রেখেছিল। ঈশ্বর-ভক্তির মতো রাজভক্তিও মানুষের নিজের তৃপ্তির জন্যে; এবং একটা কাল্পনিক দূরত্বই তার প্রাণ। আজ সে-দূরত্ব ঘুচে গেছে; প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে যে রাজপ্রাসাদটা বাহির থেকে হাঁ ক'রে দেখবার মতো এমন কিছু মায়াপুরী নয়, বারো আনা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে নিভান্তই রক্ত মাংসের মানুষের আহা-নিদ্রার স্থান, এবং ছোট ছোট মান অভিমান পরশীকাতরতার দাগে দাগী। মানুষে মানুষে যে কাল্পনিক ব্যবধান এত কাল এত কাব্য ও এত কলহ উদ্বেক করেছিল আজ নদে হচ্ছে—সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। এবার মানুষ যে নতুন জগতের দ্বারে দাঁড়িয়েছে সে-জগৎ দিনের আলোর জগৎ, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা তার নাড়ীনক্স জালা, কোথাও একটু কল্পনার অবকাশ নেই, নিদারণ মোহভঙ্গের মধ্যে তার পথ। কোন্ রাজপ্রাসাদকে দেখে স্বর্ণ বসনা করবে? কোন্ রাজাকে দেখে দেবতা? কোন্ রাজপুত্রকে নিয়ে উপকথা রচনা করবে? কোন্ রাজবংশকে নিয়ে কাব্য? তাই শেক্সপীয়ারও আর হয় না, রবীন্দ্রনাথও আর হবে না।

## II চোদ্দ II

যতগুলো রাজপ্রাসাদ দেখলুম তাদের কোনোটাই মনে ধরল না, কেননা কোনোটাই যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোশাকে প্রাসাদে যানে বাহনে বেগমে গোলামে আমাদের রাজরাজড়ারাই দুনিয়ার সেরা। আগ্রা দিল্লী লঙ্কৌ বেনারসের সঙ্গে ভার্সেল্‌স ভিয়েনা মিউনিক বুডাপেস্টের এইখানেই হার যে রাজ্যতে প্রজাততে ভারতবর্ষে যেনন আসমান জমীন ফরক্, সম্ভবতঃ এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও তেমন ছিল না। আমরা ধাতো একত্বীমিস্ট। আমরা রাজা বাদশা ও ভিখারী ফকির ছাড়া কারুকে সম্মান করিনে। তাই আমাদের দেশে ভোগের নামে লোকে মূর্খা যায়, ভাবে না জানি কোন্ রাজরাজড়ার মতো ভোগ করতে গিয়ে ভিখারীতে সমাজ ভরিয়ে দেবে! আর ত্যাগের নাম করলে ধড়ে প্রাণ আসে,—হাঁ, সমাজের পাঁচজনের উপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখছ না, আমাদের জন্যে উনি কৌপীন ধরলেন।

ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর বোধ হয় কেবল ভারতবর্ষের নয়, প্রথম সূর্যালোকিত

দেশগুলির দুর্ভাগ্য। ইজিপ্টে ও গ্রীসে সমাজের একটা ভাগ দাসত্ব করেছে, অপর ভাগ সেই দাসত্বের উপরে পিরামিড খাড়া করেছে। অতটা একত্বমিহন প্রকৃতির সহ্য হয় না—ইজিপ্ট ও গ্রীস টলে পড়েছে। দাসও মরেছে, দাসের রাজ্যও। ভারতবর্ষেও কোনো একটা রাজবংশ দু'চার পুরুষের বেশি টেকেনি, যত বিজেতা এসেছে সবাই দু'চার পুরুষ পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেল্লা এর ব্যতিক্রম হলো, কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জন-হাওয়া কিংবা ধাত কোনোটাকেই স্বীকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে শাসন করে এবং ঘরের প্রভাববশত মনে প্রাণে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ইংরেজের temper গরমও নয়, নরমও নয়; অসহিষ্ণুও নয়, সহিষ্ণুও নয়। ইংরেজ আশ্চর্য রকম মধ্যপন্থী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি মাঝারি। এই মাঝারিত্বকে লোকে গালাগাল দিয়ে বলে conservatism; আসলে কিন্তু ইংরেজের conservatism হৃৎস্পন্দ নয়, ধীরে সুস্থে চলা, slow but sure—কচ্ছপ-গতি। সূর্যের আলোর মদে মাতাল ফরাসীরা কতকটা আমাদের মতো একত্বমিস্ট, তাই তারা সুদীর্ঘকাল মহাশয়ের মতো যাই সওয়াবে তাই সয়, অবশেষে একদিন এটনা আত্মীয়গিরির মতো অধিবৃষ্টি ক'রে আবার চূপচাপ ব'সে মদে চুমুক দেয়। তার ফলে খরগোসকে ছাড়িয়ে কচ্ছপ এগিয়ে যায়।

তবে ফরাসী বলো জার্মান বলো ইংরেজ বলো—কেউ আমাদের মতো ছোটতে বড়তে আসমান জমীন ব্যবধান ঘটতে দেয় না, সময় থাকতে প্রতিকার করে। এই যে সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট, এটার মতো মুভমেন্ট প্রতি শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিয়েছে। আজ যদি এ মুভমেন্ট অতি বৃহৎ হয়ে থাকে তবে যার বিরুদ্ধে এ মুভমেন্ট সেও আজ অতি বৃহৎ হয়ে উঠেছে। সমাজের একটা পা আজ বিপর্যয় লাক দিয়ে এগিয়ে গেছে ব'লেই অপর পাটা বিপর্যয় লাক দিয়ে সদ রাখতে ব্যগ্র। ইউরোপের ধনীরা আজকের এই উন্মুক্ত পৃথিবী থেকে যে প্রচুর ধন আহরণ ক'রে ঘরে আনছে, ইউরোপের শ্রমিকরা সেই প্রচুর ধনেরই একটা সমানানুপাত বন্টন চায়।

এক হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে বৈরাগ্যাভিমাত্রী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা যে ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সহিতে না পেয়ে সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব ক'রে দরিদ্রের দারিদ্রভার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগতে হয় এবং কোনোদিন সে ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যত্ব এই যে সাধনা এই ভারসাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সম্মানী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিজি চায়। যে জগতে প্রতিদিন বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র ভাঙছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড় বড় নৌকাডুবি ঘটছে, প্রতিদিন ছোট ছোট অণুপরমাণু থেকে নব নব গ্রহ নক্ষত্র গ'ড়ে উঠছে, ছোট ছোট প্রবালকীট মিলে অপূর্ব প্রবালরীপ গাঁথে তুলছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সম্মানীকে কেউ পাবে না। সে তার কাঁথা-কম্বল-ছাল-বন্ধল আঁকড়ে ধ'রে বিবাগী হয়ে গেছে। এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রাণীমক্ষিকার সংখ্যা বাড়ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনওজননে সংসারচক্র মুখর হলো। প্রাসাদে আর কুটীরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত্য নয়, একাধারে স্বর্গ—পাতাল। আল্পন পর্বত ও ভূমধ্য সাগর সহ্য হয়, কেননা উঁচু নিচু হ'লেও তাদের ব্যবধান দূরত্বক্রম্য নয়, কিন্তু হিমালয় পর্বত ও ভারত সাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট ও নিচে বিশ হাজার ফিট—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দূরত্বক্রম্য। ভারতবর্ষের রাজা মহারাজারা যে চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষা-মজুররা যে চালে থাকে ইউরোপের ভিখারীদের পক্ষেও তা দুষ্প্র। এবং এই ব্যাপার খুব সম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চলে আসছে। কেন না আমরা চিরকাল Intemperate Zone-এর লোক। আর আমাদের দেশটাও চিরকাল এত বেশি উঁচু নিচু যে

আমাদের চোখে জীবনের বিস্তীর্ণ রকম উঁচু নিচুও একটা সহজ উপমার মতো স্বাভাবিক ঠেকে।

রাজপ্রাসাদগুলি পরিদর্শন করবার সময় লক্ষ্য করেছি সেগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর দুঃখ সূত্রের নীড়—এক একটি 'home'। ইংরেজী 'home' কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই, কেননা 'home' কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠ-পাথরের রূপান্তরিত প্রেম। ইংরেজ যুবক যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন একটি গুহা প্রত্যাশা করে যেখানে সে সিংহীর মতো স্বাধীন, যেখানে তার স্বামী পর্যন্ত তার অতিথি, শাওড়ী শ্বশুর জা দেবর তার পক্ষে ততখানি দূর, শাওড়ী শ্বশুর শ্যালক শ্যালিকা তার স্বামীর পক্ষে যতখানি। গৃহের বাইরে তার স্বামীর এলাকা, গৃহের ভিতরে তার নিজের; কেউ কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। বাড়িতে একটা চাকর বাহাল করবার অধিকারও স্বামীর নেই, কিংবা চাকরকে জবাব দেবার। বাজার করাটাও স্ত্রীর এলাকা, কেবল দাম দেবার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক আপিসে এবং ক্লাবে ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আসবাবের দোকানে গহনার দোকানে পোশাকের দোকানে ধোপার বাড়িতে ছেলে মেয়েদের ইস্কুলে বাড়িওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে পার্টিতে নাচে সর্বত্র স্ত্রীর বৈজয়ন্তী। এ সমস্তই 'home'-এর এলাকায় পড়ে। অতএব 'home'-কে আপনারা কেউ চারখানা দেয়াল ও একখানা শিলিং ঠাওরাবেন না। ছেলের দোলনা থেকে ছেলের বাপের খাবার টেবিল পর্যন্ত যাঁর রাণীত্ব তিনি সুগৃহিণী নন, সমাজে তাঁর নিন্দা, তিনি কুনো। গির্জায়, charity bazaar-এ, সমাজসেবার সব আয়োজনে যাঁর হাত (বা হস্তক্ষেপ) তিনিই সুগৃহিণী।

এত যদি স্ত্রীর অধিকার তবে feminism-এর ঝড় উঠল কেন? কারণ industrial revolution-এর ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে, ছেলেরা সারা জীবন দেশ দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা 'home' করবে কাকে নিয়ে? 'Home'-এর মধ্যে একটা স্থায়িত্বের ভাব আছে, স্থানিক স্থায়িত্ব না হোক, সাময়িক স্থায়িত্ব। প্রেম স্থায়ী না হ'লে 'home' হয় না। স্বামী স্ত্রী ঠাই-ঠাই হ'লেও ভাবনা ছিল না, দু'জনের হৃদয়ও যে ঠাই-ঠাই হ'তে আরম্ভ করেছে। আমরা হ'লে বলতুম, দুয়ো-সুয়ো চলুক না? অন্ততঃ সদর মফঃস্বল? মুশকিল এই যে, এতটা পতিব্রতা হ'তে এ দেশের মেয়েরা এখনও শিখল না। সুয়াকে কোথায় বোন ব'লে আপনার ক'রে নেবে ও স্বামীর শয্যা পাঠিয়ে দেবীর পাট প্লে করবে—আরে ছি ছি, রাম রাম, স্বামীদেবতাকে বিগ্যামীর অপরাধে পুলিশে দেয়! আর মফঃস্বলের খবর পলে, একেবারে ডিভোর্স কোর্ট—ধিক! এরি নাম সভ্যতা!

ইংরেজ-জার্মান-স্কাটিনেভিয়ান মেয়েরা নিজের পাওনাগণ্ডাটি চিরকাল বুঝে নিয়েছে। অতীতকালে এরা স্বামীকে বলেছে, তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা-বাবাকে না। তাই এদের স্বামীর পিতৃ-পিতামহের সনাতন টাইব ছেড়ে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে ফ্যামিলি সৃষ্টি করেছে—ফ্যামিলি ও পরিবার এক কথা নয়, যেমন 'home' ও গৃহ এক কথা নয়। এই মজ্জাগত পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার স্বভাব থেকেই বর্তমান কালে feminism-এর উৎপত্তি। এর মূল সূত্রটি এই যে, 'home'-এর দায়িত্ব যখন তোমরা স্বীকার করছ না তখন আমরাও স্বীকার করব না, তোমরা মুক্ত হও তো আমরাও মুক্ত হই। আপনারা বলবেন, সহিংসতাই নারীর ধর্ম, মা বসুমতী কত সইছেন! কিন্তু স্নেহ মেয়েরা এত বড় তত্ত্বকথাটা বোঝে না, তাই তাদের স্বামীদের পদভারে মা বসুমতী টলমল, এবং তাদের পদভারে তাদের স্বামীর শিবের মতো চিৎপাত।

ভিয়েনার রাজপ্রাসাদগুলিতে রাণী মারিয়া থেরেসার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। রাণী বলতে অসপত্ন রাণী বুঝতে হবে—এবং জা-শাওড়ী-হীন। এবং সামাজিক প্রাণী। দিল্লী—আগ্রা—ফতেপুর সিক্রীতে বেগমের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন-বিশেষ যদি বা দেখা যায় তবু ও-সব রাজপ্রাসাদকে 'home' মনে

করতে পারিনি। এবং সামাজিক শ্রাণী হিসাবে বেগমদের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের পাঁচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আতিথ্য পাননি; রাজন্যশ্রেণীর পাঁচজন পুরুষ তাঁদের সঙ্গেও দু'দণ্ড আলাপ করতে পারেননি, দু'দণ্ড নাচবার আম্পর্ধা রাখেননি। বঁদী ও বান্দ্য ভরা বিশাল বেগম-মহলে বাদশা মাসে একবার পূর্ণচন্দ্রের মতো উদয় হন, পুত্র কন্যারা মা-বাবার সঙ্গে দু'বেলা আহার করবার সৌভাগ্য না পেয়ে দাস দাসীর প্রভাবে বাড়েন। এমন গৃহকে গৃহিণীর সৃষ্টি বলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য রাজপ্রাসাদ আড়ম্বরে অপরাপরীর মতো হ'য়েও দুঃখে সুখে নীড়ের মতো নয়। এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, লুই-রাজার বা নেপোলিয়নেরও মঞ্চস্থল ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে রাজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইন-কানূনের উপরে, তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মানুষ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পোপের নির্দেশ অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই চালিত হতো। ইংলণ্ডের রাজা চার্লস অব ইংলণ্ড ও পার্লামেন্টের কাছে এতটা দায়ী যে তাঁর বিবাহ বা বিবাহচ্ছেদ পর্যন্ত সমাজের এই দু'টি হাতে। রাশিয়ার অত বড় বেচ্ছাচারী জারও স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্বীর বিবাহ করতে পারতেন না কিংবা সুয়োরগীর ছেলেকে রাজ্যাধিকার দিয়ে যেতে পারতেন না। সে-ক্ষেত্রে তিনি গ্রীক চার্চের নির্দেশাপেক্ষ। তবে এও অস্বীকার করছি যে পোপ বা প্যাট্রিয়ার্কার মাঝে মাঝে ঘুষ খেয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতেন। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক চিরদিন বিদ্রোহ করেছে। প্রোটেষ্ট্যান্টিজম্ তো এই জাতীয় একটা বিদ্রোহ! ওটাও আধুনিক সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট বা এর আগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই মতো মানুষে মানুষে দূরত্বক্রম ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আসবাব-শিল্পের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। এই মুহূর্তে ইউরোপের সর্বত্র আসবাব-শিল্পের বিপ্লব চলেছে। কোলোনে মিউনিকে ও ভিয়েনায় নতুন ধরনের ঘর ও নতুন ধরনের আসবাবের কত রকম নমুনা দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মাঝখান থেকে আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। চাষা-মজুরদের অবস্থার যতটা উন্নতি হয়েছে মধ্যবিত্তদের অবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই দুই শ্রেণীর জন্যে অল্প দামের মধ্যে নজবুত অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক বাড়ি ও আসবাব দরকার হয়েছে লাখে লাখে। যার যে নমুনা পছন্দ হয় সে অবিলম্বে জিনিসটি পায়। Large scale productionএর নীতি অনুসারে খরচ বেশি পড়ে না, হাদামাও নেই, পছন্দ করবার পক্ষে নমুনাও যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে যে ঘরের সাইজ ও রঙ ইত্যাদি অনুসারে আসবাবের সাইজ, রঙ, রেখা ও গড়ন। দুই দিকেই বিপ্লব ঘটছে—বাড়ি ও আসবাব দুই দিকের দুই বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। দুই-ই সরল, লঘুভার, নতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরলবসতি, নিরলঙ্কার। মানুষের রুচি এখন সভ্যতার অতিবুদ্ধিকে ছেড়ে প্রকৃতির উদার উম্মুক্ত বলকারক সত্যগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। সেই জন্যে নতুন ধরনের চেয়ার, টেবিল, খাট বা দেওয়ালের উপরে পাগলামির ছাপ যদি বা দেখতে পাওয়া যায় চালাকির মারপ্যাচ বা বড়মানুষীর চোখে-আঙুল-দেওয়া ভাব এক রকম অদৃশ্য। এর একটা কারণ, আগে যে-শ্রেণী Slumএ থাকত তাদেরও চাহিদা অনুসারে এ সবের যোগান। এবং তাদের রুচি অতি সূক্ষ্ম বা অতি খুঁতখুঁতে নয় ব'লে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উপরিতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও রুচি মেলাতে হচ্ছে। Mass productionএর মজা এই যে চাষা-মজুরের সিকিটা দুয়ানিটার জন্যে যে সিনেমার ফিল্ম—তার রুচির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের রুচি না মেলে তো কলেজের ছাত্র নাচার। সিকি দুয়ানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষা-মজুর দু'পক্ষই সমান, অগত্যা রুচির দিক থেকেও দু'পক্ষকে সাম্যবাদী হতে হবে।

## ॥ পনেরো ॥

ইংলও দেশটা যে কী সাংঘাতিক ছোট একটু ঘুরে ফিরে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ছোট তো আমাদের এক একটা প্রদেশও, কিন্তু তাদের ছোটত্ব মানুষের হাতে গড়া। আর ইংলণ্ডের ছোটত্ব নৈসর্গিক। এর সর্বদ ঘিরেছে আঁট পোশাকের মতো সমুদ্র, এর মাথার উপরে চাপ দিয়েছে চাঁপির মতো আকাশ। আকাশ? না, আকাশ বলতে আমরা যা বুঝি তা এ দেশে নেই। সেইজন্যই তো দেশটাকে অস্বাভাবিক ছোট বোধ হয়। একটা অন্ধকূপ বিশেষ। এর ভিতরে যারা থাকে তারা পরস্পরের বড্ড কাছাকাছি থাকে, পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোনে। ইংলওে যখনি যে এসেছে সে বেমানুম ইংরেজ হ'য়ে গেছে। এর উদরের জারক রস এতই প্রবল যে আনিষ ও নিরামিষ দুধ ও তামাক যখন যাই পেয়েছে তখন তাই পরিপাক ক'রে এক রঙ মাংসে পরিণত করেছে। ইংলণ্ডের আশ্চর্য একতার কারণ ইংলও দেশটা দৈর্ঘ্যে প্রহে ও উচ্চতায় অত্যন্ত আঁটসাঁট ও ছোট।

ভারতবর্ষে যখন সারাদিনের খাটুনির শেষে তারা-ভরা আকাশের তলে ব'সে নিঃশ্বাস ছাড়ি তখন সে নিঃশ্বাস লক্ষ যোজন দূরে নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যায়, মনে হয় না যে ভারতবর্ষ আমাদের বেঁধে রেখেছে। আমাদের বিশাল দেশ, বিরাট আকাশ; আমরা কোটি তারকার সঙ্গ পেয়ে ধন্য, মানবসংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে আমরা তুচ্ছ ব'লেই জানি। আর এরা? এদের কিবা রাত্রি কিবা দিন—সমস্ত জীবনটাই একটা non-stop dance কিংবা non-stop flight। ছন্দহীন যতিহীন বেতলা জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অশ্রান্ত বন্যাবেগ; এক নুহুত বিশ্রাম করতে বসলে প্রতিযোগীরা লাথি মেরে এগিয়ে যায়, বৃদ্ধ বয়সেও অদ্রুতিভায়ে অস্তির ক'রে রাখে। দিনের পরে কখন রাত আসে, রাতের শেষ কোনো দিন হয় কি না, ঠিক নেই। এ দেশের সূর্য সাম্রাজ্য পাহারা দিতে বেরিয়ে স্বরাজ্যে হাজিরা দেবার সময় পায় না। মাটি ও আকাশের মাঝখানে মেঘ ও কুয়াশার প্রাচীর, মানুষের প্রাণের কথা তারালোকে পৌঁছায় না, ঘরের কোণে ছোট ছোট দুঃখ সুখকে মহাজগতের বড় বড় দুঃখ সুখের সঙ্গে মিলিয়ে ধরবার সুযোগ মেলে না, 'the world is too much with us!'

তারপরে এদের আকাশের আঁধার এদের মনকেও আঁধার করেছে, হাংড়াতে হাংড়াতে যখন যেটুকু সত্য পায় তখন সেইটুকু এদের কাছে সব, এরা কত বড় একটা সাম্রাজ্য চালায় নিজেরাই জানে না, সাম্রাজ্য এরা গড়েছে অল্পমনস্ক ভাবে। খাঁটি প্রাদেশিকতা যাকে বলে তা দ্বীপবাসীতেই সম্ভব এবং আকাশহীন দ্বীপবাসীতে। এরা তিন dimension-এর দ্বীপবাসী। ইংলওে দলাদলির অন্ত নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই স্বভাবে ইংরেজ অর্থাৎ আকাশহীন দ্বীপবাসী। কোনো একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন ইংলওে টিকবে না, খ্রীস্টধর্ম টিকল না, সোশ্যালিজম্ টিকছে না। একদিন যেমন চার্চ অব ইংলও নিজস্ব খ্রীস্টধর্ম সৃষ্টি করল আজ তেমনি নেবার-পার্ট নিজস্ব সোশ্যালিজম্ সৃষ্টি করছে। নির্জলা ন্যাশনালিজম্ ইংলওেই প্রথম সম্ভব হয়, ইংলওেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এর কারণ নৈসর্গিক। তবে নিসর্গের উপরে খোদকারী করছে মানুষ। জাহাজের যা সাধ্যাতীত ছিল এরোপ্লেন তাকে সাধ্যায়ত্ত করছে, channel tunnel হয়তো অসাধ্য সাধন করবে, ইংলও আর দ্বীপ থাকবে না। কিন্তু মেঘের প্রাচীর?

দক্ষিণ ইংলণ্ডের নানা স্থানে ঘুরে ফিরে দেখা গেল। নিসর্গ ও মানুষ মিলে অঞ্চলটাকে সর্বতোভাবে একাকার ক'রে দিয়েছে। একই রকম অগুনতি ছোট শহর, প্রত্যেকটাতে একই

হোটেলের শাখা-হোটেল ও একই দোকানের শাখা-দোকান। স্থানীয় সংবাদপত্র ও থিয়েটারও বহুদূর থেকে চানিত। রেল ও বাস যদিও অগুনতি তবু একই কোম্পানীর। একই আবহাওয়া, একই রকম ছিচকাদুনে আকাশ, অসমতল ভূমি। মানুষও বাইরে থেকে একই রকম—পোশাকে চলনে বুলিতে আদব কায়দায় সামান্য যা ইতর বিশেষ তা বিদেশীর চোখে স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি মানুষ ইংরেজ হ'য়ে গেছে, প্রিন্সাথ-ওয়ালা বা টব্বাকী-ওয়ালা ব'লে কেউ নেই। অধিকাংশ বাড়িই এখন বাসা, পূর্বপুরুষের ভিটা মাটির মর্যাদা যদি থাকে তো পূর্বপুরুষের গোরহান। বাড়ির মালিকরা হয় বাড়িতে থাকেন না, নয় বাড়িতে বোর্ডিং হাউস খোলেন। এই সব শহরের সর্বপ্রধান ব্যবসায় অভিধিচর্চা। অভিধিরা হয় ছুটিতে বেড়াতে আসে, নয় বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজে আসে। যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরও দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারা হয় দূরস্থিত পিতামাতার বোর্ডিং স্কুলে পড়তে থাকা সন্তান, নয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পেন্সনপ্রাপ্ত পিতামাতা। ছোটদের জন্যে বোর্ডিং স্কুল ও বড়োদের জন্যে নার্সিং হোম সমুদ্রতীরবর্তী বহুশত শহরে ও গ্রামে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

ইংলও যে দিন দিন socialised হ'য়ে উঠছে, এর প্রমাণ ইংলওের এই সব বোর্ডিং স্কুল নার্সিং হোম হাসপাতাল পারিক লাইব্রেরী ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান জনসাধারণের চাঁদায় চলছে, এসব অনুষ্ঠানে যারা থাকে তারা অনেক সময় জনসাধারণের চাঁদায় থাকে, এসব অনুষ্ঠানের শিক্ষায় বা চিকিৎসায় কোনো একজনের প্রতি পক্ষপাত নেই। গভর্ণমেন্টের খরচে চললেও এগুলি এমনি ভাবেই চলত। যে দেশে জনসাধারণ যা গভর্ণমেন্টও তাই, সে দেশে জনসাধারণের চাঁদায় চালিত বে-সরকারী হাসপাতাল ও জনসাধারণের খাজনায় চালিত সরকারী হাসপাতালে তফাৎ কতটুকু? ইংলওের অসচ্ছলরা চার্চ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে যে চাঁদা পায় গভর্ণমেন্টের মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে সেই চাঁদাই পেতে চায়, যদিও তার নাম চাঁদা হবে না, হবে পাওনা। কিন্তু সেই পাওনা ও এই পাওনা তলে তলে একই জিনিস—এমনি বোর্ডিং স্কুলের অপক্ষপাত শিক্ষা, হাসপাতালের অপক্ষপাত চিকিৎসা, নার্সিং হোমের অপক্ষপাত সেবা। এতে আত্মীয় স্বজনের হাত নেই, হৃদয় নেই, এর উপরে সমাজের ফরমাস প্রবল, ব্যক্তির রুচি-অরুচি ক্ষীণ। সমাজের অলিখিত হুকুমে মা তার কোলের ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে দেয়, রুগ্ন ছেলেকে হাসপাতালে রাখে। নিজের হৃদয়ের দাবীকে সমাজের দশজনের মতো নিজেও সেন্টিমেন্টাল ব'লে উড়িয়ে দেয়।

এই সব হোটেল বোর্ডিং হাউস স্কুল ও নার্সিং হোম সাধারণত মেয়েদের হাতে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো এরা homeএর সাধ হোটলে ও আত্মীয় স্বজনের সাধ অভিধি নিয়ে মেটায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই আদর্শই উদযাপিত হ'তে চলল। নাম নিয়ে মারামারি ক'রে ফল নেই, এও একরকম সোশ্যালিজম্। তলিয়ে দেখলে সোশ্যালিজমের আদত কথাটা কি এই নয় যে সমাজ ও ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থ থাকবে না, সম্পর্কে ও সম্পত্তিতে 'private' অঙ্কিত বেড়া থাকবে না? যে জননী জন্মের পর মুহূর্তে সন্তানকে Dr. Barnardo's Homeএ ত্যাগ করে ও যে জননী জন্মের অল্পকাল পরে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয় তাদের একজনের সন্তানের খরচা বহন করে বদানা জনসাধারণ, অপর জনের সন্তানের খরচা বহন করে দূরস্থিত পিতামাতা; শিক্ষা উভয়েই পায় অনাত্মীয়দের অপক্ষপাত ভস্তাবধানে, পক্ষপাতী পিতামাতার সান্নিধ্য কেউই পায় না অধিকাংশ হলে। এদের আর্থিক অবস্থার উনিশ বিশ থাকলেও এরা সোজাসৃজি সমাজের হাতে গড়া।

প্রবীণাদের মুখে চোখে কথাবার্তা এমন একটি শিথিতা ও শান্তি লক্ষ্য করা গেল যা কোনো

দেশবিশেষের বিশেষত্ব নয়, যা যুগবিশেষের বিশেষত্ব। অতঃগামী চন্দ্রের নিক্ততার মতো উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-মুখের নিক্ততারও দিন শেষ হয়ে এলো। এর পরে বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্র নারীর প্রথর জালা, লাভণ্যহীন পিপাসাময় দুঃসাহসিক অকণরাগ। ভারতের কল্যাণী নারীকে ভিত্তিহীন ইংরেজ নারীতে কত স্থলে প্রত্যক্ষ করেছে, বহু-সহোদরবিশিষ্ট প্রশস্ত গৃহদানে এঁদের বাল্যকাল কেটেছে, যন্ত্রমুখর জীবন-সংগ্রামে জীবিকার জন্যে এঁরা প্রাণপণ করেননি, পাঁচ জনকে খাইয়ে খুশী করেই এঁদের তৃপ্তি, জগতের সামান্যই এঁদের জ্ঞানেন ও একটি কোণেই এঁদের স্থিতি, উদ্যানলতার ভদি এঁদের স্বভাবে ও উদ্যানপুষ্পের সুরভি এঁদের আচরণে। অনুভূত হলেও এঁরা গৃহিণী নারী, এঁরা স্বতন্ত্র নারী নন। আর এঁদের পরবর্তিনীরা ফ্ল্যাটে বা বোর্ডিং হাউসে থাকা সাবধানী পিতামাতার স্বল্পসহোদর বিশিষ্ট সন্তান, প্রিয় জনের সঙ্গে প্রাত্যহিক দান প্রতিদান কলহ মিলনে যে শিক্ষা হয় সে শিক্ষা অল্পবয়স থেকে বোর্ডিং স্কুলে বাস করে হয়নি। তারপরে জীবিকার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াভালে এঁরা যখন হরিণীর মতো ছটফট করেন তখন স্বভাবে আসে বন্যতা, আচরণে আসে ব্যস্ততা এবং বিবাহের সৌভাগ্য ঘটলেও নীরব নিভৃত জীবনে মন বসে না, মন চায় অভ্যস্ত মত্ততা, আগের মতো খাটুনি, আগের মতো নাচ, আগের মতো সন্তানবাচিৎ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বাদীঘটিত তন্ময়তার প্রতি অনিচ্ছা। এ নারী গৃহিণী নারী নয় স্বতন্ত্র নারী। সমাজের কাজে এর অভুল উৎসাহ, প্রভূত যোগ্যতা, নার্স হিসাবে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে হোটেলের ম্যানেজারেন্স হিসাবে আপিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে এ নারী নিখুঁত। সচিব সখী ও শিব্যাকপে এ নারী পুরুষের শ্রদ্ধা জিনে নিয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সর্বঘণ্টে বিদ্যমান দেখি যাকে সে নারী এই স্বতন্ত্র নারী—গৃহহীন, পক্ষপাতহীন, জনহিতপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যে অটল। এ নারী সব পুরুষের সহকর্মিনী, কোনো একজনের রাণী ও দাসী নয়, সকলের সম্মানের পাত্রে, কোনো একজনের প্রেম ও ঘৃণার পাত্রী নয়। কথাতা অবিশ্বাস্য শোনালেও বলতে হবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় socialisation of women চলছে, ভারতবর্ষও বাদ যায়নি। এর ফলে কাব্যলোক থেকে প্রেমদী নারী অন্তর্হিত হলো, তার স্থান নিল সদ্দিনী নারী, passion-এর স্থানে এল understanding।

যুগলক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ইংরেজ নারীর কতক বিশেষত্ব আছে—প্রবীণা ও নবীন। এক্ষেত্রে সমান। প্রথমতঃ, ইংরেজ নারী চিরদিনই স্বাধীন-মনস্ক, শক্তমনস্ক। ইংরেজ পুরুষও তাই। গুরুজনের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়া তার দ্বারা কোনো যুগে হয়নি। সে নিজের ইচ্ছাকে নিজের হাতে রেখে স্বেচ্ছায় সমাজের বান্ধন স্বীকার করেছে, সামাজিক ডিসপ্লিন মেনেছে। এই জন্যেই বিবাহটা দু'জন স্বাধীন মানুষের contract; এতে গুরুজনের হাত পরোক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, নারীত্বের কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শ এ দেশের নারীর সামনে তেমন করে দ্রা হয়নি যেমন আমাদের সীতা সাবিত্রীর আদর্শ। এর ফলে এ দেশের নারী প্রত্যেকেই এক একটি আদর্শ, কোনো দু'জন ইংরেজ নারী কেবল ব্যক্তিহিসাবে নয় type-হিসাবেও এক নয়। সীতা সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমাদের নারীজাতিকে আমরা সীতা সাবিত্রী জাতি বানিয়েছি, তাদের মধ্যে নারীত্বের অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের নিয়ে আরেক থানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত লেখা হলো না, অথচ হেলেন ও পেনেলোপীর পরবর্তিনীদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কত কাব্যই লেখা হয়ে গেল, কত ছবিই আঁকা হয়ে গেল। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই যেমন মনোযোগ গৃহসজ্জার প্রতি, শিশুচর্যা বা পশুচর্যার প্রতি। অধিকাংশ ইংরেজ নারীর সাজসজ্জা রূপকথার Cinderella-র মতো। কতকটা এই কারণে, কতকটা অন্য কোনো কারণে অধিকাংশ ইংরেজ নারীরই বাইরের charm নেই। পুরুষের প্রেমের চেয়ে পুরুষের শ্রদ্ধাই এঁদের কাম্য, সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার কামনা তীব্র।



আবহতত্ববিদদের মুখে ছাই দিয়ে আজ আবার সোনার সূর্য উঠেছে, দশদিক সোনা হ'য়ে গেছে।

কিছুদিন থেকে এমনি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিদিন আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছে, এ যেন একটা প্রাত্যহিক miracle। আকাশ উজ্জ্বল নীল, পৃথিবী উজ্জ্বল শ্যাম, গাছেরা এখনো পাতা ফিরে পায়নি, কিন্তু ফুলের ভারে ভেঙে পড়ছে, মেঠো ফুলের রঙের বাহার দেখে মনে হয় যেন ফুলের আয়নায় সূর্যের আলোর সব ক'টি রঙ বিগ্লেষিত হয়েছে। পাখিরাও বসন্তের সঙ্গে দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরল, তাদের নহবৎ আর থামেই না।

এমনি miracle-এর উপর আস্থা রেখে আমরা মাঝে মাঝে লগুন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে চোখ যায় সেইদিকে চরণ যায়, আহার নিদ্রার ভাবনাটা একাদশম ঘটিকার আগে হাজির হয় না, এবং ভাবনা যদি বা হাজির হয় আহার নিদ্রাকে হাজির করানো সেও এক প্রাত্যহিক miracle। 'মোটের উপর একটা কিছু হ'য়ে ওঠেই ওঠে।'

অথচ ঐটুকু অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাল কাটতেও পারিনে। এত বড় উৎসবসভায় পান পায়নি ব'লে খুঁৎ খুঁৎ করবে কোন্ বেরসিক? একসঙ্গে এতগুলো আনন্দ মিলে আক্রমণ করেছে— রঙ, রূপ, গান। সৌন্দর্যের বাণ সর্বদা বিধে শরশয্যা রচনা করল। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই, এত অসহায়। স্তরের মতো দেহমন লুটিয়ে পড়ে। পরস্পরকে অকারণে ভালোবাসি, অপরিচিতকে হারানো বন্ধুর মতো বুকে টানি। কুয়াশার মতো সংশয় উধাও হ'য়ে গেছে, ফেরার! আকাশবাণী আলোর মতো হৃদয়বাণী প্রত্যয় দিবসে সূর্যের মতো নিশীথে চন্দ্রের মতো জাগরুক। জগতের পূর্ণতা জীবনের অপূর্ণতাকে সমুদ্রের কোলে স্পঞ্জের মতো ওতপ্রোত করেছে। ধন্য আমরা—সৌন্দর্যসায়রের কোটি তরঙ্গাঘাত সহিতে সহিতে আমরা আছি, আমাদের দুঃখগুলি আনন্দসায়রের বীচিবিভঙ্গ। অভাব? এমন দিনে অভাবের নাম কে মুখে আনবে? আমাদের একমাত্র অভাব—বাণীর অভাব, তৃপ্তি জানাবার বাণীর। আদিম মানবেরই মতো অন্তিম মানবও বাণীর কাঙাল থেকে যাবে, কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণীর। সেই জন্যেই তো মানুষের মধ্যে কবি সকলের বড়—ঋষির চেয়েও, বীরের চেয়েও, ব্যবস্থাপকের চেয়েও, ক্ষুধা-নিবারকের চেয়েও, লজ্জা-নিবারকের চেয়েও। কবিকে বাদ দিলে সুন্দরের সভায় মানুষ বোবা, কবিকে কাছে রাখলে তার কথা ধার নিয়ে মানুষের মান থাকে। নইলে ঋষি থেকে ক্ষুধা-নিবারক পর্যন্ত কেউ একটা পাখির সম্মানও পেতেন না।

শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগ্বিজয়ে যেতেন, বসন্তকালে একালের আমরাও দিগ্বিজয়ে যাই। আমরা যাই কোন্ দিকে কোন্ আপনার লোক অচেনার মতো আত্মগোপন ক'রে রয়েছে তাদের মুখোশ খসাতে। এমন দিনে কি কেউ কারুর পর হ'তে পারে? এ কি কুয়াশা-কালো দিন যে শত হস্ত দূরের মানুষকে শূদ্রী ব'লে ভ্রম হবে? নিজের দুধের বাটিতে মুখ ঢেকে ভাবব পৃথিবী-গুহ্ন আমাদের দেখে হিংসায় জ্ব'লে পুড়ে মরছে? না, বসন্তকালে আমাদেরও মুকুল খোলে, আমরা ভালোবাসার সীমা খুঁজতে ফুলের গন্ধের মতো দিশাহারা হই, কোন্ শহর থেকে কোন্ গ্রামে পৌছাই, কোন্ তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন্ বেড়া উপকাই, কোন্ গাছের তলায় শুয়ে কোন্ কোবিলের গলা শুনি, কোন্ চেরির গুচ্ছ চুরি ক'রে কোন্ প্রিয়জনকে সাজাই, অতি অপরিচিত শিশুর গায়ে চকলেলেটের টিল ছুঁড়ে ভাব করি। এটা আমাদের দোষ নয়, ঋতুর দোষ। নইলে

আমাদের মতো কাজের লোকেরা কি টাইপরাইটারের খটখটানি ফেলে মোরগের কু-কু-কু-উ শব্দে যায়? না, রাজারা রঙমহাল ছেড়ে রণক্ষেত্রে রঙ মাখতে যায়?

শীতকালের ইংলণ্ড যদি নরকের মতো, গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড বর্গের মতো। প্রতিদিন হয়তো সূর্য ওঠে না, উঠলেও প্রতি ঘন্টায় থাকে না, কিন্তু তাতে কী? ফুলের মধ্যে তার রঙ, পাতার মধ্যে তার আলো, পাখির গলায় তার ভাব জমা থাকে। মেঘলা দিনে ঐ সঞ্চয় ভেঙে খরচ করতে হয়। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রথম কথা তার গড়ন। ইংলণ্ড বন্ধুরগাত্রী। যে কোনো একটা ছোট গ্রামে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে কী দেখি? দেখি যেন একখানা concave আয়না। রেখার উপরে রেখা হুড়মুড় ক'রে পড়েছে। অসমতল বললে ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না। বলতে পারি অযুত-সমতল। সমতলের সঙ্গে সমতল মিলে অযুত কোণ রচনা করেছে, এবং এক কাঠা জনিকৈও সমতল রাখেনি। যেটুকু সমতল দেখা যায় সেটুকু মানুষের কুর্কীর্তি। সুখের বিষয় ইংলণ্ডের সমাজের মতো ইংলণ্ডের মাটিকেও মানুষ সরল রেখা দিয়ে সরল করেনি। এই এক কারণে শীতকালেও ইংলণ্ড অসুন্দর বা অস্বাস্থ্যকর হয় না, হয় কেবল অন্ধকার। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই ইংলণ্ডে বর্ষা। কিন্তু বর্ষার জল দাঁড়াবার মতো একটু সমতল খুঁজে পায় না।

দেশের মাটির সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ বোধ হয় কথার কথা নয়। প্রাণীসৃষ্টির একটা স্তরে মানুষ ও উদ্ভিদ একই পর্যায়ভুক্ত নয় কি? আনার মনে হয় ইংরেজের মন যে Law and Orderএর জন্য এত ব্যাকুল এর কারণ তলে তলে সে তার মাটির মতো Law and Orderহীন, অযুত-সমতল। ইংলণ্ডের মাটির উপরকার জল যেমন অহরহ সমতল পাবার চেষ্টা করছে, পাচ্ছে না, ইংরেজের সমাজও তেমনি যুগে যুগে সাম্যের চেষ্টা ক'রে এসেছে, পায়নি। Snobbery ইংরেজ সমাজের মজ্জাগত, উপর-তল না হ'লে তার সামাজিক রথ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারে না। অথচ সাম্যকেও তার মন চায়: নইলে চেষ্টা থাকে না, সবই আপনা-আপনি ঘটতে থাকে, উপরের জল চোখ বুজে নিচে যায়, নিচের ধোঁয়া চোখ বুজে উপরে ওঠে। এমন নিশ্চেষ্টতা আমাদের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে আমাদের সামাজিক রথ কোনোমতে চলছে ও কোনো মতে থামবারও নয়। হিন্দুর মরণ নেই, সে হিন্দুবিধবার মতো, টিকে থাকবেই।

ইংরেজের মনের ভিত্তি অহির—সে যেন পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেখানে সবই বিশৃঙ্খল, সবই আওন! অবচেতনভাবে সে ঝড় ঝঞ্ঝাকে ভালোই বাসে, সমস্যার অভাব সহিতে পারে না, কিছু না হোক একটা crossword puzzle তার চাইই, কোনো রকম একটা যুদ্ধ—হোক না কেন 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'—না থাকলে সে বেকার। 'হরি হে, কবে শান্তি ও শৃঙ্খলা পাব', এটা তার চেতনার কথা। তার অবচেতনতার কথা কিন্তু 'শান্তি ও শৃঙ্খলাকে পাবার চেষ্টা যেন কোনো দিন ফাস্ত না হয়, এমনি চলতে থাকে।' ইংলণ্ডের একটা হাত সমস্যার সৃষ্টি করে, আরেকটা হাত সমস্যার ধ্বংস করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র না থাকলেও অন্তরালে দুই হাতের একই স্বার্থ—তারা পরস্পরের অন্তরটিপুনি অনুসারে সমস্যার বাড়তি কন্ঠি ঘটায়, মীমাংসা কাঁচা-পাকা রাখে। আপিসের দুই চালাক কর্মচারী তারা, অদরকারী ব'লে কোনো দিন তারা বেকারের দলে পড়ল না। ইংলণ্ডকে দেখলেই মনে হয়, সাবাস, খুব খাটছে বাটে, কী ব্যস্ত! কিন্তু তদারক করলে ধরা পড়ে যায়, সমস্যা ও মীমাংসার উপরে যে একটা স্তর আছে সে স্তরে কি এ দেশ কোনো দিন উঠবে! সাত্বিকতার শিবনেত্র কি কখনো এর ললাটে झলবে। এ যে সব পর্যবেক্ষণ করে, কিছুই দেখে না, সব জ্ঞাত হয়, কিছুই জানে না, সব বোঝে, কিছুই উপলব্ধি করে না। এর জীবন যেন জীবন ব্যাপী ছেলেমানুষি। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত লামুর সঙ্গে লামুর মতোই ঘুরছে!

প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী সাজে, মানুষ তখন তার সাজ দেখবার জন্য কাজ কর্ম ফেলে রাখে; এই ভন্যে আমাদের বারোমাসে তেরো পার্বণ। ইংলণ্ডেও নাকি এককালে মাসে মাসে দোল দুর্গোৎসব ছিল, কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। এখন প্রতিরাত্রে পার্বণ চলে নাচঘরে ও সিনেমায়, প্রতিদিন খেলার মাঠে। বড় দিন বা ইস্টার এখন নামরক্ষায় পর্যবসিত। ভারতবর্ষের লোকের কাছে এই হিসাবে ইংলণ্ড অত্যন্ত নিরানন্দ দেশ। এ দেশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পূজ্যের সঙ্গে পূজারীর সম্বন্ধ থেকে কখন নেমে এসে শিকারের সঙ্গে শিকারীর সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছে। এখানকার আমোদ প্রমোদগুলো যেন যুদ্ধে জিতে শত্রুর মৃত দেহের উপরে মাতলামি করা। এমন আমাদের শিরায় শিরায় ভয়, মৃত্যুভয় দারিদ্র্যভয় ব্যাধিভয়। প্রকৃতির প্রতিশোধগুলোর নামে মানুষ বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতি যে কত রকমে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে হিসাব হয় না। একটা মস্ত প্রতিশোধ হচ্ছে যুদ্ধ। আধুনিক কালে আমরা অধিকাংশই রুটিন দেখে ইস্কুলে পড়ি, আপিসে কাজ করি, খেলতে যাই ও তামাসা দেখি। প্রত্যেক দেশেই এখন হাজার হাজার ইস্কুল কলেজ, লাখে লাখে আপিস কারখানা সংখ্যাজীত সিনেমা নাচঘর। প্রত্যেকটি মানুষ হয় সরকারী নয় বেসরকারী ব্যুরোক্রেট—সরকারী ডাক-ঘরের মেয়ে কেরানী থেকে Lyonsএর চায়ের দোকানগুলোর কর্মচারিণী পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। এই কোটি কোটি মৌমাছির চিত্তবিনোদনের জন্যে একই অভিনেতা অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয় ক'রে যান। তিনশোবার বাজালে একখানা গ্রামোফোনের রেকর্ডেরও ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু ধন্য এদের গলা!

এর পরিণাম ভীষনে বিরক্তি। ছুটির দিন সস্তা টিকিট কিনে ট্রেন বোঝাই ক'রে একই স্থানের পাশাপাশি হোটলে যখন হাজার হাজার জন অভ্যাগত টমাস কুকের তভনী সংকেতে পরিচালিত হন ও charabancএর পিঠে চ'ড়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে যান তখন অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দু'জনেই 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ক'রে ওঠেন। তাঁরা বলেন, 'রুটিনের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, মানচিত্রের হাত থেকে, এস্টিমেটের হাত থেকে।' তখন এমন কোথাও যাবার জন্যে মানুষ ছুটফুট করে যেখানে টমাস কুক নেই, পাকা সড়ক নেই শোবার ঘরওয়ালা মোটর কোচ নেই—এক কথায় আমাদের শিশুবর্জিত পণ্ডঅলঙ্কৃত সর্ব্বাচ্ছন্দ্যমুক্ত ফ্ল্যাটের আরাম নেই। সমস্ত পৃথিবীটা যেমন শৈল: শৈল: একই রকম হয়ে উঠছে, দেখে মনে হয় টমাস কুক গ্রামে গ্রামে দোকান খুলবে, কাউকে প্রাণ হাতে ক'রে বেহিসাবীভাবে অজানা পথে বিবাগী হ'তে দেবে না। তখন মানুষের একমাত্র আশা ভরসার হল হবে যুদ্ধক্ষেত্র, সত্যিকারের ছুটি পাওয়া যাবে ঠিক সেইখানেই, সেখানকার কিছুই আগে থেকে জেনে রাখা যাবে না, প্রতি পদেই অক্সাভের সঙ্গে দেখা।

গত মহাযুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে তারই পূরণের জন্যে প্রকৃতি অপেক্ষা করেছে, তাই এখনো আমরা যুদ্ধের নামে জিভ কাটছি, মেয়েরা আগামী পার্লামেন্টটাকে Parliament of Peacemakers করবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু যে শিশুরা গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হ'য়ে বাড়ছে, যাদের কল্পনাকে খোরাক দেবার জন্যে দু'লোকে তুলোকে একটিও অপরিচিত প্রাণী একটাও অপরিচিত স্থান নেই, সেই সব বাস্তববাদী যখন বড় হয়ে দলে দলে সরকারী বে-সরকারী ব্যুরোক্রেসীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে রুটিন সামনে রেখে কাজ করবে তখন তাদের প্রত্যেকের চোখের সন্মুখে না হয় ঝুলিয়ে রাখা গেল 'There is no fun like work' এবং সোশ্যালিস্টদের দয়ায় তাদের কর্মকাল না হয় ক'রে দেওয়া গেল দিনে পাঁচ ঘণ্টা, তবু তারা সেই সোনার খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে মরতে চাইবে না কি? অত্যন্ত বেশি সংঘবদ্ধ হওয়ার পরিণাম চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে, প্রকৃতি কোনো সংঘর্ষেই টিকতে দেয়নি,—না বৌদ্ধ সংঘর্ষে, না খ্রীস্টান সংঘর্ষে। এবং অগ্ন্যবস্ত্রের জন্যে যে নতুন সংঘর্ষটা প্রতি দেশেই নানা নাম নিয়ে শশীকলার নভো বাড়ছে সোশ্যালিজন্ তার শেষ অধ্যায় বটে, কিন্তু

তার পরেও উপসংহার আছে। এবং সে উপসংহার তেমন মুখরোচক নয়।

প্রকৃতির প্রতি ইংরেজের দরদ এখনো লোপ পায়নি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাতি নাতনীকে দেখতে এখনো পাওয়া যায়। রাস্তার দু'ধারে গাছ রুইবার জন্যে সমিতি হয়েছে, উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপাশ (Garden Suburb) রচিত হচ্ছে, পল্লীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার আন্দোলন ত্রো কবে থেকে চ'লে আসছে, কিন্তু রেলগাড়িওয়ালা, মোটরগাড়িওয়ালা ও নতুন বাড়িওয়ালাদের নৃকৃদৃষ্টির উপরে ঘোমটা-টেনে-দেওয়া পল্লীসুন্দরীর ক্ষমতার বাইরে।<sup>\*</sup> দু'পাঁচজন অসমসাহসিক স্বপ্নভ্রষ্টা পল্লীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের নব সভ্যতাকে আবাহন করতে ব্যগ্র, কিন্তু হাটের কোলাহলে তাঁদের কণ্ঠস্বর বড়ই ক্ষীণ। পলিটিসিয়ানদের কাছে তারা আমল পান না, কেননা পলিটিসিয়ানরা হয় বড় বড় কল কারখানাওয়ালাদের তাঁবেদার, নয় কল কারখানার শ্রমিকদের সর্দার। দুই দলের স্বার্থই আরো অধিকসংখ্যক কল কারখানা পাকা সড়ক নতুন বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বেকার সমস্যা দূর করবার জন্যে এরা যা হাতের কাছে পাচ্ছে তাই করতে উদগ্রীব, দশ বছর পরে তার ফলে দেশের চেহারাটা কেমন হবে তা ভাবতে গেলে ভোট পাওয়া যায় না; ক্ষুধিভের ক্ষুধাও বাড়তে থাকে। এমনিই তো দেশটাতে জন্মি যত আছে রাস্তা তার বেশি, রাস্তা যত আছে বাড়ি তার বহুগুণ; আরো দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সারা ইংলওটা একটা বিরাট শহর, এবং এই শহরের লোক নিজেদের খাদ্য নিজেরা একেবারেই উৎপাদন করে না। বলা বাহুল্য শোশ্যালিস্টরা শহুরে শ্রমিকদের ভোটের উপর নির্ভর করে; গ্রাম্য কৃষকদের জন্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। কৃষকদের ভোট পাবার জন্যে অন্যান্য দলের এক-একটা কৃষি-পলিসি আছে বটে, কিন্তু পলিটিসিয়ান জাতীয় প্রাণীদের কাছে দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা বৃথা, তারা ভূবড়ির মতো হঠাৎ জ্ব'লে হঠাৎ নেবে, তাদের জীবদ্দশা বড় জোর বছর পাঁচেক। সমগ্র দেশের নব সভ্যতার আবাহন করা তাদের কাজও নয় তাদের সাঙ্গেও না। তাদের একদল আরেকদলের জন্যে বসবার জায়গা রেখে যেতেই জানে, সমস্ত জাতিটার চলার ভাবনা তাদের অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না।

এখনকার ইংলওকে দেখে দুঃখিত হবার কারণ আছে। সে কারণ এমন নয় যে ইংলওের নৌবহরকে আমেরিকার নৌবহর ছাড়িয়ে উঠছে, ইংলওের উপনিবেশেরা পর হ'য়ে যাচ্ছে, ইংলওের অধীন দেশগুলি স্বাধীন হ'য়ে উঠছে, ইংলওের অন্তর্বিবাদে তার ধনবৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যের জন্যে ইংলও কোনোদিন কেয়ার করেনি, যেমন ঐশ্বর্যের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশ কোনোদিন কেয়ার করেননি। ইংলও একহাতে অর্জন করেছে অন্যহাতে উড়িয়ে দিয়েছে, একদিন যাদের ক্রীতদাস করেছে অন্যদিন তাদের মুক্ত ক'রে দিয়েছে, যেদিন আমেরিকা হারিয়েছে সেইদিন ভারতবর্ষ পেয়েছে। পুরুষ্যস ভাগ্যম্। আধিভৌতিক লাভক্ষতির কথা ইংলও এতদিন ভাবেনি, এইবার ভাবতে শুরু করেছে দেখে মনে হয় এবার আর তার সেই পুরাতন অনামনস্বতা নেই, এবার সে অক্ষমের মতো নিজের অক্ষমতার কথাই ভাবছে। ব্যাপার এই যে ইতিমধ্যে কবে একদিন—উনবিংশ শতাব্দীতেই বোধ হয়—ইংলওের আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে কিংবা জীবন্মৃত হয়েছে। শেক্সপীয়ার থেকে ব্রাউনিং পর্যন্ত এসে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। যে ইংরেজের প্রাণ ছিল adventure বা বিপদবরণ, সে এখন মত্ত নিয়েছে, 'Safety first'। যা-কিছু এক কালে অর্জন করেছে তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ করতে চায়। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, বীরছাড়া অন্য কেউ বসুন্ধরাকে ভোগ করতে পারবে না, অর্থাৎ অর্জন করা ও ভোগ করা একসঙ্গে চলা চাই। বস্তুতঃ অর্জন করাটাই ভোগ করা। অর্জিত ধনকে র'য়ে ব'সে ভোগ করা হচ্ছে সংসারের আইনে

\* একটি সমিতির সেক্রেটারী লিখছেন, 'আপনি কি জানেন যে আমাদের বনফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই সমিতির প্রয়াস ও উপায় উদ্ভাবনে আপনি যোগ দেবেন?'

চুরি করা। এ আলস্যকে সংসার কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। যার মাইট নেই তার রাইট তামাদি হ'য়ে গেছে, যার হুজুম করবার ক্ষমতা নেই সে খেতে পাবে না।

কিছুকাল থেকে আধিভৌতিক ঐশ্বর্যের উপরে মন দেওয়া ছাড়া ইংলণ্ডের গতাস্তর থাকেনি, কেননা মন দেবার মতো আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য তার কখন ফঞ্জে গেছে। এখন আধিভৌতিক ঐশ্বর্যও যায়-যায় দেখে তার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ধনকে যে মানুষ পরম কাম্য মনে ক'রে কোটিপতি হলো, সে যখন দেখে যে আরেকজন কেমন করে দ্বি-কোটিপতি হয়েছে তখন সে চোখে আঁধার দেখে, তার পা টলতে থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে যখন ইতরলোকের ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে যায় ও একটি অলীক কথা বলতে গিয়ে দশটি গুনে আসে, তখন তার যে অবস্থা হয় ইংলণ্ডের অনেকটা সেই অবস্থা। ধনবলকে সে সকলের থেকে শ্রেয় মনে করেছিল, আজ ধনবলে সে প্রথম থাকতে পারছে না আমেরিকা তার চেয়ে বড় 'power' হ'য়ে 'জগৎ গ্রাসিতে করেছে আশয়'। ইংলণ্ডের এই অপমান এখনো তার মর্মে বেঁধেনি, কিন্তু চামড়ায় বিধছে। বেশ একটু 'inferiority complex'ও তার মধ্যেও লক্ষ্য করছি। ভারতবর্ষের মতো সেও বলতে আরম্ভ করেছে, 'আমি বড় গরীব, আমি গোবেচারা', কিন্তু সংসারের আইনে গরীব হওয়া হচ্ছে কান্দীর আসামী হওয়া। হয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে হবে, নয় আধিভৌতিক ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে হবে, অস্তিত্বের মূল্য দেবার জন্য ধনী না হ'লে চলে না।

## ॥ সতেরো ॥

কেবলমাত্র সূর্যের আলোর দ্বারা একটা দেশের কতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে তার সাক্ষী গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড। মাটি তেমনি আছে, মানুষ তেমনি আছে, সভ্যতার জগন্নাথের রথ তেমনি উদ্ভাস্তগতিতে চলেছে; কিন্তু মেঘ-কুয়াশার কপাট যেই খুলল অমনি দেখা দিল সূর্যলোক চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোক। ইংলণ্ড ছাড়াও যে দেশ আছে সমুদ্রের নজরবন্দী হ'য়ে মেঘ-কুয়াশার কারাগারে সেকথা আমরা জানতুম না; এখন দেখা গেল আকাশজোড়া অমরাবতী। স্বর্গ আমাদের এত কাছে যে হাত বাড়ালে হাতে ঠেকে, কেবল হাত বাড়ানোটাই শক্ত, কেননা হাত দিয়ে যে আমরা মাটি আঁকড়ে থাকতেই ব্যস্ত।

এমনি মধুর গ্রীষ্মকালে কেমন ক'রে মানুষের যুদ্ধে মতি হয় অনেক সময় আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি। শীতের অন্ধকারে শরীরটাকে গরম রাখবার জন্যে পরস্পরের শরীরে বেয়োনেটের চিমাটি কাটা ও পরস্পরের মুখ দেখবার জন্যে বারুদে আগুন ধরানো, এর অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু বসন্তকালে গ্রীষ্মকালে শরৎকালেও অরসিকের মতো যুদ্ধ করতে কেমন ক'রে ইউরোপের লোকের প্রবৃত্তি হলো? আকাশের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে দিনের পর দিন যায়, তবু তার রহস্যের কূল পাওয়া যায় না। সে আমাদের নিত্য বিশ্বয়। পাখিগুলো যে কেন সারাবেলা গান গেয়ে মরে, এত ফুল যে কোন আনন্দে ফোটে, বন ও মাঠ দখল করেও রাজপথের বক্ষ ভেদ ক'রে ঘাস মাথা তোলে কেন, মোটরের দাপাদাপিকে অগ্রাহ্য ক'রে শামুক তার অবসর মতো ঘন্টায় দশ ইঞ্চি অগ্রসর হয় কেন, এই অপরাধ শহরটাকে কেন এমন অপূর্ব দেখায়, কলকারখানার কলঙ্ক নিয়েও কেন ইংলণ্ড এখনো

অস্মানযৌবনা—এসব ধাঁধার একমাত্র জবাব, সূর্যের করুণা।

সূর্য অভয় দিয়ে বলছে, পৃথিবীকে তোমরা যত খুশি কুৎসিত যত খুশি দুঃখময় যত খুশি বিশৃঙ্খল করো না কেন আমি আছি তার সুখ-সৌন্দর্য-শৃঙ্খলার কুবের-ভাণ্ডারী, আমি তাকে সোনা ক'রে দেব।

সূর্য আমাদের বিনানুল্যের বীমা-কোম্পানী। যখন বা হারায় তা গড়িয়ে দেয়। দীর্ঘন হারালেও জীবন ফিরিয়ে দেয়। সূর্যের assurance শুনলে তাই ফুল-পাখি-ঘাস-শামুকের মতো আমাদেরও প্রাণে ভরসা আসে, আমরা জীবনকে একটা কানাকড়ির চেয়ে মূল্যবান মনে করিনে, আমরা ওদেরি মতো নিরুদ্বেগে দিন কাটাই, অকারণে খুশি হই। ঐ যে শাদা প্রজাপতিটি, ওর জীবন একটা দিনের—কোথায় ওর মৃত্যুভয়, কোথায় ওর জীবনের মূল্য, কোথায় ওর অগ্রির কর্তব্য? খোলা আকাশের জানলা দিয়ে সভ্য মানুষের অর্থহীন হট্টগোল ও আত্ননাদ সুতো-হেঁড়া ফানুসের মতো কোথায় উড়ে গেল।

এমন দিনে চোখ-কান-মন খোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়ে সুখ আছে। যাই দেখি তাই নতুন মনে হয়, আশ্চর্য মনে হয়। রাস্তার এক কোণে দুই বুড়ী ব'সে ফুল বেচছে। অত ফুল তারা পেল কোথায়? সব ফুলের কি তারা নাম জানে, মর্ম বোঝে, যত্ন জানে? শাকসবজীর হাট; নানাদেশের ফল পাতা জাহাজে ক'রে গাড়িতে ক'রে এসেছে। গাড়ি সেই মাদ্রাতার আমলের টাট্টুঘোড়ার গাড়ি, গাধার গাড়ি, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার গাড়োয়ান দুক্কার শব্দ ক'রে চলেছে, তার হাঁটু থেকে পা অবধি একটা পাটের খলে কব্বলের কাজ করছে, তার অলক্ষিতে কখন একটা ছোঁড়া গাড়ির পেছন ধ'রে খুলে পড়েছে। হাটের কাছে অপেরা হাউস, রাত্রে Chaliapine অপেরায় নামবেন, সকাল থেকে লোক জ'মে গেছে; এক একখানা ক্যাবিন্সের চেয়ার ভাড়া ক'রে এক একজন ব'সে গেছে সন্ধ্যাবেলা কখন টিকিট-ঘর খুলবে তারি প্রতীক্ষায়; কেউ সংগীতের বরলিপি নকল করছে; কেউ বই পড়ছে; কেউ গল্প করছে; কেউ বা চেয়ারের উপর নিজের নামের কার্ড এঁটে দিয়ে আপিসে গেছে কিংবা বেড়াতে গেছে। কাছেই ডুরী লেনের থিয়েটার—কবকের থিয়েটার—গ্যারিক ও সেরা সিডন্স একশো দেড়শো বছর আগের মানুষ। ইংলণ্ডের থিয়েটারগুলোর অধিকাংশই অত পুরোনো নয়, কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে বহু শতাব্দীর রচি ও সাধনা রয়েছে—এক অভিনেতার থেকে আরেক অভিনেতার সংগ্রামিত, লুপ্ত থিয়েটার থেকে চলিত থিয়েটারে হস্তান্তরিত। সেই জন্যে ইংলণ্ডের থিয়েটার এক একটা যুগে খুব উঁচুদরের না হ'লেও কোনো যুগেই নিচু দরের হ'তে পারে না, আগের যুগের আদর্শ তাকে পাক থেকে টেনে তোলে। ফ্রান্সের থিয়েটার আরো পুরাতন—গ্রাস যতদিনের থিয়েটার ততদিনের। সে যেন জাতির ধর্মী। তার স্বাস্থ্যনাশ জাতির স্বাস্থ্যনাশের সামিল। যোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, মহাযুদ্ধের দিনেও ফ্রান্সের থিয়েটারে লোকারণ্য। ইংলণ্ডের থিয়েটার তার অতখানি নয়—ইংলণ্ডের ধর্মী তার ক্রিকেট খেলার মাঠ, তার ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

কাছেই হাইকোর্ট। হাইকোর্টটি যে-কোনো ভারতবর্ষীয় হাইকোর্টের থেকে ছোট ও জন-বিরল। ইংরেজের দেশে স্পেক্টাকুলার কিছুই নেই, এক যুদ্ধ জাহাজ ছাড়া। তাই ভারতবর্ষের লোক লঙনে এসে বিষম ফেপে যায়—এই তো দেশ, এই তো মানুষ, এই তো দৃশ্য, এই তো খাদ্য, এই দেখতে এতদূর আসা! লঙনের অর্ধেকের বেশি লোক অকথ্য বস্তির বাসিন্দা, মে-ফেয়ারের অদূরেই ওয়েস্ট-মিন্স্টারের বস্তি, পার্লামেন্টের প্রদীপ যেখানে জ্বলছে সেইখানেই আঁধার। মে-ফেয়ারও এমন কিছু আহা-মরি না, আমাদের মালাবার হিল্ ওর থেকে ঢের বিলাস-যোগ্য। বিলেত দেশটা মাটির বলে মাটির! ব্যাক পাড়তে বেড়াতে যাও—কলকাতার ফ্রাইভ স্ট্রীটের দোসর। টেম্‌স্‌ নদীর

চেহারা তো জানেই—সিদ্ধপ্রদেশে বোধ করি ওর থেকে বড় বড় নালা আছে। লণ্ডনের বাগানগুলো দেখে একজন নাহোরবাসীর নাক সিটকানো দেখবার মতো। উত্তর ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মসজিদ ও দক্ষিণ ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির ইংলণ্ডের ক্যাথিড্রালগুলোকে হার মানায়। রাজবাড়ির তুলনা ভারতবর্ষে অন্ততঃ ছ'শো বার মিলবে, কেননা ভারতবর্ষের সামন্ত রাজারা ক্ষমতায় যাই হোন জাঁকজমকে এক একটি চতুর্দশ লুই। পঞ্চম জর্জ তো তাঁদের তুলনায় একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষের লোক সাইটুসীয়ার হিসাবে ইংলণ্ডে এলে ঠ'কে যাবে। সিনেমা দেখাই যদি অভিপ্রায় হয় তবে দেশে সিনেমা স্থাপন করতে তো বেশি খরচ লাগে না। বিদ্যালভের জন্যে যদি আসতে হয় তবে এত দেশ থাকতে কেবল ইংলণ্ডে কেন? হাঁ, ব্যবসা করতে আসা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তা করতেও গোটা দুনিয়া প'ড়ে আছে।

তবু ভারতবর্ষের লোকের সব দেশের চেয়ে বেশি ক'রে ইংলণ্ডেই আসা উচিত। এবং সব দেশের লোকের চেয়ে ভারতবর্ষের লোকেরই ইংলণ্ডে আসা বেশি দরকার। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড চরিত্রের জগতে antipodes। ইংলণ্ডের যে গুণগুলি আছে ভারতবর্ষের সেই গুণগুলি নেই, ও ভারতবর্ষের যে গুণগুলি আছে ইংলণ্ডের সেই গুণগুলি নেই। এই এক কারণে এত দেশ থাকতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে যোগাযোগ ঘটল। এবং এই এক কারণে স্বাধীন ভারতবর্ষকেও সাম্রাজ্যহীন ইংলণ্ডের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে। ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া কমবেশি ভারতবর্ষেরই মতো। তাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শেখবার আছে অনেক কিন্তু তাদের চরিত্র ভারতবর্ষের চরিত্রের সঙ্গে এত মিলে যায় যে তাদের চরিত্র থেকে ভারতবর্ষের আয়ত্ত করবার আছে অল্পই। অন্য কথায় তারা ভারতবর্ষের সংগে, তাদের সঙ্গে বিবাহ বড় বেশি ফল দেবে না। ইংলণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে ঘরে টানে, ইংলণ্ড সবাইকে পথে বার করে। ইংলণ্ড খোঁজায়, ভারতবর্ষ খোঁজার শেষ ব'লে দেয়। ইংলণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ব্রিটানিয়া নিষ্ঠুরা স্বামিনী,—তাকে খুশি করবার জন্যে প্রাণ হাতে ক'রে জাহাজ ভাসাতে হয়, হয় রক্ত নিয়ে ফিরে আসা, নয় প্রাণ হারিয়ে দেওয়া, নয় উপনিবেশ গ'ড়ে ফিরে আসবার নাম না করা। ভারতবর্ষ কলঙ্গাময় ঋষি-গৃহস্থ,—ক্রৌঞ্চ পাখিকে সাহুনা দেয়, স্বামীবর্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সেই তার স্নেহের অতিথি। একের চরিত্রের চির বিপদবরণস্পৃহা অপরের চরিত্রের সহজ শান্তির সঙ্গে সম্মিত হবে, এই অভিপ্রায় উভয়ের বিধাতার মনে ছিল। ইতিহাস তো এক রাশ আকস্মিকতা নয়। আকাশের এক কোণে বাতাসের অভাব ঘটলে অন্য কোণ থেকে যেমন বাতাস ছুটে যায়, ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণতা দিতে ইংলণ্ড তেমনই ছুটে গেছে। অন্য দেশ যায়নি, কারণ অন্য দেশ ভারতবর্ষেরই মতো। অন্য দেশ গিয়ে ফিরে এসেছে, কারণ অন্য দেশকে ভারতবর্ষের দরকার ছিল না।

একথা ঠিক যে, ফ্রান্স যদি ভারতবর্ষের হাত ধরত তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার মনের অমিল ঘটত না, যেমন ইংলণ্ডের সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু তা হ'লে ভারতবর্ষের চরিত্র কোনো দিন পূর্ণতা পাবার সুযোগ পেত না। ফ্রান্স যে দেশে গেছে সে দেশকে ফ্রান্সে পরিণত করেছে, সে দেশকে বলেছে—তোমরাও ফরাসী, তোমরাও স্বাধীন। এ বাণীর সম্মোহন কোনো দেশ এড়াতে পারেনি। ফ্রান্সের দখলে থাকলে আমরা কেউ কেউ ফ্রান্সের সেনাপতি হ'য়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বা সম্রাট হ'তে পারতুম, যেমন কর্সিকাবাসী ইতালিয়ানবংশীয় নেপোলিয়ন একদিন হয়েছিলেন। কেবল নিজেকে ফরাসী ব'লে ঘোষণা করতে হতো, এই যা কষ্ট। ফরাসীরা অনেকটা মুসলমানদের মতো ডেমোক্রাটিক—তাদের দলে ভর্তি হওয়া খুব সোজা, এবং ভর্তি হ'লে আর পালাতে ইচ্ছা করে না। ভারতবর্ষের মুসলমান আরব দেশের মুসলমানের কাছ থেকে কীই বা পেয়েছে, শুধু নামটা

ছাড়া। তবু সেই নামটাকে পাসপোর্ট ক'রে সে পৃথিবীর সব দেশে সমনামাদের প্রীতি পায়। ফরাসী নামটারও তেমনি মহিমা। এই নাম নিয়ে আমরা এত দিনে ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে লিখতুম 'ফ্রেঞ্চ রিপাব্লিকের কয়েকটা জেলা'—যেমন আলসাস বা লোরেন তেমনি বাংলা বা আসাম।

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সবই আমরা পেতুম, ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতুম না। কিন্তু আমাদের কোনো বৈশিষ্ট্যকেই ফ্রান্স আমল দিত না, ফ্রান্সের লজিকপ্রিয় মগজ অসদভি সহ্য করতে পারে না। সম্ভবতঃ ফরাসীরা আমাদের দেশে একটিও দেশীয় রাজ্য থাকতে দিত না, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা আঁকবার পক্ষে সোজা হতো। হিন্দু মুসলমান আইনের বদলে চালাত কোড্ নেপোলিয়ন। এক কথায়, আমাদের ভারতীয়ত্বটুকু কেড়ে নিয়ে আমাদের দিত তার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ফরাসীত্ব।

কিন্তু গোড়ায় গলদ, ফ্রান্স কোনো দিন ভারতবর্ষ নিতেই পারত না। কেননা ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষগুণ মোটের উপর আমাদের কাছাকাছি। ফরাসীরা গৃহশ্রিয়, দেশ ছেড়ে বেরুতেই চায় না, বড় জোর বিড়কির কাছে আফ্রিকা পর্বত ওদের গতিবিধি। ইন্দোচীন প্রভৃতি খুচরো উপনিবেশগুলোকে ধর্তব্য মনে করলে ফিজি প্রভৃতি জায়গায় আমাদের উপনিবেশকেও ধরতে হয়। গৃহশ্রিয় মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া করা; চক্রান্ত করা; সন্ধি করা ও পাশাপাশি থালা। ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভায় যতগুলো চেয়ার ততগুলো দল। ফ্রান্সের সাহিত্যরাজ্যেও যতগুলি লেখক ততগুলি পত্রিকা, যতগুলি পত্রিকা ততগুলি দল। কোনো একটা দলের সঙ্গে সন্ধন না থাকলে লেখককে লোকে অজ্ঞাতকুলশীল ভেবে খাতিরই করতে চায় না। ফ্রান্স পরিবারপ্রধান দেশ। পরিবারের সঙ্গে জড়িত না হ'লে পরিবারের ভার মাথায় না নিলে ব্যক্তিকে সে ব্যক্তিই মনে করে না। ইংলও ব্যক্তিকে চ'রে বেড়াবার পক্ষে যথেষ্ট মুক্তি দিয়েছে, John Bull যাঁড়ই বটে, তার পারিবারিক দায়িত্ব সামান্য। তাই ইংরেজের ব্যক্তিত্ব একলা মানুষের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যাঁড়েরও গোষ্ঠ থাকে, বৃহৎ গোষ্ঠ। ইংরেজের বৃহৎ ক্লাব, বৃহৎ পার্টি। বৃহৎ পার্টির একজন না হ'লে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এ দেশে নগণ্য এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অক্রিয়। এ দেশের মাটিতে আকাশকনুন্ম যদি বা জন্মায় তবে সে নেহাৎ আগছা, তাকে উপড়ে ফেলবার আগেই সে মানে মানে স'রে পড়ে। Shelley ইটালি প্রয়াণ করলেন। Bertrand Russell আমেরিকা প্রয়াণ।

ইংলণ্ডের চরিত্রের আরেকটা গুণ, তার চরিত্র মুহূর্মুহ বদলার। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজকে দেখলে প্রপৌত্র ব'লে চিনতে পারবে না, এরা আরেক জাতি। তিন পুরুষের ব্যবধানে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু চাকার তলার দিকটা কখন উপরের দিক হয় চাকা তা জানে না, চাকা ঘুরতেই ব্যাপৃত। প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বিপ্লব চলেছে; চোখে পড়ে না এই জন্যে যে, চোখও বিপ্লবের অঙ্গ। Galsworthyর নতুন নাটক 'Exiled' এ নিচের ধাপের লোক উপরের ধাপে উঠল, Galsworthy একে ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'evolutionary process' এবং যারা নবাগতের ধাক্কা খেয়ে উপরের ধাপ থেকে পিছলে পড়ল তাদের জন্যে দুঃখ করলেন। কিন্তু তারাও তো 'evolutionary process'-এরই কল্যাণে ভুঁই ফুঁড়ে উপরে উঠেছিল। এখনকার ভুঁইফেঁড়িরাও পঞ্চাশ বছর পরে উপরের ধাপ থেকে 'exiled' হবে। তা ব'লে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, ইংলও যতই বদলাক ইংলওই থাকবে, চাকা যতই ঘুরুক চাকারি থাকবে। পুরাতনকে ইংলও সমীহ করে, কিন্তু নির্বাসিতও করে, এ্যারিস্টক্রেটের প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা, কিন্তু পালা ক'রে সবাইকে সে একই গদিতে বসাবে ব'লে কাউকেই দীর্ঘকাল গদিয়ান হ'তে দেয় না। পর্বতের চূড়ায় যেই ওঠে সেই টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খায়, অথচ যে দেশের সমাজের গড়ন পার্বত্য সে দেশে কতগুলো লোককে চূড়ায় চ'ড়ে চূড়চূড় হ'তেই হবে।



অধিকাংশ এয়ারিস্টক্রাটেরই বংশলোপ হয়, সুতরাং কষ্ট ক'রে তাদের মাথা কাটতে হয় না। স্বাস্থ্যের আদর্শ বাড়তে গিয়ে অতিমাত্রায় জন্মশাসন, তার ফলে বংশলোপ। উচ্চতর মধ্যবিত্তরাও জন্মশাসনপূর্বক নিজেদের সংখ্যা কমাতে লেগেছে, তার ফলে নিম্নতর মধ্যবিত্তরা উচ্চতর মধ্যবিত্ত হ'য়ে উঠছে। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের স্বস্বক্ষেপে ঠিক সেই কথা। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের পরিবারে আত্মকাল তিনচারটির বেশি সন্তান দেখতে পাওয়া ভার। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর লোক ক্রমশ নিম্নতর মধ্যবিত্ত হ'য়ে উঠছে। এই হলো 'evolutionary process'। এটা ইংলণ্ডের একটা মন্ত উদ্ভাবন। এতে শ্রেণীবিশেষের লাভ লোকসান হতে পারে, সমস্ত দেশটার লাভলোকসান কিছুমাত্র নেই। পরিবর্তন বিনা কোনো জীবন্ত দেশের জীবন থাকে না, এবং দু-তিন পুরুষ অন্তর মাথাকাটাকাটি না ক'রে প্রতি পুরুষেই একের নির্বাসন ও অপরের রাজ্যপ্রাপ্তি ভালো, না, মন্দ? এতে জাতির চরিত্রতাতেও মরচে ধরে না, নতুন গুণাবলী পুরোনো গুণাবলীকে মুছে সাফ ক'রে দেয়। পুরোনো এয়ারিস্টক্রাসীর সঙ্গে তুলনা করলে নতুন এয়ারিস্টক্রাসীর কোনো গুণ দেখতে পাও না কি? ভূঁইফোঁড় ব'লে ঠাট্টা যদি করো তবে ভূঁইফোঁড়ের ভিতরকার সত্যকে হারাবে। দুটোকে যে এক সঙ্গে বাহাল করেনি এর কারণ ইংলও একসঙ্গে দুটো সত্যকে সইতে পারে না। ইংলণ্ডের পাকশাস্ত্রে পাঁচনিশেলি নেই। মাছ-মাংসের সঙ্গে আমরা আলু-কপি মিশিয়ে রাঁধি, এ কথা শুনে 'একজন থ' হ'য়ে গেলেন। 'তা হ'লে তোমরা মাছের কিংবা মাংসের কিংবা আলুর কিংবা কপির বিশেষ খাদ্যটি পাও কী করে?' এর জবাব—'তা পাইনে। কিন্তু সমস্তটার সমন্বয়ের খাদ্যটি পাই।'

বিপ্লবকে ইংলও ঠেকিয়ে রাখে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে ঘটতে দিয়ে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর রেভল্যুশন যেমন প্রতিদিনের ব্যাপার অথচ কোনোদিন আমরা খবর পাইনে যে আমরাও সেই রেভল্যুশনের ব্যাপারী, ইংলওও তেমনি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক রেভল্যুশন নিত্যকারের ঘটনা ব'লে কোনো ইংরেজ টের পায় না কত বড় ঘটনায় সে লিপ্ত। টের পেলে সে ঘটতে দেবে না, সেইজন্য বিপ্লবটাকে কিস্তিবন্দীভাবে ঘটাতে হয়। এয়ারিস্টক্রাটের হাত থেকে শ্রমিকের হাতে শাসনভার আসতে দু'শো বছর লেগেছে; খ্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন অন্ততঃ একশো বছরের; দেড়শো বছর ধ'রে আক্রমণ ক'রেও টাট্টুঘোড়ার গাড়িকে এখনো ঘায়েল করতে পারা যায়নি, চরকা এখনো কোনো কোনো ঘরে ঘর্ ঘর্ করছে; এবং এমন লোক এখনো অনেক যারা 'immaculate conception' প্রভৃতি খ্রীস্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস হারায়নি। তথচ ইংলও কোনোদিন চূপ ক'রে ব'সে নেই, সে প্রতিদিন ঘর ঝাট দিচ্ছে, প্রতিদিন পুরোনো গহনাকে ভেঙে নতুন ফ্যাশানে গড়িয়ে নিচ্ছে। ইংলণ্ডের মন সংস্কারকের মন। পলিটিস্কের মতো সব বিষয়েই ইংলও একটা চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ (permanent opposition) আছে—ইংরেজ মাত্রেই কোনো না কোনো বিষয়ে একজন বিদ্রোহী। আবহমান কাল ইংরেজ মাত্রেই ব'লে আসছে—'This state of things must not continue.' আমাদের বুলির সঙ্গে এ বুলির কত না তফাৎ। আরো ভাববার কথা, এ বুলি আবহমান কালের ও প্রতিজ্ঞনের। 'Something must be done'—এই হলো এ বুলির উপসংহার। একটা নমুনা দিই। সার্কাস ইংলও নেই বললেও হয়। তবু সার্কাসে বাঘ হাতী প্রভৃতি বন্য জীবকে নাচানো অনেকের চোখে নিষ্ঠুর ঠেকে। এখনো ইংলণ্ডের কোনো কোনো জায়গায় খরগোশ-শিকার পাখি-শিকার চলে, সেটাও নিষ্ঠুর কাজ। খুনিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া তো রীতিমতো বর্বরতা। এই সব বন্ধ করবার জন্যে পার্লামেন্টকে আবেদন করা চলেছে। এই ধরনের আবেদন প্রতি বছর পার্লামেন্টে পৌঁছয়। Vivisectionএর বিরুদ্ধে লোকমত গড়া বহুকাল থেকে চ'লে আসছে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এই সব ছোটখাটো সংস্কার অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অবসর সময়ের উদ্যোগিতার ফল—মহাত্মা গান্ধীর মতো অসাধারণ লোকের সারা সময়ের কাজ নয়। সমাজ-রাষ্ট্রের এক একটা

চক্রাংশ যদি প্রত্যেকে যোরায তবে সমস্ত চাকাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘোরে, সমাজ-রাষ্ট্র দেখতে দেখতে বদলে যায়, অধ্যবসায়ীর পক্ষে জীবিতকালেই চক্র-পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা শক্ত হয় না। প্রত্যেক ইংরেজ মরণকালে এই ভেবে সাত্বনা পায় যে, আমিও কিছু না কিছু ঘটিয়েছি। অবশ্য খুব বেশি নয়, খুব অসাধারণ নয়, তবু কিছু!—আমাদের দেশেও যদি সবাই সামান্য ক'রেও কিছু করত—প্রতিদিন করত—তবে আমাদের অসাধারণ মানুষগুলিকে অহরহ চরকার মতো ঘুরতে হতো না, চরকাও ঘোরাতে হতো না এবং আমাদের সাধারণ মানুষগুলি করবার মতো কত কাজ প'ড়ে রয়েছে দেখে 'কোনটা করি, কোনটা করি' ভাবতে ভাবতে জীবন ভোর ক'রে দিত না, কিংবা এক সঙ্গে সব ক'টাতে হাত দিয়ে সব ক'টা মাটি করত না, কিংবা হাজার বছরের আলস্যের হাজারটা নোঙরকে এক বিপ্লবের ঝড়ে বিপর্যস্ত করবার দিব্যধন দেখত না। Eternal vigilance-এর বদলে দু'টো দিনের খুনোখুনি খুব স্পেক্টাকুলার বটে, কিন্তু দু'টো দিনই তার পরমাণু।

## ॥ আঠারো ॥

সেদিন যে জেনেরল ইলেকশন হ'য়ে গেল সেটা সম্ভবতঃ ইতিহাসের বিষয়; কিন্তু এত নিঃশব্দে ঘটল যে আমাদের কারুর বিয়েতেও ওর বেশি ধুমধাম হয়। শুনলুম লঙনে না হ'লেও মফঃস্বলে বেশ ধুমধাম হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাত্রীর পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ ক'রে দিই—‘আমি লেবারকেই ভোট দিলুম, কারণ প্রথমতঃ, আমি সোশ্যালিস্ট, দ্বিতীয়তঃ, আমাদের এ অঞ্চলে নির্বাচনটা যাদের নিয়ে তাদের একজনের ছিল যৌবন, মগজ ও উৎসাহ, অন্যজনের জরা, জেদ ও অসামর্থ্য। তবু কিন্তু খুবই আশ্চর্য হলুম শুনে যে, H—নির্বাচিত হয়েছেন; কেননা এই অঞ্চলটা সেই থেকেই কন্জারভেটিভদের একচেটে হ'য়ে এসেছে যেদিন নোআ তাঁর আর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। মাত্র গোটা কয়েক ভোটের আধিক্যে H—জিতে গেলেন। আমার ঘরের কাছেই একটা নির্বাচনস্থলী। গুত্রবারের রাত্রি পৌনে তিনটোর সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় যারা ফলাফল জানবার জন্যে অপেক্ষা করছিল তাদের অতি উদ্দাম আনন্দধ্বনি শুনে। যেই আমার চেতনা ফিরল, চটি পায়ের দিলুম ও ড্রেসিং গাউন গায়ে দিলুম, আর দৌড়ে গিয়ে ঢুকলুম মায়ে ঘরে—সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। মা'কে বিরক্ত ক'রে জানলা খুললুম, মাথা বাড়িয়ে দিলুম, একজন অচেনা পথিককে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কে জিতল?’ খবরটা শুনে পরম উল্লাসে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।’\*

মোটের উপর ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগল। মাসখানেক আগে থেকে এখানে ওখানে বড়তা চলছিল ঘরে ঘরে নির্বাচনপ্রার্থীদের বিজ্ঞাপন ঝুলছিল, এবং কাগজে কলমে খুবই বাণ বর্ষণ হচ্ছিল। কার কোন পক্ষে ভোট তা এক রকম জানাই ছিল, এক ফ্ল্যাপারদের ছাড়া। যেই মস্ত্রীদল গঠন করুক জনসাধারণের বড় বেশি আসে যায় না, রাষ্ট্র যেমন চলছিল তেমনই চলে। দোকান বাজার থিয়েটার সিনেমা ডাকঘর রেল—কোথাও কোনো পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয়। আমার ঘরের কাছে যে সব মজুর কাজ করছে তাদের একজন গান ধরেছে—কাবুলিতে গান গায় (‘শ্রীকান্ত’)

\* [H-টি হচ্ছে আর্থার খুড়ের এক ছেলে—খুড়োর আরেক ছেলে আরেক হালগায় জিতছেন। খুড়ো নাম তো জানে বিশ্বের সব জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি বলব না।

সেও যেমন অবিশ্বাস্য, ইংরেজেরা গান গায় এও তেমনি অপূর্ব। আমরাই এবার দেশের হর্তা কর্তা, আমাদের রায়মুজ্জে সর্দারকে রাজা দেশের সর্দার করেছেন, এই ভেবে তার যদি গান পেয়ে থাকে তবে ধন্য বলতে হবে। নইলে এমন সুন্দর মেঘ ও রৌদ্রের খেলার দিনটাতে কি কেবল পাখিই গান গাইত, মানুষ তার পাখি গাইত না?

ইংরেজ মজুর শ্রেণীর লোকেরা খুব শিষ্ট—তারা হুন্সা করতে দাস্য করতে শান্তিভঙ্গ করতে জানে না। তবে চিরদিন যে তারা এত সুবোধ বালক ছিল ইতিহাসে কিংবা জনশ্রুতিতে ওকথা বলে না। ক্রমে ক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির দ্বারা সংঘবদ্ধ হবার পর থেকে ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার করবার পর থেকে তারাই হয়েছে দেশের সবচেয়ে আইন-মানা সম্প্রদায়। আইনের প্রতি অনায়াসে যদি কেউ দেখায় তো সে বড়লোক মোটরওয়ালা কিংবা নাইটক্লাবওয়ালী। মোটর উপর ইংরেজ মাঝেই অভ্যস্ত আইন-বশ। পুলিশকে বাধা দেবার কথা তো কেউ ভাবতেই পারে না, পুলিশকে সাহায্য করবার জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। এদিকে পুলিশের উপরে খবরের কাগজওয়ালাদের কড়া নজর থাকায় পুলিশও যার পর নাই ভয় হয়ে উঠেছে। আগে এতটা ছিল না, তার প্রমাণ আছে। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। ইংলণ্ড দেশটি ছোট ও সব ক’টি ইংরেজ রক্ত সম্বন্ধে এক হওয়ায় আইন অমান্য করতেও মানুষের সহজে প্রবৃত্তি হয় না, হ’লেও তেমন মানুষের সঙ্গী জোটে না, ধরা পড়াও তার পক্ষে নোজা। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা ইংলণ্ডে ক্রাইম ক’মে আসছে। দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতা—এ দুটোকে আমাদের দেশে ক্রাইম বলে না, এ দুটোর বিচার করতে এদের আদালতের অনেক সময় যায়। দ্বি-বিবাহ বেশ বাড়ছে ব’লেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে লোকমত ও হ’ক’রে বদলাচ্ছে বলতে হবে। কেননা দ্বি-বিবাহকারীকে বিচারক নাম মাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই শর্তে যে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না ও প্রথম স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। যে দেশে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষ-সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি সে দেশে এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভালো। দুয়ো সুয়ো দুটিকে নিয়ে এক সঙ্গে ঘর করাটা নিতান্ত প্রাচ্য প্রথা, তা’তে পাশ্চাত্যদের সংস্কারে বাধে।

ইংরেজদের সমাজে আইন যা আমাদের সমাজে আচার তাই। অথচ আইন সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রতিদিনই বলাবলি করছে যে, ‘অমুক আইনটা এত অযৌক্তিক যে সবাই ঐ আইন ভাঙছে, আর পুলিশ নিজেও যখন বোঝে ওটা অযৌক্তিক তখন অপরাধটা দেখেও দেখছে না। এমনি করে একটা আইন ভাঙতে ভাঙতে সব আইন ভাঙতে মানুষ প্রশ্রয় পাচ্ছে। অতএব অমুক আইনটা বদলানো দরকার, তুলে দেওয়া দরকার।’ আচার সম্বন্ধে আমরাও যদি প্রতিদিন এমনি বলাবলি করতুম তবে আচারমাত্রের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত উদাস্য এবং অশিক্ষিত সাধারণের একান্ত আসক্তি দেখা যেত না। ইংরেজ সমাজের মাথা হচ্ছে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট।\* নিকটে যে আমাদের দেশে পার্লামেন্ট জাতীয় কিছু গ’ড়ে উঠবে ও আমাদের অগ্রপ্রাশন থেকে শ্রদ্ধা পর্যন্ত শাসন করবে এমন আশা করা শক্ত। হিন্দুসভা যদি রাজনৈতিক না হ’য়ে সামাজিক হ’য়ে থাকত তবে হয় তো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা তারই মধ্যে মূর্তি পেত। আগে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতের নিজস্ব আচার নিয়ামক সভা ছিল এখন সমগ্র হিন্দু সমাজের তেমনি কোনো সভা কেন হয় না, যে-সভায় প্রত্যেক জাতের প্রতিনিধি ব’সে সকল জাতের সাধারণ আচার নির্দেশ করবেন? এই সভার অধীনে সামাজিক আদালত থাকে না কেন, যে আদালতে অনাচারের প্রতিকার হয়? গ্রাম্য স্থবিরদের অত্যাচার থেকে সমাজকে উদ্ধার ক’রে ন্যায়সঙ্গত আচারের প্রতি মানুষকে সশ্রদ্ধ করতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় কী?

\* কেউ তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি না, শ্যালিকাকন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি না পার্লামেন্ট এ সম্বন্ধে বিধান দেয়। আগে ছিল চার্চের এলাকা, এখন চার্চের অধীনে আদালত নেই।

ভারতীয় চরিত্রের মূলকথা যেমন সমদ্র, ইংরেজ চরিত্রের মূলকথা বিনিময়। ইংরেজ কল্পস নয়, কিন্তু হিসাবী। একটা পেনীরও হিসাব রাখে— নিজের দ্বীপ কাছ থেকে নিলে নিজের দ্বীপে ফেরে দেয়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হওয়া ইংরেজের পক্ষে অসম্ভব, তার খাদ্য আনতে হয় বিদেশ থেকে, বিদেশকে দিয়ে আসতে হয় পরিধেয় বা অন্য কিছু। এমন ক’রে তার বিনিময়বোধ পাকা হয়েছে, বণিকমূলভ বৃত্তিগুলি পোক্ত হয়েছে। ফরাসী দোকানদার ও ইংরেজ দোকানদার দুইয়ের তুলনা করলে দেখা যায় ইংরেজ দোকানদার কল্পস নয়, ঠকায়ও না, ভদ্রও, কিন্তু দোকানদারের বেশি নয়, মানুষ নয়। ফরাসী দোকানদার দোবে গুণে উঠে। ইংরেজকে নোপোলিয়ন দোকানদার বলে সেই যে প্রশংসাপত্রটা দিয়েছিলেন সেটার মর্ম এমন নয় যে ইংরেজ ঠকায়, সেটার মর্ম ইংরেজ বিনিময়শীল। গ্রাহককে খুশি করতে ইংরেজ দোকানদার প্রাণপণ করে, কিন্তু দেনা পাওনা ভোলে না, আত্মীয়তা করে না। আত্মীয়তার জন্যে ক্লাব আছে, খেলা-ফ্রেড আছে। দোকানে শুধু প্রয়োজন-বিনিময়। আমার ঘরের অনতিদূরে স্বামী দ্বীপ দুটো আলাদা দোকান, দুই আলাদা তহবিল, এক জনের কাছে আরেকজন সওয়া করলে তফসুনি বিল লিখে দেয়। এদের দেশে একানবর্তী পরিবার কেন গ’ড়ে উঠল না? পরিবারও কেন ভেঙে গেল? যে কারণে বার্টার থেকে আধুনিক এক্সচেঞ্জ অভিযান্ত্রিক হয়েছে, সেই কারণে স্বামী দ্বীপ দুই উপার্জন দুই তহবিল হয়েছে। সম্ভানের জন্যে দু’পক্ষ চাঁদা দেবে, কথা চলছে। তারপর সম্ভানরা ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করলে মা-বাবার কাছ থেকে মাইনে পাবে এমন কথাও শোনা যায়। এক কথায়, যার যতটুকু যোগ্যতা সেটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এবং দু’পক্ষের যোগ্যতার ভগ্নাংশ টাকার মধ্যস্থতায় বিনিময় করতে হবে। আমরা ওটা হৃদয়ের মধ্যস্থতায় ক’রে থাকি বলে আমরা এখনো বার্টারের যুগে আছি, আমরা ‘সভা’ হ’য়ে উঠিনি। সভ্যতার লক্ষণ ভগ্নাংশ-ভাগ, চুলচেরা বিচার। অতি সূক্ষ্ম ন্যায়। এ দেশের ভিক্ষুক যে দেশলাই বেচবার ভান ক’রে পয়সা চায় এও বিনিময়শীলতার বিকার। কিছু না দিয়ে শুধু নিলে পুলিশে ধ’রে নিয়ে যায়—ওটা একটা ক্রাইম। আইনের চোখে ভিখারী হচ্ছে আসামী!

জগতের অন্ততঃ একটা জাতির এই গুণটি চরিত্রগত হওয়ায় জগতের অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও কত লাভ হয়েছে ভাবী কাল তা খতিয়ে দেখবেই। ইংরেজ যত দেশকে শোষণ ও শাসন করেছে তত দেশকে এক সূত্রেও বেঁধেছে, একত্ব দিয়েছে। মৌমাছি যেমন ফুলদের মধু নেয় তেমনি মিলন ঘটায়। মধুটা ঘটকালীর মজুরী। তা’ ছাড়া, মৌমাছিরও তো অমদায় আছে। ফুলেরা চাঁদা ক’রে তাকে না খেতে দিলে সে বাঁচে কী ক’রে?

নানা কারণে ইংরেজ এখনো বহুকাল বাঁচবে। প্রথমতঃ, মৌমাছির কাজ এখনো শেষ হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক প্রকার লীগ অব নেশনসই বটে। নূতন লীগ অব নেশনস যতদিন না শৈশব অতিক্রম ক’রে আন্তর্জাতিক ঘটকালীর দায়িত্ব নেয় ততদিন সে দায়িত্ব ব্রিটিশ শ্রেণ ও ডাচ লীগ অব নেশনসগুলোরই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজী ভাষা ক্রমশ সার্বভৌম ভাষা হ’য়ে ওঠায় পৃথিবীর সবাইকেই ইংলণ্ড এসে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ ক’রে যেতে হবে কিংবা ইংলণ্ড থেকে লোক নিয়ে নিজের দেশে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। কিছুকাল আগে যখন ফরাসী ছিল বিশ্বভাষা তখন বিশ্ব ছিল ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত। এখন বিশ্বের সীমানা বেড়েছে—এখন কান্ট্রির সঙ্গে কাশ্মীরকে কথা ক’হতে হবে ইংরেজীতে। ‘Talkies’এর দৌরাণ্যে ইংরেজী ভাষার ছিরি যেমন হোক, প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ভাষা শিক্ষা-রাজধানী প্যারিস থেকে উঠে এসে লণ্ডনে ও লণ্ডনের চতুর্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হলো বলে। এদিকে কিন্তু বিশ্বের বাণিজ্য-রাজধানী নিউইয়র্কে পাড়ি দিল ও যন্ত্রশিল্প-রাজধানী বার্লিন। বার্লিন এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। তার লোক

সংখ্যা বিয়াল্লিশ লাখ। একা বার্লিন শহরেই একশো তেরোটা নাটির উপরের রেল স্টেশন ও একাত্তরটা নাটির নিচের রেল স্টেশন আছে।\* এরোগ্রেনের রাস্তা আছে আঠারোটা (গ্রীষ্মকালে), ও সাতটা (শীতকালে)। এখন থেকে প্যারিস হবে কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদ-রাজধানী। এবং জেনেভা রাজনীতি-রাজধানী।

বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো—এক দেশের অভিজ্ঞতা আরেক দেশে পৌছে দেওয়া ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের কাজ। সেই সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগে, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ইজিপ্টের। ইংরেজ জাতিকে বিধাতা ঘরছাড়া ক'রে সৃষ্টি করেছেন, এরা চ'রে বেড়ায়, খুঁটিতে বাঁধা থেকে জাবর কাটতে জানে না। এই কারণে ইংরেজের সেই সব কোমল বৃত্তিগুলি নেই যা আমাদের আছে, (অনেকটা) ফরাসীদের আছে। কোলের ছেলেকে ভারতবর্ষ থেকে কিংবা হংকং থেকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়, বয়স্ক ছেলের বিয়ের পরে এক শহরে থেকেও কদাচ দেখতে আসে—এমন মা-বাবা একমাত্র ইংলণ্ডেই সম্ভব। আমাদের যেমন মামা-মামী মাসী-মেনো কাকা-কাকী ও পিসে-পিসীতে ঘরসংসার জমজমাট, এদের তেমন নয়; গার্হস্থ্য বৃত্তিগুলি এদের ভোঁতা। হৃদয়কে চরিতার্থতা দিলে কাজ নষ্ট যে হয়! বিউটির চেয়ে ডিউটিকে ইংরেজ বড় ব'লে মানে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রেমের কবিতা ইংরেজী ভাষায় যত ও যত রকম ও যত গভীর অন্য কোনো ভাষায় তত নয়। এক চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো বাঙালী কবি কোনো দিন সর্বত্র পণ ক'রে ভালোও বাসেননি, ভালোবাসার কবিতাও লেখেননি। গদ্য কবিদের মধ্যে শরৎ চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজীতে প্রেমিক কবির সংখ্যা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, love কথাটার সংজ্ঞা কী তা কোনো ইংরেজ জানে না, তবু বিবাহ করবার আগে love কর্তে হবে এ কথা অন্য কোনো সমাজ এতটা জোরের সঙ্গে বলেছে ব'লে আমার ননে হয় না। আমাদের সমাজে ওটা স্পষ্ট ভাষায় নির্দিষ্ট—আমাদের বিবাহ ব্রহ্মচর্যের পরে গৃহস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করবার তোরণ। ধর্মের পরে কাম, তার আগে নয়। ফরাসীরা যদিও প্রেমের নামে গদগদ হ'য়ে ওঠে ও আমাদের বৈষম্য ঠাকুরদের মতো সহস্রবিধ প্রেমের লক্ষণ আওড়ায়, তবু ও-প্রেম মস্তিষ্কজাত (cerebral) ও বচনবহুল। ওরা মাথা দিয়ে অনুভব করে ও কথা দিয়ে তন্ন তন্ন করে; কিন্তু বাণবিন্দু কুরঙ্গের বোবা আকৃতি ইংরেজরাই বোঝে। Love-making ও love এক জিনিস নয়। প্রথমটার চর্চা প্যারিসের একচেটে হ'তে পারে, কেননা প্যারিসের লোকের হাতে কাজ নেই; দ্বিতীয়টা ইংরেজের মতো অত্যন্ত প্রাকৃতিক্যাল-প্রকৃতি কাজের মানুষদের জীবনে অপ্রত্যাশিত রূপে এসে বহু বৎসরের কাজ একদিনে নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়।

## ॥ উনিশ ॥

ইউরোপের শরৎকাল। পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। এই তো সেদিন বসন্ত এলো সবুজ পাতার পোষাক পরে, যেন কোনো ফ্যান্সি ড্রেস-পরা নাচের অভিনেত্রী। এরই মধ্যে রদ শেষ হয়ে এলো, বাতি নিবু নিবু, সভা ভাঙে ভাঙে। এর পরে পোশাক খুলে ফেলে বিছানায় গা মেলে দিতে হবে।

\* এ ছাড়া অধা-উপরে আধা-নিচের রেল স্টেশন উনচল্লিশটা।

এও এক উদ্যোগ পর্ব।

আমাদের দেশে শীতের জন্য প্রস্তুত হবার কাল হেমন্ত। শরৎ আমাদের দেশে শীতের অগ্রদূত নয়, আমাদের শরৎ স্বাধীন। আমরা শরতের মুখ চেয়ে দিন ওণি; শরৎ আসছে শুনে তার আগমনী গাই; শরৎ চলে গেলে কাঁদি ও কাঁপি। কিন্তু এদের শরৎ যৌবনের শোয়ের দিকে প্রথম পাকা চুলটির মতো অনাহৃত আগন্তুক; আনন্দের নয় আভঙ্কের পাত্র। এর পিঠ পিঠ শীত আসবেন। তিনি যেমন তেমন অভিধি নন, স্বয়ং দুর্বাস। তাঁর অভিধাপে ওটি কয়েক evergreen জাতীয় তরু ছাড়া সকল তরু তরুণীর পত্রপল্লভা নিঃশেষে খনে পড়বে; তারা লম্জায় কাঠ হয়ে রইবে।

ইংলও থেকে খুরিদিয়ায় এসেছি। গ্যারটে শিলার বাথ-এর খুরিদিয়া, বনরাতিনীয়া। অঞ্চলটি বিরল বসতি নয়, গ্রামে গ্রামে কারখানার চিমনী কর্মব্যস্ততার প্রমাণ দিচ্ছে। তবু অঞ্চলটির হাতে অক্লান্ত ছুটি। এতে যেন আকাশের অংশ আছে, আকাশের ব্যাপ্তি। প্রাচীন তপোবন সদৃশে আমাদের যে ধারণা আছে তার সঙ্গে খুরিদিয়ার এই মাটির আকাশটিকে বেশ মানায়। বনের দ্বারা আকাশ ঢাকা পড়বে না, যদি পড়ে তো তপোবনে ও রাজনগরীতে প্রভেদ কোথায়? মানবায়ার সহস্র মূল্যটিকে রাত্রিদিন উপলব্ধি করবার জন্যেই তপোবন। তপোবনের অত্যাশঙ্ক্য অঙ্গ দর্শনিকব্যাপী পেশ।

খুরিদিয়ার হাওয়া সমুদ্রবক্ষের হাওয়ার মতো মুক্ত এবং মুক্তির বাদে দাদু। ইচ্ছা করে সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে শোষণ করি। শহরে থেকে বাতাস আমরা আধপেটা খাই, আমাদের নাসার ক্ষুধা মেটে না। লণ্ডনের মতো শহরে নাক বুঁজেই থাকতে হয়, অভ্যাসের দোষে পার্কের বাতাসও গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বয়ং পঞ্চম ডর্জেরও সাধ্য নেই যে লণ্ডনের জল হাওয়া বৃষ্টি কুয়াশার অতীত হন। অথচ খুরিদিয়ার চাষীরাও তাঁর তুলনায় ভাগ্যানব।

গ্যারটের যুগে খুরিদিয়া আরো বন্য ও আরো বিজন ছিল, সন্দেহ নেই। তাঁর কর্মস্থল ভাইনার এত ছোট যে প্রায় পল্লীবিশেষ, তখনকার দিনে নিশ্চয়ই ছিল অরণ্য-পল্লী। একটি ক্ষীণকায়্য স্রোতদ্বীপও আছে তাতে। গ্যারটের দরবারী মনকে অরণ্য সর্বদাই ডাক দিত, তাঁর বাগানবাড়িটি অরণ্যেরই অন্তর্গত একটি কুটার। দরবার থেকে ছুটি নিয়ে সেইখানে তিনি প্রধান করতেন। সংসারের প্রাত্যহিক তৃষ্ণাতার অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করেও যে তিনি মুক্ত পুরুষ ছিলেন, অন্ততঃ মূমূক্ষু পুরুষ ছিলেন, তার কারণ তিনি কেবল নাগরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরণ্যকও। গ্যারটের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে সমন্বয়, অন্ততঃ যে সমন্বয় প্রয়াস দেখি, সে এমনি করেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি এ্যারিস্টক্রেট তো ছিলেনই, অধিকন্তু প্রকৃতির খুব কাছে কাছে ছিলেন, অন্ততঃ থাকবার জন্যে প্রাণপণ করেছিলেন। "আমি এতবার 'অন্ততঃ' কথাটা ব্যবহার করলুম, তার কারণ সকলের মতো আমারও ধারণা গ্যারটের ভিতরটায় দু'বেলা কুরক্রেফ চলত, সত্যে অসত্যে অষ্টপ্রহর সংগ্রাম। তবু আমার বিশ্বাস তাঁর মধ্যে একটি সহজ সর্বজ্ঞতাও ছিল। তিনি ছিলেন অস্তুরে ঘটতে থাকা দ্বন্দ্বের অতীত (above the battle)। মহামানবের মতো মহামানবের এই কবিতা ছিলেন স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না, নিছক দ্রষ্টা—বিশ্বরূপদ্রষ্টা। গ্যারটের যতগুলি প্রতিভূতি আমি দেখেছি সেগুলিতে তাঁর চক্ষু আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর সকল কিছুর চেয়ে। তাঁর দৃঢ়নিবন্ধ ওষ্ঠযুগ তাঁর চক্ষুরই বাহন; তাঁর চক্ষুরই সংকল্প তাঁর ওষ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে।

‘স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না’—অর্থাৎ তাঁর সত্যকারের যে তিনি, তিনি স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না।

\* তাঁর সংস্কার সুপ্রাচীর কারকে বিবাহ না করে এ্যারিস্টক্রেট তিনি বিবাহ করলেন কি না এক চান্দানীকে, তাও বয়স্কাল একসঙ্গে বাস করবার পরে। এর অর্থ কি এই নয় যে তিনি চানো মটির পৃথুলের কাছে যা যেতেন তার বেশি পেয়েছিলেন মটির নেতের কাছে? প্রকৃতির হাতে গড়া প্রাণময়ী নারীর কাছেই মানবীয় পুরুষের পরিপূর্ণতা।

তা' বলে তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্য ছিল না বিদ্রোহী ছিল না এমন কদাচ নয়। বিশুদ্ধ বিদ্রোহের সুর তো তাঁর সৃষ্টির মর্ম ভেদ করে উঠছে 'I am the spirit that denies!' এ বিদ্রোহ অমবস্ত্রের জন্যে নয় নুখ স্বচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়, এমন কি মুক্তির জন্যেও নয়। বিদ্রোহের জন্যে বিদ্রোহ। উদ্দেশ্য তার নে নিজেই। যেমন, নটরাজের নৃত্য। সাধারণত বিদ্রোহ বলতে আমরা বুঝি সশস্ত্র ভিক্ষুকতা। ভিক্ষা পেলেই বিদ্রোহের স্ফাভি। কিন্তু Mephistopheles বলে —

I am the spirit  
That evermore deny—and in denying  
Evermore am I right—"No!" say I, "No!"  
To all projected or produced—what'er  
Comes into being merits nothing but  
Perdition—better then that nothing were  
Brought into being,—what you men call sin—  
Destruction—in short, evil—is my province,  
My proper element.

মানুষের মধ্যে এক জন দায়িত্ববান বিধাতা আছেন। আর আছে একজন দায়িত্বহীন অবাধ্য। এই দু'জনকে নিয়েই এবং দু'জনের অতীত হয়েই মানুষ। এই মানুষের মহানটক লিখেছেন এমনি মানুষ গ্যেটে।

বিশুদ্ধ দৃষ্টির তপস্যা ভারতবর্ষের পরে এক জার্মানীই করে এসেছে, তাই জার্মানীর উপর ভারতবাসীর এত পক্ষপাত। ভারতবর্ষের বাইরে মাত্র একটি ভারতবর্ষ আছে, যেখানে মানুষ ইংরেজের মতো নাগরিক মুক্তিকে কাম্য করেনি, একমনে কামনা করেছে আত্মার মুক্তি। তাই ইংরেজ ফরাসীরা যখন বড় বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলো, জার্মানরা তখনো দার্শনিক তর্কে মশগুল এবং সংগীতের সম্মোহনে আবিষ্ট। হোহেনজোলার্নরা জোর করে এদের ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়, বিনমর্যক এদের অত্যন্ত কেজো করে তোলেন। আধ্যাত্মিক একাগ্রতাকে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রয়োগ করে এরা অচিরে এক বিভীষিকা হ'য়ে উঠল, যেন নৈমিষ্যারণ্যের যোগীরা হঠাৎ ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে মৃগয়ায় বাহির হলো। গত যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় তার মনে লাগেনি, কেননা আসলে ওটা হোহেনজোলার্নদেরই পরাজয়। জার্মানরা স্বভাবত যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র দাবী প্রত্যেক জাতিকেই কতকটা স্বভাববশ্ট হতে বাধ্য করছে, জার্মানীকেও। তাই জার্মানীর অতি-কৃষ্ট মন যন্ত্রশিল্পের দিকে ধাবিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পে জার্মানীর উন্নতি যেমন অদ্ভুত তেমনি ক্রান্ত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে গোয়েন্দা পুলিশ হ'লে যেমন দুর্বল হয়ে ওঠে এও তেমনি। এর দয়া মায়া নেই, রুচি-নীতি নেই। বার্লিন শহরটার মতো রাস্কুসে শহর আমি দেখিনি। মানুষের একটা হাত যদি বাঘের একটা থালা হয়ে ওঠে তবে ওটাকে ক্রমবিকাশ বলা চলে না। বার্লিনের প্রাণ আছে, হৃদয় নেই, রুচি নেই, মাত্রা-জ্ঞান নেই।

বার্লিনের পেছনে দীর্ঘকালের ইতিহাস না থাকায় শহরটা কলকাতার মতো অনভিজাত। লণ্ডন প্যারিস রোম ভিয়েনা—এমন কি মিউনিক ফ্রাঙ্কফোর্ট ড্রেসডেন কোলোনের সঙ্গে ওর নাম করতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ওর সঙ্গে মানুষের মহত্বের স্মৃতি জড়িয়ে নেই জড়িয়ে রয়েছে মানুষের দস্যুতার স্মৃতি। হোহেনজোলার্নরা বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করেছেন ও তাঁদের শহরটাকে তাঁদের সৈন্যদলের মতো পিটিয়ে মজবুত করেছেন। লণ্ডনের নগরবৃদ্ধেরা রাজাদের কাছ থেকে ক্রমাগত নতুন অধিকার আদায় করেছেন, ইংলণ্ডের অন্য সর্বত্র যখন যথোচ্চাচার চলিত ছিল

একমাত্র লণ্ডন তখন নিজের নিয়মে নিজে চালিত। প্যারিসও স্বায়ত্তশাসনের দাবী কেনোদিন ছাড়েনি, যদিও সে দাবী পূর্ণ হয়েছে কদাচিৎ। জামানীর ‘স্বাধীন নগরগুলো’ লণ্ডন প্যারিসের মতো বৃহৎ না হলেও মহৎ। কিন্তু বার্লিন ছিল হোহেনজোলার্নদের খাস সম্পত্তি, সবে সেদিন স্বাধীন হয়েই তার একমাত্র অভিনাথ দাঁড়িয়েছে আমেরিকান হ’য়ে ওঠা।

প্রাসিয়ানদের দেহের মতো মনও বোধ হয় অত্যন্ত ভারি। বার্লিন যেন একখানা রামায়ণের শিল্প, মাটির উপরে এমন চেপে বসেছে যে ভূমিকম্প হ’য়ে গেলেও নড়বে না। খুব পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিতও বটে, কিন্তু জলদগন্তীর। বার্লিন থেকে লাইপৎসীগে এলে মনটা প্রজাপতির মতো লঘুভার হয়ে উড়তে চায়। সংগীতের রাজধানী,—সুপ্রাচীন, সুপরিবর্তিত, নাতিবৃহৎ। আধুনিকতার দাবী লাইপৎসীগও মেনেছে, কিন্তু ইহকালের জন্যেও পূর্বকাল খোঁয়ায়নি। লাইপৎসীগ ছাপাখানার রাজধানীও বটে, কিন্তু ছাপাখানার নিনাদ সংগীতকে ও ছাপাখানার কালি নগরসৌষ্ঠবকে ছাপাতে পারেনি।

ড্রেসডেনকে সুন্দর না বলে সুশ্রী বলা ভালো। আমাদের লক্ষ্মীয়ার সগোত্র। ওর বাস্তবকায় তেজ নেই, অলঙ্কার আছে। গির্জা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রবেশ করবামাত্র মন ভক্তিতে ভরে ওঠে, অলঙ্কার চোখের জলে গলে যায়, মেরীর মাতৃমূর্তি ও যীশুর ত্রিশবিদ্ধ মূর্তি জীবনকে বিবাদ মধুর করে। ড্রেসডেনের ফ্রাউয়েন কির্খে তেমন গির্জা নয়। মূর্তি আছে বটে, কিন্তু তাতে মূর্ত্য হয়েছ শিল্পীর কিংবা শিল্পী যাদের ভৃত্য তাদের বাবুয়ানা। গির্জাতে মানুষের হাঁটু পাতবার কথা, কিন্তু থিয়েটারের মতো আয়েস ক’রে বসবার আয়োজন করা হয়েছে উপরে নিচে। ড্রেসডেন কতকটা ভিয়েনার মতো। লাভণ্যকে এরা ক’রে তুলেছে লালিত্য। পথে ঘাটে ভান্ধরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু এমনি তার আড়ম্বরপ্রিয়তা যে কোনো কোনো স্থলে পাথরের উপর সোনার গিস্টি করা। ভঙ্গিতেও সরলতার বদলে সর্পিলাতা। কিন্তু সর্বত্র একটি লঘুতা সুপরিলক্ষ্য। প্রাসিয়ার বিপরীত। পাথরের মূর্তি যেন মোমের মূর্তির মতো।

বার্লিন আমাকে হতাশ করেছিল, ড্রেসডেনও করল; ভ্রমণের খতিরে ভ্রমণ করাতে মোহভঙ্গ নেই, কিন্তু মরীচিকার সন্ধানে ভ্রমণ করা বিভ্রম। কল্পনার আকাশে যা ফোটে মাটির কুসুমে তার আদল কোথায়? মানুষের কল্পনগরী কল্পনাতেই থাকে। তবু কোনো কোনো স্থান আমাকে কল্পনাতীত আনন্দ দিয়েছে। যেমন, প্যারিস, থুরিসিয়া, চেকো-স্লোভাকিয়া। কল্পনাকে যথাসম্ভব ফাঁকা রেখে বেড়ানো ভালো। তা হ’লে স্বপ্ন ছুটবে না, স্বপ্ন ছুটবে।

কেন ড্রেসডেনকে সুন্দর ব’লে কল্পনা করেছিলুম? সেখানকার চিত্রশালায় রক্ষিত Sistine Madonna প্রতিলিপি দেখে। ফুল সুন্দর হ’লে ফুলদানীও সুন্দর হবে এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক। নইলে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয় না— বাস্তবে যাই হোক আদর্শে অসঙ্গতি আসে। ভেবেছিলুম ঐ একখানি ছবি যে সৌন্দর্য বিকীরণ করছে তাই দিয়ে ড্রেসডেন সুন্দর হ’য়ে গেছে। তা হয়নি। তবু সুখদৃশ্য হয়েছে, সেই অনেক।

Sistine Madonnaকে প্রত্যক্ষ ক’রে ধন্য হয়েছি। বুকেছি, মানুষ বংশানুক্রমে মরবে, কিন্তু এমন আনন্দকে মরতে দেবে না। রাজা গেছেন, রোপাল্লিক এসেছে, সেও যাবে, কমিউন আসবে। কিন্তু যৌতুকরূপে যে নিধি একদিন ইটালি থেকে ড্রেসডেনে এসেছিল পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ তাকে বাঁচিয়ে রাখবেই। রাফেল মানুষের দেশে সাঁইগ্রিশ বছর মাত্র ছিলেন। তাঁর চেয়ে দীর্ঘজীবী লক্ষ লক্ষ ছিল ও আছে। কিন্তু সকলে যাকে মরলেও মরতে দেয় না সেই ভাগ্যবান অমর।

ভুলি ও রঙ দিয়ে পটের উপর রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করতে বিধাতাও পারতেন না। গতিহিল্লোলময়ী ম্যাডোনার বসনের খস খস গুনতে পেলুম। শিশু যীশুর সর্বাস্থের চপলতা



চাউনিতে একীকৃত হয়েছে। তরুণী মা তাঁর দূরন্ত শিশুকে কোল থেকে নামতে দিচ্ছেন না, তাঁর চাউনিতে ভয়। দেবতা এখানে প্রিয় হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন।

ড্রেসডেন থেকে এল্বে নদী ধরে প্রাগ যাবার পথটি অতুলনীয়। নদীর বাঁধ যেন উঁচু হতে হতে পাহাড় হয়ে গেছে, তাও দেয়ালের মতো খাড়া। চেকো-স্লোভাকিয়া ওরফে বোহেমিয়া পর্বত-বন্ধুর, বদিও প্রাগ অঞ্চলটি সমতল। প্রাগ নিজে বন্ধুর ও পাষাণ-পিহিত। প্রাগের বিশেষত্ব, প্রাগ প্রাচীন অথচ অভ্যন্ত নবীন। কল-কারখানাতে ও সুপরিপাটি বস্তিতে এর প্রাচীন অংশটি ঢাকা পড়ে গেছে। রাজপথের ভিড় ঠেলে (প্রাগের লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে স্বাধীনতার পর থেকে) পুরাতন শহরের খানিকটা দেখা যায়, কিন্তু প্রাগ যেমন কালের সঙ্গে তাল রেখে ছুটেছে, মনে হয় অচিরেই আমেরিকান কলেবর ধারণ করবে।

চেকরা দীর্ঘকাল নাবালক থাকার পর এই সেদিন আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, উৎসাহ তাদের তরুণ বয়সের অরুণ আভার মতো দিগ্দিগন্ত উৎসর্গ। অন্যান্য দেশের কোনোটাতে জেতার মোহভঙ্গ, কোনোটাতে পরাজিতের শ্রানি, কিন্তু চেকো-স্লোভাকিয়ায় উর্ধ্বপ্রাণী নির্ঝরের মতো আকাশের সঙ্গে কৃতি করবার আগ্রহ। ( চেকদের এরোগ্নেয় সংখ্যা অনুপাত-অতিরিক্ত ) বোহেমিয়া দেশটি পুরাতন হলেও চেকরা নতুন জাতি, তাদের অতীত বড় নয় বলে তাদের ভবিষ্যতের উপর মন। এই কয়েক বছরে তারা বৈবয়িক উন্নতি তো করেইছে শিক্ষা দীক্ষায় ইউরোপকে নতুন আদর্শ দিয়েছে, নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে এবং সংগীতে তাদের এত একাগ্রতা দেখে মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে তাদের ভিতর থেকেই ইউরোপের গুণীদের আবির্ভাব হবে।

চেকদের রক্ত নতুন, সেটা তাদের প্রথম সুবিধা। চেকদের মনের জমিতে অস্ট্রিয়ান-জার্মানরা ভাবের পলিমাটি বিছিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা তাদের পরম সুবিধা। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে দ্বিতীয়টা পেয়েছি, অথচ নিজেদের কাছ থেকে প্রথমটা পাইনি বলেই ভাবনা। এর প্রতিকার বর্ণ-সাক্ষরের দ্বারা রক্তকে নতুন করা। সভ্যতার প্রাচীনতা ভালো জিনিস, কিন্তু রক্তের প্রাচীনতা মারাত্মক। রক্ত-কৌলীন্যের মোহে যে ভাত মজেছে, তার সভ্যতাও ব্রিডজিয়ামের মমি হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভারতের নবীনতা আরো জরুরি। আমাদের অতীতের চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে যেদিন দীর্ঘতর বোধ হবে সেইদিন আমাদের নিশাশু হবে, আমরা প্রভাতের চাক্ষু্য সর্বাসে অনুভব করব। স্বাধীনতার বিপুল দায়িত্ব বইবার প্রসঙ্গ ধৈর্য সেই চাক্ষু্যের আনুযায়িক।

নূর্বার্গ সুন্দর। কিন্তু নূর্বার্গ একটি নয়, নূর্বার্গ দু'টি। পুরাতন নূর্বার্গের সীমানার বাইরে নতুন নূর্বার্গ তার অসংখ্য কারখানায় স্টীম এঞ্জিন, মোটর গাড়ি, খেলার পুতল তৈরি করছে—পুরাতন নূর্বার্গ তার স্বকীয়তা রক্ষা করে পৃথিবীর চারুশিল্পমোদীদের তীর্থস্থলী হয়েছে। প্রাচীন রীতির বাস্তবতা তেমনি আছে। ভ্রম হয় এ কোন্ শতাব্দীতে এসে পড়লুম। দুর্গপ্রাচীর, তোরণ, গদুড়, পরিখা বিংশ শতাব্দীর বাস্তবের মাঝখানে মধ্যযুগের স্বপ্নকে ধরে রেখেছে, মধ্য রাত্রির স্বপ্নের জের মধ্য দিবা্য চলছে।

নূর্বার্গ যে দিক দিয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা চারুশিল্পের নয় যন্ত্রশিল্পের দিক। জামানীতে দেখা গেল যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কেবল যে প্রয়োজনসিদ্ধির সম্বন্ধ আছে সে কথা সত্য নয়, যন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর মগতা আছে। জামানীতে যন্ত্রকে মানুষ ততখানি ভালোবেসে সেবা করে ইংলণ্ড ঘোড়াকে যতখানি কিংবা ভারতবর্ষে ঘোড়াকে যতখানি। বার্লিনের লোক যেন যন্ত্রের আত্মাকে দেখতে পেয়েছে, যন্ত্র যেন তাদের স্বামী যন্ত্র নয়, আত্মীয়। আধুনিক যুগে যন্ত্র যে সব সমস্যার সূত্রপাত করেছে তাতে যন্ত্রের প্রতি রাগ হবারই কথা। কিন্তু ও যে মানুষের আত্মজ। পুত্র কি পিতামাতাকে কম জ্বালাতন করে?

হল্যাও আমাকে অবাধ করেছে। দেশটি আমাদের যে কোনো একটা বড় জেলার চেয়ে বড় নয়। তবু তার সাম্রাজ্য আছে তার থেকে বহু সহস্র ক্রোশ দূরে। তার চেয়েও যা বড় কৃতিত্ব—হল্যাও সমুদ্রকে পিছু হটাতে লেগেছে। সমুদ্র হল্যাওর বেগার খেটে দিয়ে আসছে কবে থেকে। তার খালে জল ভরে দেয়, ক্ষেতে জল সেচ করে, তার অসংখ্য জাহাজকে পাণ্ডার মতো পৃথিবী পরিক্রমায় নিয়ে যায়। ইংরেজ সমুদ্রের কাছ থেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি আদায় করতে পারেনি, ওলন্দাজ তার বেশির ভাগ ভূমি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছে।

হল্যাও এখন বিশ্বজনের শান্তিপন্থায়েৎকে চতীমণ্ডপ ছেড়ে দিয়েছে। The Hague শুধু হল্যাওর রাজধানী নয়, আন্তর্জাতিক রাজধানীও নোহে: অন্যতম। আমি যে সময় হেগে ছিলাম সে সময় ফরাসী-ইতালিয়ান-বেলজিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফিলিপ স্নোডেনের বচসা চলছিল। হোটেলগুলোতে নানা নেশনের পতাকা উড়ছিল, সমুদ্রের কূলে লোকারণ্য। কত দেশের লোক! সমুদ্রকূলে স্ত্রী স্বাধীনতার মাত্রাটা কিছু বেশি হয়েই থাকে।

বেলজিয়মের রাজধানী প্যারিস। ব্রাসেল্‌স্‌ যেন প্যারিসের শহরতলী। ব্রাসেল্‌সের যেটুকু প্রাচীন সেইটুকু তার বিশেষত্ব। যেমন তার গির্জা। এবং টাউন হল (Hotel de ville)। প্রাচীন জার্মানিতে প্রতি নগরেই রাট হাউস ছিল, এগুলি সার্বজনীন ক্রিয়াকর্ম আমোদ আনন্দ আহার-বিহারের কেন্দ্র। ইংলণ্ডের টাউন হলগুলিতে নাচ গান হয়। আমরা টাউন-হল করেছি, কিন্তু বড়তার জন্যে। আমাদের নগরগুলি কেন্দ্রহীন।

## ॥ কুড়ি ॥

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে যখন ইংলণ্ডের আকাশে বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, অষ্ট প্রহর বৃষ্টি ও বৃষ্টির আনুষঙ্গিক শীত, তখনো ইটালির আকাশ নীল নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল। বনে বনে তখনো পাতা ঝরার দেরি। ছায়াতরুতলে রৌদ্র সঞ্চিত ধরণীকে তখনো আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয়।

ইটালি যেন আমাদের দেশ। সূর্য যে যে দেশের প্রতি সদয় তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল আছে। গাছপালার মতো মানুষও বেঁটে খাটো এবং প্রভূতসংখ্যক। নারীর মুখে সুকুমার কমণীয়তা এবং বেশে ও কেশে সেকলে রীতি। ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী ভগবানের মতো সর্বত্র অবস্থিত। চর ও চোর পবনের মতো অদৃশ্য বিহারী। মানুষের মতো ও মদের মতো মাটিও রঙিন মেঘও রঙিন। কোথাও স্রোতাবেগহীন নীলসলিল হ্রদের অন্ধ সৌধশোভিত বিলাসদীপ, হ্রদকে প্রায় বেষ্টিত করেছে আল্প্‌স পর্বতের শাখা প্রশাখা। কোথাও দিগন্তপ্রসারী সমতল শস্যক্ষেত্র, তিন হাজার বছরের পুরাতন জনি, তার উপর দিয়ে কত যুগ-যুগান্তরের সৈনিক জয়যাত্রায় গেছে ও তার নিচে কত নগরী প্রোথিত হয়েছে। কোথাও ভগ্ন ক্রীড়াহলী, ভগ্নাবশিষ্ট স্নানাগার, ভাঙা মঠ ভাঙা গির্জা। রাশি রাশি স্মৃতিচিহ্ন স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করেছে। মানুষ তিন হাজার বছরের পাষাণময় চিংকারে কর্ণক্ষেপ না করে একটা দু'দিনের পুরোনো হাফা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাজ করেছে। লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-মূর্তি দেশটাকে যেন মিউজিয়ামে পরিণত করতে চায়, কিন্তু দেশ তাদের প্রতি দৃকপাত করছে না, বিদেশীরা করছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইটালির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করেছেন। আজকের ইটালি দেখলে কালকের ভারতবর্ষ দেখা হয়। ইটালি যথাসম্ভব তার স্বধর্মের অনুসরণ করেছে। সে যে ইংলণ্ড নয় ইটালি এ কথা যদি পদে পদে মনে রাখি তবে ইংরেজের চোখে ইটালি দেখার মতো ভুল দেখা ও ইংরেজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ইটালিকে বিচার করার মতো ভুল বিচার ঘটে না। ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ রোমান ক্যাথলিক চার্চের বংশে জন্মেছে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। একচ্ছত্র অধিনায়কের আজ্ঞাধীন অস্কেইলি ইটালিতে নতুন নয়। সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিকে বিলীন করা ইটালিয়ার চিরাভ্যাস। চার্চ যদি বহিমুখীন না হতো তবে ইটালি গত সহস্র বৎসরে বৃদ্ধা বিভক্ত হতো না এবং আজ তার বিলম্বিত প্রতিকার স্বরূপ ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করত না।

তা কক্ষক, কিন্তু নিজের ঘরের বাইরে পরের ঘরে পদক্ষেপ করতে চায় কেন? বিশ্ব শুদ্ধ সবাই ফ্যাসিস্ট হতে যাবে কোন্ দৃষ্টিতে?

এর উত্তর, ইটালীয় চরিত্র বাঙালী চরিত্রের মতো কল্পনাকে খাটো করলে বল পায় না। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। কিন্তু বাঙালী চরিত্রে যা নেই কিংবা অল্প আছে, ইটালির চরিত্রে সেই অভিনয় শীলতা বিদ্যমান। ইটালীয়রা অভিনয়ের পোষাক পরে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালোবাসে। তাদের চুল ছাঁটা ও টেরি কাটা তাদের জুলপি ও ভুরু অভিনয়ের মেক-আপ। তাদের মুখের মাত্রাহীন অত্যাঙ্ক তাদের নিজেদের কানে সুধাবর্ষণ ও প্রাণে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করে। সত্যিই তারা জগৎ গ্রাসিতে আশয় করেনি, যদি বা করে থাকে তবে ও জিনিস তাদের ক্ষমতায় কুলাবে না এ তারা মর্মে জানে। তবু ও কথা থিয়েটারী ঢঙে না বলতে পারলে তারা নিজেদেরকে কাপুরুষ জ্ঞান করে।

বাম্প থেকে জল হয়, জল থেকে হয় বরফ। বরফের অবয়ব বাষ্পের আদল খুঁজলে নিরাশ হতে হয়। তেমনি আধুনিক ইটালীয়ের চরিত্রে রোমক চরিত্রের আদল। সে ওজস নেই, সে ঋজুতা শুধু ইটালীয় চরিত্র থেকে কেন, সভ্যমানব চরিত্র থেকে গেছে, এবং সেই শাসন: কৌশল ইংরেজ চরিত্র আশ্রয় করেছে। কিন্তু ততঃ কিম্? মাংসিনি, গারিবান্ডি, ক্রোচে ও দুজে (Duse)র জাতিও নানাগুণে ভূষিত। একটি বৃহৎ আদর্শবাদ ইটালীয় চরিত্রের কোথাও উহ্র আছে। তারই বলে ধীরে ধীরে ইটালি জগৎ সভায় আসন করে নিচ্ছে, কিন্তু এতটা ঢঙ্কানিনাদ সহকারে যে কান জানে ঢঙ্কাই সত্য।

যে ইটালি পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে সৌন্দর্যব্রষ্টারূপে শ্রেষ্ঠ এবং অমর সে ইটালি রোমক যুগের নয় আধুনিক যুগের নয়, সে ইটালি দাস্তে পেত্রার্কী লেওনার্দো মিকেলান্জেলোর মায়াময় যুগের, যে যুগে রোমান্স ছিল মানুষের জীবন বস্তু। শেক্সপীয়রের নাটকে ও ব্রাউনিঙের কাব্যে আমরা তার আলেখ্য দেখেছি। একই মানুষ পাথর কেটে মূর্তি গড়ছে, প্রাচীরগায়ে ছবি আঁকছে, শব ব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব চর্চা করছে, নগররক্ষী সৈন্যের নায়ক হচ্ছে, নির্বাসিত হয়ে নানা সঙ্কটের আবর্তে পড়ছে। ‘জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাইন’। এদের প্রেম কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি বীরত্বপূর্ণ তথা কল্পণ। আমাদের যুগে সৌন্দর্যসৃষ্টির স্রোত আবর্জনার ময়ূর, নানা কুটিল থিওরীর কচকচি শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্তিকে ব্যাহত করছে। মধ্যযুগের সহৃদয়তার পরিবর্তে আধুনিক যুগের সমস্তিত্বতা হয়েছে শিল্পসৃষ্টির কষ্টপাথর। মধ্যযুগে সর্বাসীর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল শিল্পীমাত্রের কাম্য, আমাদের যুগের শিল্পী কেবলমাত্র শিল্পী হয়েই ক্ষান্ত। সেই জন্যে শিল্পে জীবনের সবটার ছাপ পড়ছে না, জীবনের সুগোল সুডোল রূপটিকে শিল্পের খর্বক্ষীণ আলিঙ্গনে আঁটছে না। মধ্যযুগের ইটালি ধর্মপ্রাণও ছিল। তার সাক্ষী ভারতবর্ষের মতো ইটালির সর্বঘণ্টে। কিন্তু এই

ধর্মপ্রাণতা কেমন সঙ্গীর্ণ ছিল তার একটি নমুনা রোমে পাওয়া যায়। রোমক যুগের সরল উন্নত নিরীশ্বর মন্দিরগুলিকে ভেঙে তাদের থেকে পাথর খুলে নিয়ে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। সে সব ক্যাথিড্রাল যদি সুন্দর হতো তবে এই অপরাধের মার্জনা থাকত, কিন্তু রোমের দুটি একটিকে বাদ দিলে বাকী সমস্ত গির্জা ভাঁকভমকের জোরে দর্শককে পীড়ন করে এবং লক্ষ লক্ষ ধর্মভীরু তীর্থযাত্রীর মনে সন্ত্রাস জাগায়। ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল তব্বরের নয় শিল্পীর কীর্তি। মিলানের ক্যাথিড্রাল বিরাট গম্বীর বহুশীর্ষ বহুমুখ। ভেনিসের ক্যাথিড্রাল নাড়ঘর প্রাচ্য-প্রভাব সম্পন্ন।

ভেনিসের গৌরবের দিনে ভেনিস ভাবিকালের জন্য এমন কিছু রেখে যায়নি যার জন্যে ভাবিকাল তার প্রতি সশ্রদ্ধ হতে পারে। তবে ভেনিস নিজেকে দিয়ে গেছে, সে দান সামান্য নয়। সমুদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সেই মাটির উপর ভেনিসের প্রতিষ্ঠা, তার পিছনে সাধনা ছিল এবং সাধনার সম্মান করতে হয়। চন্দ্রালোকিত ভেনিসের খালে খালে গম্বোলায় আন্দোলিত হয়ে আনন্দ আছে, কিন্তু দুর্গন্ধের ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ভেনিসের যৌবনকালে ভেনিস কেমন রসিনী ছিল অনুমান করতে পারি সুসজ্জিত গম্বোলায় নৃত্যগীতের আয়োজন থেকে ও গম্বোলার সঙ্গে গম্বোলার গতি-প্রতিযোগিতা থেকে। গম্বোলায় ক'রে এক বাড়ির থেকে আরেক বাড়িতে ও এক পাড়ার থেকে আরেক পাড়ায় যাবার মোহ উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি কালের গম্বোলা দেখা দিয়েছে। সে গম্বোলার চলায় ছন্দ নেই, ধীরতা নেই, গাভীর্ষ নেই। ভেনিসের গম্বোলিয়েররা খাসা মানুষ। তাদের পেশা ও প্রকৃতি বদলালে ভেনিসের অঙ্গহানি ঘটবে। কিন্তু যে নগরী মৃত্যু তার অঙ্গহানি ঘটলেই বা কী না ঘটলেই বা কী!

ফ্লোরেন্স এখনো বেঁচে। এখনো সেখানে ও তার অনতিদূরে জীবন্ত শিল্পীরা বাস করে। কিন্তু মৃত শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, কি, কতকটা তাদের নকল ও বাকীটা তাদের শ্রদ্ধা করে? ফ্লোরেন্সের মাটির উপরে সৌন্দর্যের খনি। এক কালে এ নগরী কেমন 'পুষ্পিতা' ছিল, কল্পনা করেও আনন্দ, আবার তার এত কিছু স্মারক রয়েছে যে প্রত্যক্ষ করেও আনন্দ। পাছে জার্মানরা লুণ্ঠ করে নিয়ে যায় সেই ভয়ে মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা প্যারিস থেকে মোনা লিসা ও ভিনাস ডি মাইলোকে দক্ষিণ ফ্রান্সে সরিয়ে ফেলে। কিন্তু শত্রু যদি ফ্লোরেন্স আক্রমণ করে তবে তার আগে ফ্লোরেন্সের কয় সহস্র শিল্পসৃষ্টি সরানো সম্ভব হবে? বোধ করি তাই ভেবে সেকালের শিল্পীরা ফ্লোরেন্স রক্ষার জন্যে অস্ত্র হস্তে দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়াত।

রোমকে কেন Eternal City বলে তার অর্থ বুঝি, যখন জানিকুলাম পাহাড়ের পিঠে দাঁড়িয়ে রোমের ভিতর ও বাহির পরিক্রমা করি। অনেকগুলি পাহাড় পাহারা দিচ্ছে। কম নয়, তিন হাজার বছর ব্যাপী পাহারা। কত দিঘিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে, তার পরে বীর এসেছে, নগরী উৎসব প্রমত্তা ও বিনীত হ'য়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, এই গ্রহীদের স্মরণে সেসব যেন সেদিনের কথা। একদিন বিজ্ঞাতারা কতগুলি খ্রীস্টান দাস নিয়ে এল। দাসদের ধর্মকে উপহাস করল। বাঘ সিংহদের সামনে দাসদের ছেড়ে দিয়ে তাদের মরণ তামাসা দেখল। ক্রমে একদিন সম্রাট হলেন খ্রীস্টান। রাষ্ট্র হলো খ্রীস্টান। রাজগুরুই হলেন রোমের মালিক। রোমকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর দূতেরা ইউরোপের সকল রাজ্যে চাটুরিয়ে গেল, প্রথমে রাজ্যন্যদের ও পরে প্রজাদের দীক্ষা দিল। এবার রোমের পর্বত গ্রহরীরা দেখল আরেক রকম দিঘিজয়ের উৎসব। রোমের পোপ হলেন খ্রীস্টীয় জগতের পিতা। এককালে যেমন উচ্চাভিলাষীরা সীজার হবার জন্যে তপস্যা ও চক্রান্ত করত আরেক কালে তেমন পোপ হবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। ইউরোপ উজ্জ্বল ক'রে যাত্রীরা চলল রোমের অভিমুখে। তাদের জন্যে ক্যাথিড্রাল খাড়া হলো, সহস্র সহস্র যুবক সম্মানী হ'য়ে গেল। তাদের জন্যে মঠ তৈরি হলো। দাসদের যাজক প্রাসাদবাসী হয়ে বিত্তীয় জমিদারীর উপর

রাজাগিরিও করলেন। ভাটিকানো অলঙ্করণ করতে বড় বড় শিল্পীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এলো। রোমের প্রহরীরা আরেক রকম দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হলো।

পোপ যখন থেকে কেবলমাত্র ইটালির না হয়ে খ্রীস্টীয় জগতের হলেন তখন থেকে ইটালির আত্মা প্রতিভূ হারিয়ে রোমের বাইরে ছোট ছোট নগরে ও প্রদেশে প্রতিনিধি খুঁজতে ও পেতে থাকল। যে ইটালি ধ্যানী ও প্রেমিকদের মনে আইডিয়াক্রাপ ছিল নেপোলিয়নের নিষ্ঠুর হস্ত ও কাভরের চতুর মস্তিষ্ক তাকে মূর্তিমতী করল। মুসোলিনির কাণ্ড দেখে সন্দেহ হচ্ছে সে মূর্তি শিবানী না বানরী, কিন্তু মাৎসিনীর মানসী চিরকাল ভাবলোকে থাকবেন না, ভাবীকালের আদর্শবাদী এই অসম্পূর্ণ মূর্তিকে নিজের হাতের বাটালি দিয়ে কুঁদে তার মধ্যে সেই মানসীকে অবতরণ করাবে।

## ॥ একুশ ॥

ইউরোপ থেকে বিদায়ের দিন নিকট হয়ে এল। দীর্ঘ দুই বছর পরে আমার বিরহী বন্ধুটি তার সুখ নীড়ে ফিরছে। ইউরোপ ছিল তার নির্বাসন ভূমি। তাই বিদায় দিনটি তার মুক্তির দিন। কিন্তু আমার?

ইউরোপকে আমি না দেখতেই ভালোবেসেছিলুম, দেখেও ভালোবাসলুম। ইউরোপ আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে এসেছে—অন্য কথায়, চিরকাল ভালোবেসে এসেছে। ইউরোপ থেকে বিদায় আমার পক্ষে বিরহের শেষ নয়, শুরু।

তাই কখনো চোখের পাতা আর্দ্র হয়, কখনো বুকের কাঁপন তীব্র হয়। মনটা বিশ্বাস করতে চায় না যে বিদায়ের দিন সত্যিই আসবে—‘একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ।’ বিদায়ের ভাবনা যথাসাধ্য ভুলে থাকলুম। তবু যখন মনে পড়ে যায় তখন আমার ইটালি বিহার করুণ হয়ে ওঠে। আহা, আবার কবে দেখব—যদি বেঁচে থাকি, যদি পাথেয় জোটে, যদি এই ভালোবাসা এমনি থাকে! এতগুলো যদিও উপর হাত চলে না গো ইউরোপা। মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা ও দেশের সঙ্গে ভালোবাসা এ দুইয়ের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। তুমি যেখানে থাকলে সেইখানেই থাকলে। মানবী হলে নিশ্চয়ই আমার দেশে আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে। তা যখন তুমি পারবে না তখন আমাকেই আসতে হয়। অন্ততঃ বলতে হয় যে আবার আসব।

বললুম, আবার আসব, ভয় কী! কতই বা দূর! জলপথে পনেরো দিন, স্থলপথে বারো দিন, আকাশপথে সাতদিন মাত্র। কিছু না হোক, মনের পথে এক মুহূর্ত।

বললুম ওকথা। তবু জানতুম ওকথা মিথ্যা। জীবনে ফিরে আসা যায় না। একবার মাত্র আসা যায় এবং সেই আসাই শেষ আসা। আবার যদি আসি তবে দেখব সে ইউরোপ নেই। সেই পুরাতন পদচিহ্ন ধরে মার্সেল্‌স্ থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে লণ্ডন যাব। লণ্ডনের গলিতে গলিতে বেড়াব। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে ও সুইটজারলণ্ডে, জার্মানিতে ও অস্ট্রিয়ায়, হাঙ্গেরীতে ও চেকো-স্লোভাকিয়ায় স্মৃতির দাগে দাগা বলাব। ইটালি প্রদক্ষিণ করে চেনা জিনিসগুলিকে খুঁজে বের করব। দুটি বছর কাটবে দুটি বছরের পুনরাবৃত্তি করতে। চাইনে নতুন দেখতে নতুন করে দেখতে। আমার তেঁইশ চব্বিশ বছর বয়সের এই আমি আমার শ্রেষ্ঠ আমি। এই দুটি বছরে যা পেলুম তার বেশি এ জীবনে পাওয়া যাবে না। এই বা ক’জন পায়? এত স্নান এত মান এত প্রীতি এত মমতা। চক্ষু যত দেখল

লেখনী তার ভাষা পায়নি, আভাস দেবার সাধনা করেছে। শ্রবণ বত শুনল স্মরণ রাখতে পারল না।

স্মৃতির দাগ আপনি মুছে যায়। স্মৃতির পথ বেয়ে কত পথিকের আনাগোনা, তাদের চরণতল মৃত্যুর মতো নির্দয়। তবু যদি স্মৃতির দাগ ধরে যাওয়া সম্ভব হয় তবে কোন ইউরোপকে দেখব? ইউরোপ তো শুধু স্থান নয়, দৃশ্য নয়, সে মানুষ—ইউরোপের মানুষ। সেই মানুষগুলি কি আমার অপেক্ষায় অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে অচঞ্চলভাবে আমার স্মৃতিনিদ্রিষ্ট স্থানে কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা টমটম হাঁকিয়ে কেউ বা ঠেলাগাড়ি ঠেলে কেউ বা বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে?

পদে পদে পরিবর্তনশীল ইউরোপ। ততোধিক পরিবর্তনশীল মানুষের জীবন যৌবন জীবিকা ও প্রেম। স্মৃতিতে যাদের যে সময়ের যে অবস্থার ফোটা রইল তারা যদি বা জীবিত থাকে তবু তাদের সে বয়স আর থাকবে না, তাদের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল তাদের নাম ঠিকানা আমি হাজার মাথা খুঁড়লেও পাব না। রাইন নদী চিরকাল থাকবে, সীমানাও তাতে চলতে থাকবে। কিন্তু সেই যে মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী হয়েও মুখে রঙ মেখেছিল তাকে তার প্রেমিকের স্বচ্ছলগল্পে আর একটিবার দেখতে পাব কি? না যদি পাই তবে রাইনের উভয়তটের গিরিদুর্গ তেমন সুদৃশ্য বোধ হবে না। লোরলাইয়ের মায়া সংগীত শুনে নাবিকরা যেখানে প্রাণ দিত সেখানে আমার বুকের স্পন্দন হঠাৎ স্থির ও তার পরে প্রবল হয়ে উঠবে না।

এমনি কত দৃশ্য অদৃশ্য মনে হবে। সেই জন্য কি মার্সেল প্রুস্ত বহির্জগতের প্রতি অন্ধ ও বর্ধির হয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বেচ্ছাবন্দীরূপে অবস্থান করতেন? আমাকেও তাহলে শপথ করতে হয় যে আর ইউরোপে আসব না, পাছে প্রিয়বরাকে অদৃশ্য দেখি, পাছে পরিচিতাকে অপরিচিতা বলে ভুল হয়। সে ভুলের সংশোধন নেই। বিরহের পরে প্রত্যেক প্রেমিককে ভয়ে ভয়ে প্রিয়ার দিকে চাইতে হয়—সে মোটা বা রোগা হয়ে যায়নি তো; অপরে তার মন চুরি করেনি তো? নানা অভিজ্ঞতার চাপে পূর্বস্মৃতি কি তার মনে কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে?

একদিন ঘুম থেকে জেগে দেখলুম চারিদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের একটিমাত্র পরিচয় সে সমুদ্র। সে যে ভূমধ্য সাগর ও কথা তার গায়ে লেখা নেই। চীনের সাগরও হতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার সাগরও হতে পারে।

মাটি যে আমাদের কত বড় আশ্রয়স্থল সমুদ্রের উপর অসহায়ভাবে ভাসমান না হলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমুদ্রের কূলে বসে সমুদ্রকে দেখে এক মহান ভাবে আপ্লুত হই, কিন্তু দিনের পর দিন যখন দশদিকের নয়দিকে কেবল সমুদ্রই দেখি আর দশম দিকে দেখি সমুদ্র-দিগন্তায়িত আকাশ তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। তবু সঙ্গে লোকজন থাকে বলে ভরসা থাকে। বাইরে যত বড় বিপদ হাঁ করে থাকুক না কেন ভিতরে তাস খেলার বিরাম নেই, কখনো নাচ চলেছে কখনো বাঁধি রেখে নকল ঘোড়দৌড়। ঠিক যেন কোনো একটা হোটеле বাস করছি, পরস্পরের অতি কাছাকাছি, অথচ কারো সঙ্গে কারো গভীর সম্বন্ধ নেই। খাচ্ছি দাচ্ছি গল্প করছি হাসি তামাসায় যোগ দিচ্ছি চটছি ও মনখারাপ করছি—তবু জানি এ দু'দিনের খেলা। একটা কৃত্রিম অবস্থার চক্রান্ত। ভূপৃষ্ঠে কেউ সমস্তক্ষণ হোটেলেরও থাকে না, একাদিক্রমে এত রকম মানুষের সংস্রবেও আসে না, এদের সঙ্গে জীবনের অভিনয়ও করে না। ভূপৃষ্ঠে যা বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে অথচ অল্প সংখ্যক প্রকৃত বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে সত্য, জাহাজে তা সত্যের নকল। তাই জাহাজী সামাজিকতার কথা মনে পড়লে হাসি পায়, ও সম্বন্ধে অত সিরিয়াস না হলেই ঠিক হতো।

ইউরোপের অধিকার যখন ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে শেষ হলো তখন ক্রমাগত মনে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের স্মৃতি সমস্তে ভুলেছিলুম, পাছে পুরাতনের মায়ায় নূতনকে

অবহেলা করি, অতীতের রোমন্থন করতে বর্তমানের স্বাদ না নিই। এখন তো ইউরোপ হলো অতীতের, এবং বর্তমানের জাহাজী জীবন বিশ্বাদ লাগছে—এখন ভারতবর্ষ আমার সোনার ভবিষ্যৎ, আমি তারই ধ্যান করব।

ভারতবর্ষের এমন একটি মূর্তি দেখতে পেলুম যা একমাত্র আমার মতো মানুষই দেখতে পায়—আমার মতো যে মানুষ ভারতবর্ষকে জন্মসূত্রে ও ইউরোপকে প্রেমসূত্রে চিনেছে, যে মানুষের মন উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে উভয়ের যথার্থ পরিমাণ জেনেছে। সকল কলহ কোলাহলের উর্ধ্বে ভারতবর্ষ তাঁর যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর নিম্নলি নেত্রে হাসির দ্যুতি, প্রাপ্তির আনন্দ তাঁর পার্শ্ব অভাবকে তুচ্ছ করেছে। সুন্দরী ইউরোপা তার যৌবনের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নৃপূর বাজাচ্ছে, তাঁর মন পাচ্ছে না। পাবে, যদি পার্বতীর মতো তপস্চারিণী হয়। ইউরোপকে ভারতবর্ষের যোগ্য হতে হবে। নইলে সে কেবল ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে বাঁধতে ও বিচার করতে থাকবে এবং সেই কল্লিত আত্মপ্রসাদে স্ফীত হতে থাকবে।

বসেতে যখন নামলুম তখন ভারি মিষ্টি লাগল মরাঠা কুলিদের কর্মকালীন গোলযোগ। যাই দেখি তাই মিষ্টি লাগে। গাছতলায় মানুষে গোরুতে ছাগলে মিলে গুয়ে আছে। হিন্দু নাপিত মাটিতে বসে মুসলমানকে কৌরি করে দিচ্ছে। কাছা-দেওয়া মরাঠা মেয়ে মাথায় বিরাট বোঝা ও বগলে শিশু নিয়ে দৃষ্ট ব্যস্ততার সঙ্গে পথ চলছে। গুজরাটী মেয়ে ব্রীড়ায় ললিত গতি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের পুরুষ বস্ত্রের রাজপথে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। সকলে সমান গম্ভীর, শান্ত, আত্মহ। ভারতবর্ষ এ কী নূতন রূপে দেখা দিল!

ভারতবর্ষে ফিরলুম, কিন্তু এ কোন্ ভারতবর্ষ! যাকে রেখে গেছলুম সে নেই। নবীন ভারতবর্ষ আমাকে না দেখে না জেনে আমার অভাব বোধ না করি কোন্ ষাঁকে জমেছে ও বেড়েছে। না সে আমাকে চেনে, না আমি তাকে চিনি। তার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, পাছে তার আত্মাভিমান ঘা দিয়ে ফেলি, তার কঠিন কথা শুনে মর্মহত হলে চলবে না। ঘরে তোলার আগে আমাকে পরখ করার অধিকার তার আছে। আমি আগন্তুক। সে গৃহবাসী।

প্রাচীন বন্ধুরা বলে, ‘কই, কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখছি না তো? যেমনটি ছিলে তেমনটি আছ?’—যেন মস্ত একটা পরিবর্তন ওরা আমার আকৃতিতে ও আচরণে প্রত্যাশা করছিল; নিরাশ হলো। আমি বলি, ‘তা হলে তো আমাকে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ; আমি ভেবে মরছি কী করলে তোমাদের মন পাব।’

কিন্তু সত্যিই সহজ নয়। আমি তো জানি আমি সেই আমি নই। দুটি বছরে প্রত্যেক মানুষের জীবন এক থেকে আরেক হয়ে ওঠে, প্রতিদিন দেখি বলে কোনদিন লক্ষ্য করি না। আমার সম্বন্ধে ওদের এবং ওদের সম্বন্ধে আমার ঐ প্রতিদিন দেখটুকু ঘটেনি বলে অন্তরে অন্তরে আমরা পর হয়ে পড়েছি। দুটো মহাদেশের ব্যবধান সেই বিচ্ছেদকে যোরালো করেছে। দু’বছর চোখের আড়ালে বেড়েছি, এইটো প্রধান। দু’বছর বিলেতে থেকেছি, এটা অপ্রধান। কিন্তু ফট করে ওরা বলে বসে, ‘একবারে আহলে বিলেতী হয়ে ফিরেছ। আমাদের সঙ্গে মিলবে কেন?’

বিলেত ফের্তারা যে নিজেদের মধ্যে একটা সমাজ কিংবা সম্প্রদায় কিংবা আড্ডা রচনা করে সেটা এই দুঃখে। এরাও ভুলতে পারে না ওরাও ভুলতে পারে না, কয়েক বছর ও কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। তার উপর বিলেত ফের্তারা সাধারণত ধনী কিংবা উচ্চপদস্থ হয়ে থাকে, অবস্থার ব্যবধান মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ভালোবাসে। বিলেতের সমাজেও ভারতফের্তাদের এককালে ‘নবাব’ বলা হতো। ইদানীং তাদের অবস্থার বিপর্যয় হয়েছে বলে তাদের এ্যাংলো-

ইতিহাস বলে পরিহাস করা হয়। ক্রমশ ইন্দবন্দের কপালেও পরিহাস জুটছে।

কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইউরোপ। মাঝখানে আরব ভূকী পারস্য আফগানিস্থান ইত্যাদি কত দেশ পড়ে রইল। বিধাতা কার সঙ্গে কাকে বেঁধে দিলেন। পরিহাসই করো আর নেতৃত্বই দাও আমাদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়তেই থাকবে। ভাবী ভারত ইউরোপে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ যুবক পাঠাবে ও তারা ফিরলে তাদেরকে ঘরে তুলবে। আমরাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পূর্বপুরুষ সেইজন্যে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকব। শুধু দু'তিন বছর ইউরোপে গিয়ে ফুটি ক'রে ফেরা নয়। আমাদের কাজ ইউরোপে ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষে ইউরোপকে প্রকৃত ও প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত করা। আমরা দুই মহাদেশের নুন খেয়েছি। দুই মহাদেশে কত লোক আমাদের শ্রাণরক্ষা করেছে, আমাদের সেবা ক'রে মূল্য গ্রহণ করেনি, আমাদের পরমাত্মীয় হয়ে দান-প্রতিনানের উর্ধ্বে উঠে গেছে। আমরাও যেন নিন্দাবিদ্বেষ ঘৃণাঅবজ্ঞার উর্ধ্বে উঠে উভয় মহাদেশকে নিকট থেকে নিকটতর ক'রে বিধাতার অভিপ্রায়কে সফল ক'রে তুলি।

যেদিন আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতে। দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সুই সৌন্দর্যের চেয়ে দেশের মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, চূষা সুন্দর দেশ দেখতে ভালো লাগে না, যদি দেশের মানুষকে ভালো না লাগে। কে যেন বলেছেন, 'এদেশের সব সুন্দর, কেবল মানুষ কুৎসিত।' তিনি দূর থেকে মানুষকে দেখে ও কথা বলেছেন, কাছে গিয়ে দেখেননি। যে দেশে যাও সেদেশে দেখবে মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, মানুষের সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগে বুকি বাকী সব সুন্দর হয়েছে। প্রকৃতি মানুষের হাতে গড়া প্রতিমা না হোক মানুষের প্রাণের রসে রসায়িত এবং ধ্যানের দ্বারা প্রভাবিত। প্রকৃতি তো মানুষেরই প্রতিকৃতি। বিশেষ ক'রে ইউরোপে।

ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। ইউরোপকে আমি বল-মহামানবের মানস সরোবর। সাগরে যেমন সকল প্রবাহিণী মিলিত হয় মানস সরোবর থেকে তেমন সকল প্রবাহিণী নির্গত হয়। ইউরোপের মানস থেকে যুগে যুগে কত ভাবধারা নিঃসৃত হয়ে পৃথিবীকে ভাবোর্বরা করেছে। পৃথিবী নিজেই তো পৃথিবীর প্রতি ইউরোপের দান, কারণ পৃথিবী ইউরোপের আবিষ্কার। কেই বা জেনেছিল আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকার অস্তিত্ব? পৃথিবীর আকার আকৃতি গতি ও অবস্থান ইউরোপই আমাদের জানালো। আমরা পরলোকের নাড়ী নক্ষত্র জানতুম কিন্তু যে লোকে জন্মেছি তার সম্বন্ধে বড় জোর এই জানতুম যে সেটাকে একটা সাগর নিজের ফণার উপরে অতি যত্নে ব্যালাপ ক'রে একটা হাতীর পিঠের উপর অতি কষ্টে টাঙা সামলাচ্ছে।

সত্যের একটি বিন্দুও নষ্ট হবার নয়। ইউরোপের সত্য ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে ভারতবর্ষের সত্য ইউরোপকে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মহামিলনের লগ্ন আসবেই কালোহায়া নিরবধিঃ। আজো যা আসেনি কোনো একদিন তা আসবে বলেই আজ আসেনি। কিং সে আমাদের সকলের ভাবনা, সকলের স্বপ্ন। আমার একার নয়। আমি ভাবি আবার কবে ইউরোপের সঙ্গে মিলিত হবে, কথা রাখব।

দিনের পর দিন যায়, ইউরোপের স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকে। সত্যি কি কোনোকালে ইউরোপে ছিলাম?

(১৯২৭-২৯)